নেপাল হিমালয়ে

ভক্তি বিশ্বাস

নবপত্র প্রকাশন ● কলিকাতা-নয়

প্রথম প্রকাশ :

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

প্রকাশক :

প্রসূন বসু

নবপত্র প্রকাশন

৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা-

প্রচ্ছদ :

খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক :

নিউ এজ প্রিন্টার্স

৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা-৯

কাঠমাণ্ডু

এক

ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি, এটাই বোধহয় নেপালের সবচেয়ে সুন্দর পরিচয়।

ভারতের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র কত যুগ যুগ আগে থেকে ভারত ও নেপালের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, ছিল ব্যবহারিক ও আত্মিক যোগ ভারতের প্রাণস্পন্দন যেন নেপালেও সমভাবে স্পন্দিত হয়েছে ভিন্ন দেশ হলেও এখনো যোগাযোগ অনেকটাই অক্ষুণ্ণ আছে, প্রথমবার নেপালে গিয়ে এটাই আমাদের ধারনা হয়েছিল। তাই বুঝি নেপালের কথা মনে হলে মনে আসে কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, নেপালে বেড়াতে যাব, একথা মনে করলে মনে হয়, বিদেশে যাচ্ছি না, মনে হয় বন্ধুগৃহে উৎসবের ভোজ খেতে যাচ্ছি।

অতুল ঐশ্বর্য্য যেন পুঞ্জীভূত হয়ে জমে আছে নেপালের পর্বতময় ভূমিতে ভারতসীমান্ত সংলগ্ন নেপালের তরাই অঞ্চলে বুদ্ধদেবের জন্মভূমি লুম্বিনী, সেখান থেকে সুরু করে পর পর আছে শিবালিক পর্বতমালা, মহাভারত লেখ পর্বতমালা, সবচেয়ে শেষে বৃহৎ হিমালয় ও তিব্বতের মালভূমি। সর্বত্র শত শত তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠেছে হাজার হাজার বছর ধরে। আকাশচুম্বী প্যাগোডাকৃতি মন্দির যেমন আছে, ভারতীয় ছাঁচের পাথরের তৈরী মন্দিরও আছে অগণ্য হিন্দুধর্ম ও

বৌদ্ধধর্ম এখানে যেন দুটি যমজ ভাই-এর মত একত্রে বেড়ে উঠেছে। তাই যেমন অসংখ্য মন্দির আছে, তেমনি বৌদ্ধ বিহারের ছড়াছড়ি সর্বত্র। সৌন্দর্যের আধার এগুলির প্রত্যেকটি। কি তাদের কারুকার্য, কি ভাস্কর্য! অবাক হয়ে যেতে হয়।

এদিকে প্রকৃতিদেবীও ভাগ্যবান নেপালকে দু হাতে তাঁর প্র দ বিলিয়েছেন। পর্বতরাজ হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গাবলীর অধি ংশ নেপালের উত্তর সীমান্ত অলঙ্কৃত করেছে। আজ আমাদের কারও অজানা নেই যে বিশ্বের সর্বোচ্চশৃঙ্গ এভারেষ্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তে অবস্থান করছে এছাড়া আছে চিরতুষারধবল অসংখ্য শৃঙ্গাবলী—ধৌলাগিরি, অন্নপূর্ণা, মাকালু, চৌ-ইউ, লোৎসে, নুপ্‌ৎসে, ল্যাংট্যাং-হিমল, গোঁসাইথান প্রভৃতি। তাদের উচ্চতারও যেন সীমা নেই, রূপেরও অবধি নেই! তাই বলছিলাম, উৎসবে গিয়ে যেন ভূরি-ভোজন হয়ে যায় নেপালে—মন্দিরতীর্থ দেখবো, না হিমশৃঙ্গতীর্থ দেখবো, বুঝে উঠতে দিনের পর দিন কেটে যায়, কোন ফয়সালা হয় না।

নেপালের সবই যেন মস্ত মস্ত! যেমন মস্ত মস্ত উঁচু উঁচু তুষার-শৃঙ্গ আছে, তেমনি আছে মস্ত মস্ত চারটি নদী—মহাকালী, কর্ণালী, গণ্ডক ও কোশী তিব্বতের মালভূমি থেকে নেপালের পর্বতাকীর্ণ বুক-চিরে নেমে এসেছে ভারতের সমভূমিতে। এই নদীগুলি লম্বায় মস্ত, চওড়ায় মস্ত, অগুন্তি তাদের উপনদী, আবার তারা তাদের চলার পথে পাহাড়ের বুক চিরে যে উপত্যকার খাত সৃষ্টি করেছে, তেমন গভীর উপত্যকা নাকি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। বিখ্যাত জিওলজিষ্ট Toni Hagen-এর মতে দানাগ্রামের কালী গণ্ডকী নদীর খাত পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম। সমুদ্রতল থেকে দানার উচ্চতা মাত্র চার হাজার ফুট, তার দু'দিকে দুটি বিশ্ববিখ্যাত উচ্চ তুষার শৃঙ্গাবলী শোভিত পর্বতমালা, ধৌলা গিরি ও অন্নপূর্ণা। এই শৃঙ্গাবলীর উচ্চতা কোথাও কোথাও পঁচিশ হাজার ফুটেরও বেশী। এখানে এ দুটি

পর্বতমালার মধ্যেকার দূরত্ব মাত্র বাইশ মাইল। এ-পথে যাবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। এ-পথের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য দেখেছি, সেকথা যথাসময়ে বলব।

বহুকাল ধরে ভারত থেকে নেপালে তথা নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু অবধি লোকে হাঁটাপথেই যাতায়াত করত। নেপালে এক-সময় মন্ত্রীদের প্রতাপ রাজার চাইতেও বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের উপাধি ছিল "মহারাজা"। এই মন্ত্রীদের সমশের বংশে একজন মহৎ "মহারাজা" জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম চন্দ্র সমশের জঙ্গ বাহাদুর। তিনি ১৯০১ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কঠিন হস্তে কূটনীতিকের মত রাজ্যশাসন করেছেন। ভারত সীমান্ত থেকে ভীম-ফেদী পর্যন্ত রাজপথ তিনিই তৈরী করান। কিন্তু মনে হয় বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়ে ইচ্ছে করেই কাঠমাণ্ডু উপত্যকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করান নাই।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নেপালে এরোপ্লেন চলাচল সুরু হয়। কলকাতা, পাটনা, দিল্লি, ঢাকা হতে প্লেন কাঠমাণ্ডু যাতায়াত করে। ভারত সীমান্ত নওতনওয়া হতে নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী পোখারা পর্য্যন্ত বাস সড়ক তৈরী এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু এরোপ্লেনে যাতায়াত সেখানে অনেকদিন ধরেই। কাঠমাণ্ডু থেকে বিরাটনগর, সীমরা লুম্বিনী, ধনগদি, দাং, নেপালগঞ্জ, গোর্খা, ভরতপুর, জনকপুর প্রভৃতি জায়গায় প্লেনে যাওয়া যায়। কিন্তু নেপালের অধিকাংশ জায়গাতেই যেতে হলে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই।

মাত্র সেদিন, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, নেপাল ভারতের সঙ্গে তথা আধুনিক দুনিয়ার সঙ্গে আধুনিক রাজপথ দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে। ভারতের সহযোগিতায় তৈরী এই 'ত্রিভুবন রাজপথ' ভারতের সীমান্ত রক্সৌল থেকে রাজধানী কাঠমাণ্ডু অবধি চলে গেছে। এখন রক্সৌল থেকে ভোরের বাসে রওনা হলে সন্ধ্যার পূর্বেই কাঠমাণ্ডু পৌঁছানো যায়।

ত্রিভুবন রাজপথ অতি সুন্দর। চওড়া বাঁধানো পথ, সবুজ পাহাড়ের গা কেটে তৈরী, নেপালের পার্বত্যাঞ্চল দিয়ে চলেছে। মস্ত সাপের মত এঁকেবেঁকে এক একটা পাহাড়কে যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে—কোথাও উঠতে উঠতে প্রায় ৮০০০ হাজার ফুট অবধি উঠে গেছে, আবার পাহাড় ডিঙিয়েই ধীরে ধীরে নামতে নামতে আড়াই হাজার কি দেড় হাজার ফুট নীচে অবধি নেমে এসেছে। পথের ধারে ধারে দেখা যায় কোথাও নদী বয়ে চলেছে, কোথাও বা ছোট ঝরণা কলস্বরে চলেছে তা'তে মিলতে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে যতদূর দৃষ্টি যায়, ছোট ছোট আল বাঁধানো সবুজ শস্যভরা ক্ষেত, তার মাঝে ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন পটে আঁকা ছবি। উত্তরের নীল আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায়, রূপালী তুষার কিরীট মাথায় দিয়ে অপূর্বশোভা নিয়ে হিমশৃঙ্গাবলী সারি সারি দাঁড়িয়ে যেন আবাহন করছে। নেপাল দেখতে যেতে হলে এপথে একবার অন্ততঃ না গেলে নেপাল দেখা অনেকখানি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কাঠমাণ্ডু পৌঁছবার আগে, কাঠমাণ্ডুর পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে আট হাজার ফুট উঁচুতে 'দমন'। এখানে ত্রিভুবন রাজপথের অর্দ্ধেক পথ শেষ হ'ল। বহু ট্যুরিষ্ট এখানে আসেন, একটি রাত্রি কাটান, পরদিন প্রত্যূষে এক অপরূপ দৃশ্য দেখবার আশা নিয়ে। ট্যুরিষ্ট ডিপার্টমেণ্ট একখানা সুদৃশ্য আরামদায়ক বাংলোও তৈরী করে দিয়েছেন। তাছাড়া বিখ্যাত তুষার শৃঙ্গাবলী দেখবার জন্য আছে একটি উঁচু গোল কাঁচের ঘর—View Tower! এখানে বসে প্রত্যূষে নির্মেঘ আকাশের গায়ে তুষারমৌলী শৃঙ্গরাজী দেখা যায়। ধৌলাগিরি অন্নপূর্ণা, মচ্ছপুছারে, হিমলচুলী, মানাস্‌লু, গণেশহিমল, ল্যাংটাং হিমল, দোর্‌জেলাক্‌পা, পূর্বীগাচু, চৌবে ভাম্‌রে, গৌরীশঙ্কর চো-ইউ, মুপ্‌ৎসে, লোৎসে, মাকালু, নাম্বুর, কীর্ত্তিংলুর, এমনকি এভারেষ্ট পর্যন্ত দেখা যায়। এতগুলি বিখ্যাত তুষারশিখর একত্র দেখা পরম সৌভাগ্যের কথা।

দমন ছাড়তেই আবার বাসসড়ক ঘুরে পাহাড়ের নিচের দিকে নেমেছে, চলেছে মোহময়ী নেপাল উপত্যকার মধ্য দিয়ে উৎরাই পথে। এই উঁচু নীচু পথে পার হয়ে আসতে হয় শিবালিক পর্বতমালা, মহাভারতলেখ পর্বতমালা, পৌঁছানো যায় মধ্য নেপালের মালভূমি অঞ্চলে—সৌন্দর্যময় কাঠমাণ্ডু উপত্যকায়। সারাদিন ধরে বাসে চলা, তবু মনে হয় না বিন্দুমাত্র কষ্ট হচ্ছে।

এরোপ্লেনে কলকাতা বা পাটনা থেকে কাঠমাণ্ডু পৌঁছাতে ছু'ঘণ্টারও কম সময় লাগে। সে পথের দৃশ্যও কম আকর্ষণীয় নয়। যত প্লেন এগিয়ে চলে, সবুজ মাঠ পেরিয়ে, বনভূমির উপর দিয়ে, একটার পর একটা পর্বতাঞ্চল পার হয়ে চলা, হঠাৎ দিগন্তরেখারও উপরে কি যেন ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ফাঁকে দেখা দেয় তুষারমৌলী শৃঙ্গাবলীর টুকরো টুকরো ঝিকিমিকি! ক্রমে ক্রমে নিচের পাহাড় হয়ে ওঠে দুস্তর পর্বতমালার সারি—সমস্ত উত্তরাঞ্চল জুড়ে যার বিস্তৃতি, সবটাই চিরন্তন তুষারাচ্ছন্ন। প্লেন এগিয়ে চলে, আরও এগিয়ে আসে তুষারশৃঙ্গাবলী। মনের মধ্যে হঠাৎ আতঙ্ক জেগে ওঠে, এই বুঝি সংঘর্ষ হয় সৌন্দর্য্যের আধার ওই শিখরাবলীর গায়ে। হঠাৎ মোহ ভেঙে যায়. প্লেন নীচে নামতে সুরু করতেই নীচে দেখা যায় বিশাল উপত্যকা, কাঠমাণ্ডু উপত্যকা। বিশাল ভূখণ্ড, চারিদিকে পর্বত ঘেরা সমভূমি। কয়েকটি সরু সরু রূপালী নদীর রেখা চিক্‌চিক্ করে ওঠে—বাগমতী, বিষ্ণুমতী, রুদ্রাবতী, ইচ্ছাবতী নদী। নদীর তীরে তীরে ঘরবাড়ী ছড়ানো। লোকে বলে, নদীগুলি ছোট, তা বলে এদের জলস্পর্শে পুণ্য কম হয় না।

জিওলজিষ্টরা বলেন. কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় নাকি এককালে একটি মস্ত হ্রদ ছিল। কালক্রমে হ্রদের জল শুকিয়ে এই বিশাল সমভূমির উৎপত্তি হয়েছে।

দুই

কাঠমাণ্ডু উপত্যকা প্রধানতঃ চারটি অংশে বিভক্ত : কাঠমাণ্ডু, ভাঁটগাও, পাটন ও কীর্তিপুর। এইসব অঞ্চল অতীতে সমৃদ্ধ ছিল। তাদের সমৃদ্ধির কারণ খুঁজতে গেলে নেপালের অতীতের দিকে খানিকটা নজর দিতে হয়। সত্যি করে বলতে গেলে, নেপালের ইতিহাস বলতে কাঠমাণ্ডুর ইতিহাসই কেবল খানিকটা জানা যায়। তাছাড়া দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলের অন্য কোন ইতিহাসই নেই বলে মনে হয়।

বেদ ও মহাভারতে আমরা যে "কিরাত"দের উল্লেখ দেখতে পাই, পুরাকালে অনুমান খৃষ্টপূর্ব ৭০০ সাল থেকে, তাঁরাই নেপালে রাজত্ব করতেন এবং সম্ভবতঃ তাঁরাই বর্তমানে রাই, লিম্বু ও নেওয়ার জাতির আদিপুরুষ। তাঁদের সম্বন্ধেও খুব কমই জানা যায়। কেবল এটুকু জানা যায় যে, তাঁরা উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের অধিবাসী ছিলেন।

আগেই বলেছি, বুদ্ধদেব নেপালের তরাই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেটা হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব ৫৬০ সাল। তাঁর জন্মস্থান লুম্বিনী নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর থেকে লুম্বিনী বেশী দূরে নয়। এখানে বুদ্ধশিষ্য সম্রাট অশোকের নির্মিত একটি স্তম্ভ ছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান এক্সপ্লোরার Alois Anton

Furer এই স্তম্ভটি ঝোপজঙ্গলের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করেন। সেই স্তম্ভের লেখা থেকে জানা যায়, সম্রাট অশোক খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ সালে ঐখানে তীর্থযাত্রায় এসেছিলেন।

বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁর ধর্মপ্রচারের জন্য নেপাল পরিভ্রমণ করেছিলেন। মনে হয়, অশোক তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরে নেপালে যান। পাটনে অবস্থিত চারটি স্তূপ আজও তাঁর আগমনের সাক্ষ্য বহন করছে। সবগুলি এখন খুঁজে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তার ভগ্নাংশ এখনো আমরা নেপালে গিয়ে দেখতে পেয়েছি।

কিরাতদের পর যারা রাজত্ব করেছিলেন, তাঁরাও ভারত থেকে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কথা বিশেষ জানা যায় না। ঐ সময়, সম্ভবতঃ ৩৫০—৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, লিচ্ছবিরা রাজত্ব করেন। এদের পর ঠাকুরবংশীয় রাজারাও ভারতবর্ষ থেকে এসে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা এখনো পশ্চিম নেপালের সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। তাঁরা নেপাল অধিকার করে এখানেই বংশ বিস্তার করে এক উচ্চ বর্ণের সৃষ্টি করেন। এই বংশের সৃষ্টিকর্তা অংশুবর্মন (৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ) একজন উন্নতমনা, সহনশীল প্রজাপালক রাজা ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন শৈবধর্মাবলম্বী, কিন্তু তিনি শৈবধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের একত্র প্রচারের জন্য নানাবিধ সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সময়েই হুয়েনসাং প্রভৃতি চীন দেশীয় পর্যটকেরা বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দিরগুলি দেখবার জন্যে এখানে আসেন। তাঁদের লেখা থেকেই অনেক কথা জানা যায়। রাজা অংশুবর্মন তাঁর চেষ্টাকে ফলবতী করবার জন্য নিজকন্যা ভ্রিকুটিকে তিব্বতের রাজার সঙ্গে বিবাহ দেন। এই ভ্রিকুটি লামাধর্মের প্রবর্তক ছিলেন।

ভ্রিকুটি, তিব্বতের রাজার প্রথমা রাণী চীনদেশীয় রাজকন্যার সহযোগিতায় তিব্বতে প্রবল উৎসাহে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন। সেই সময় থেকেই দেখা যায়, হিন্দু ও বৌদ্ধ উৎসবগুলি দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের সকলের নিকট সমভাবে আদৃত হয়ে আসছে।

এই দুটি ধর্মের সহাবস্থানের যে রীতি তখন প্রচলিত দেখা গিয়েছিল, আজ অবধি সেই রীতি নেপালে চলে আসছে। কালপ্রবাহে বরঞ্চ ধর্মীয় গোঁড়ামী প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে। যে কোন ধর্মীয় উৎসবে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই সমান উৎসাহে যোগ দেয়। জাতীয়তা বোধের কাছে ধর্মীয় বিভিন্নতার কোন স্থানই দেখা যায় না। সপ্তম শতকে চীনা পর্যটক হুয়েনসাং এইরকম বর্ণনাই দিয়েছিলেন।

হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গগুলির ফাঁকে ফাঁকে তিব্বত হতে নেপালে আসবার কয়েকটি গিরিপথ আছে। নেপালের উত্তরপশ্চিমে "মুস্তাং" এইরকম একটি গিরিপথের শেষ গ্রাম। এখানকার অধিবাসীরা থকল বা ভোট নামে অভিহিত। নেপাল তিব্বত সীমান্ত হতে কালী-গণ্ডকী নদী এইপথে দক্ষিণে বয়ে এসে ভারতের বুকে গঙ্গানদীতে মিশেছে। এই কালীগণ্ডকীর তীর ধরে ধরে তিব্বত হতে নেপালের মধ্য দিয়ে ভারতে পৌঁছানো যায়। এর ফলে এই মুস্তাং অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে তিব্বতী ও ভারতীয় দুই রকম রীতি-নীতিই দেখা যায়। এই অঞ্চলেই বিখ্যাত তীর্থ আছে মুক্তিনাথ, সেখানে যেমন তিব্বতী লামারা তীর্থ করতে আসেন, তেমনি আসেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অগণ্য সাধু ও তীর্থযাত্রী দল। এই একটি স্থান কেবল নয়, নেপালের অন্যান্য অনেক তীর্থক্ষেত্র দেখে আমরা এই দুই ধর্মের সহাবস্থান নীতিরযাথার্থ উপলব্ধি করেছিলাম। পরে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করব।

প্রায় ১২ শতকে অভয়মল্ল ঠাকুরবংশকে সিংহাসনচ্যুত করেন। এই মল্ল রাজবংশও ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন। ইনি কঠোর হিন্দু-ধর্মের প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্মও একই সঙ্গে সেখানে চালু থাকে।

মল্লরাজাদের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে নেপালে নবযুগের সূচনা হ'ল। এই রাজাদের পরিবার সম্পর্কে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজত্বের প্রথমদিকে মল্লরাজাদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন

হতে হয়। ভারত থেকে আগত নৃপতিবৃন্দ এবং মঙ্গর ও উচ্চ বর্ণের অধিবাসীসহ পরাজিত ঠাকুরবংশীয় রাজাগণ তাদের বাধা দেন। এমনকি এই সময়ে মুসলমান বীর সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস বাংলা-থেকে নেপালে গিয়ে অত্যাচার ও লুঠপাঠ করেন।

চৌদ্দশ' শতকে জয়স্থিতি মল্লর রাজত্বে প্রথম শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকেই নেপালের মল্লরাজগণ তাঁদের রাজ্যকে ক্রমাগত উন্নততর করতে থাকেন। এই সময়টিকেই নেপালের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই স্বর্ণযুগ প্রায় তিনশত বৎসর বজায় ছিল।

মল্লরাজগণের মধ্যে যক্ষমল্লরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসরে তিনি নেপাল উপত্যকার বাইরেও রাজ্য সম্প্রসারিত করেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর রাজ্য চারজন উত্তরাধিকারীর মধ্যে ভাগ করে দেন। এইভাবে চারটি রাজ্যের উৎপত্তি হল—কাঠমাণ্ডু, ভাটগাঁও, পাটন ও কীর্ত্তিপুর।

এইসব নগরে মল্লরাজাদের রাজত্বের সময়ে তৈরী অসংখ্য কারুকার্য খচিত কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্মিত হিন্দু দেবদেবীর মন্দির, বৌদ্ধবিহার, অট্টালিকা, নানারকম মূর্ত্তি আজও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই রাজারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে সুন্দর সুন্দর মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করতেন। কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের তাঁদের রাজদরবারে সম্মানের আসন দেওয়া হত। কিন্তু এই প্রতিযোগিতার মনোভাবের মধ্যে যে রেষারেষির ভাব জন্মেছিল, তার বিষময় ফল ফলল। গুর্খারা যখন এদের আক্রমণ করল, তখন তাঁরা একত্র হতে পারলেন না, ফলে গুর্খারা সহজেই তাদের হারিয়ে রাজ্য কেড়ে নিলো। গুর্খারাজত্ব সুরু হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে নেপালের উন্নতশীল সংস্কৃতির উপরেও যবনিকাপাত হয়ে গেল।

গুর্খাদের বিদ্রোহ মধ্য নেপালের গোর্খা শহর থেকে আরম্ভ হয়। এই শহর 'গোরখনাথ' তৈরী করেন। পূণ্যতীর্থ একটি দুর্গ, তারই পাদদেশে এই শহর প্রতিষ্ঠিত।

১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী চিতোর অধিকার করেন, তখন রাজপুত ক্ষত্রিয়দের একটি যোদ্ধাজাতি পালিয়ে এসে এখানে বসবাস করে। এই রাজপুতেরা প্রথমে মধ্যনেপালের পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় নেয় ও পরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশঃ তারা নওয়াকোট পর্য্যন্ত পৌঁছে সেখানকার রাজাকে সরিয়ে ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গোর্খা দখল করে। এরাই তখন থেকে গোর্খা নামে পরিচিত হয়। দুইশত বৎসর শান্ত থাকবার পর তাদের রাজা পৃথ্বিনারায়ণ ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দিগ্বিজয় করতে বের হন এবং অচিরে সমগ্র নেপাল অধিকার করে নেন। নেপাল অধিকার করবার পর তিনি ভারতের অন্যান্য অংশ, যথা, কুমায়ুন, গাড়োয়াল, সিমলা, সিকিম ও তিব্বতের মালভূমি এবং নিম্ন হিমালয়ের উপত্যকাগুলি অধিকার করেন। ফলে ১৮শ শতকের শেষভাগে এইদেশ এখনকার দ্বিগুণ আয়তন হয়ে দাঁড়ায়। গুর্খাদের ভাষাই তখন রাজদরবারের ভাষারূপে ব্যবহৃত হাতে আরম্ভ হয়।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পৃথ্বিনারায়ণ যখন মল্লরাজ্য অধিকার করেন, তখন ইংরেজরা তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠায়। গুর্খারা ইংরাজদের হারিয়ে দেয়। পরে আরও কয়েকবার ইংরেজেরা গুর্খাসৈন্যদের হাতে পরাজিত হয়। ইংরাজেরা বুঝতে পারে যে সৈন্য সংখ্যা প্রচুর বাড়িয়ে না দিলে তারা এই দুর্দ্দান্ত পাহাড়ীদের আয়ত্বে আনতে পারবে না এই ভেবে তারা ৩০,০০০ সৈন্য পাঠায়। ১২,০০০ গুর্খা এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। একবার, মাত্র ৬০০ জন গুর্খা সৈন্য একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি বহুদিন ধরে রক্ষা করে ইংরাজদের প্রচুর ক্ষতি করে এর পরের দুই দুইবার যুদ্ধে ইংরাজরা পরাজয় বরণ করে। শেষে জেনারেল অক্টারলোনীর উন্নততর যুদ্ধকৌশলে রাজধানী কাঠমাণ্ডুর পথ উন্মুক্ত হয়। গুর্খারা তৎক্ষণাৎ পরাজয় স্বীকার করে সন্ধি প্রার্থনা করে। সগৌলীতে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হয়। এই সন্ধির ফলে নেপাল তরাই অঞ্চল এবং সিকিম হারায়। তাছাড়া তারা কাঠমাণ্ডুতে

একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রাখতে বাধ্য হয়। ইংরাজরা তাদের সৈন্য সরিয়ে নেয়। এই "কীর্তির" স্মৃতিতেই কলিকাতার মনুমেণ্ট, সম্প্রতি যার নতুন নামকরণ হ'ল—শহীদ মিনার।

পৃথ্বিনারায়ণ বর্তমান রাজার পূর্বপুরুষ। কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথ্বিনারায়ণ বর্তমান নেপালরাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন। তাঁর পরবর্তী রাজাগণ তার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর, ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর, এক শতাব্দী ধরে মারামারি কাটাকাটি লেগেই রইল।

নেপালে নতুন যুগের সূচনা করেন এক অভিজাত মন্ত্রী, সমসের জঙ্গবাহাদুর রাণা। সেইসময় তাঁর অতুলনীয় বীরত্ব সম্বন্ধে নানারকম গল্প শোনা যেত। তিনি নাকি কেবলমাত্র একখানা নেপালী কুকরীর সাহায্যে বাঘ মেরেছিলেন। তখনকার রাণী তাঁকে প্রধানা মহিষীর দুই পুত্রকে হত্যা করে নিজপুত্রকে সিংহাসনে বসাবার চক্রান্তে জড়াবার চেষ্টা করেন। জঙ্গবাহাদুর তা প্রত্যাখ্যান করেন। সঙ্গে সঙ্গে রাণীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত করবেন বলে ভয় দেখান। যদিও রাণী এই অবাধ্য মন্ত্রীর হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এই চক্রান্তের কথা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে কাউন্সিল রাজা ও রাণীকে ভারতবর্ষে নির্বাসিত করেন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দেশে ফিরে এলেন, কিন্তু তখনো তিনি প্রধানমন্ত্রীর বন্দীর মতই থাকতে বাধ্য হলেন। কোন কারণে, কোন বিষয়েই তিনি প্রধান অমাত্যের রাজকার্যে হাত দিতে পারতেন না। এইরূপে রাজারা প্রধানমন্ত্রীদের হাতের পুতুল হয়ে রইলেন। এই অবস্থা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল। কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রী "মহারাজা" উপাধি ধারণ করে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

এই "মহারাজা" পদের উত্তরাধিকার সাধারণ নিয়মে প্রদত্ত হ'ত না। এক 'মহারাজার' মৃত্যুর পর তাঁর পরের ভাই 'মহারাজা' হতেন। এইভাবে বংশের শেষ ভাইএর পর ঐ বংশের জ্যেষ্ঠ বংশধরকে

'মহারাজা' করা হ'ত।

আগেই বলেছি, এই সমশের বংশে এক মহৎ 'মহারাজা' জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর নাম চন্দ্র সমশের জঙ্গ বাহাদুর (১৯০১-১৯ ৯) তিনি কঠোর হস্তে, কূটনীতিজ্ঞের মত রাজ্যে শাসনশৃঙ্খলা স্থাপন করেন। রাজ্যে রাজকর্মচারীদের মধ্যে উৎকোচপ্রথা উঠিয়ে দেন এবং যোগ্য ব্যক্তিকে যথাসাধ্য সম্মানে ভূষিত করা সুরু করেন বর্তমান নেপালের শিল্প-সংক্রান্ত উন্নতির সোপান স্থাপিত হয় এঁরই চেষ্টার ফলে। তিনি কাঠমাণ্ডুকে আলোকিত করবার জন্য দুটি বিদ্যুৎ-সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারতের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপিত হয়, ভারত সীমান্ত থেকে ভীমফেদা পর্যন্ত রাজপথ তৈরী হয়। কিন্তু মনে হয়, ইচ্ছে করেই কাঠমাণ্ডু উপত্যকার সঙ্গে যোগাযোগটা সম্পূর্ণ করান নাই, সে কথাও আগেই বলেছি।

চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য অপরাধ নেপালে নেই বললেই হয়। তার একমাত্র কারণ এই বললে ভুল হবে যে নেপালীগণ অত্যন্ত সৎ। চন্দ্র সমশেরের বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধততে রাজ্যে চুরি ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধের চিহ্নও লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তিনিই প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয় "ত্রিচন্দ্রকলেজ" স্থাপন করেন। সর্বোপরি "দাসপ্রথা" তিনিই রহিত করেন চন্দ্র সমশেরের রাজত্বের নানাদিক পর্য্যালোচনা করলে আমরা তাঁর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর অজস্র পরিচয় পাই।

তাঁরপরে চারজন "মহারাজা" রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁর মত এত গুণাবলীর অধিকারী কেহই ছিলেন না।

সব মহারাজারাই কিন্তু ভারতস্থ বৃটিশের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখবার প্রয়োজন বুঝতেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাণা বৃটিশদের সামরিক সাহায্য দেন, পরিবর্তে তরাই অঞ্চলের অনেকাংশ উদ্ধার করতে সমর্থ হন। যদিও সঙ্গে সঙ্গে নানা সাহেব প্রভৃতি বিদ্রোহের নায়কদের ও তাঁদের সহস্র সহস্র অনুচরদের রাজনৈতিক

আশ্রয় দিতে কার্পণ্য করেন নাই।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডের সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ভারত পরিদর্শনে আসেন, তখন তিনি মহারাজা চন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করে শিকার করতে নেপালের তরাই অঞ্চলে দশদিন অতিবাহিত করেন। এজন্য নেপাল রাজসিক বন্দোবস্ত করেছিল। শোনা যায়, সম্রাট এই সময় ৩৯টি বাঘ, ১৮টি গণ্ডার, এবং দুইটি ভাল্লুক শিকার করতে পেরেছিলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্য করবার পর নেপাল নূতন করে বন্ধুত্বের মর্যাদা পাবার অধিকারী হয়। তাই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নতুন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল। রেসিডেন্সীর পরিবর্তে এম্-ব্যাসী স্থাপিত হ'ল। বৃটিশেরা বার্ষিক দশলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়। ভারতের মধ্য দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র, যন্ত্রপাতি আনবার অবাধ অধিকার পেল নেপাল। গুর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বৃটিশেরা বুঝতে পারে যে এদের মত যুদ্ধনিপুণ লোক সর্বত্র মিলবে না। তাই তারা এদের দলে দলে এনে ভারতের সৈন্যদলে ভর্ত্তি করে নেয়। এখনো নেপালের তরাই অঞ্চলের কয়েকটি ঘাঁটি থেকে গুর্খা সৈন্য রিক্রুট করা হচ্ছে। গুর্খারা বর্তমানে বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতি বলে স্বীকৃত।

এতদিন ধরে জঙ্গ বাহাদুর রাণার প্রবর্তিত "রাণা" পরিবার থেকেই সব প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতেন। কেবল তাই নয়, এই অভিজাত পরিবারের লোকেরাই শেষ পর্যন্ত নেপালের একমাত্র পরিবার হলেন, যাঁরা সর্ববিষয়ে কর্তৃত্ব করবার অধিকারী হলেন। তাঁরা প্রচুর ধনসম্পত্তির সহিত শাসন কর্তৃত্ব এবং সৈন্য পরিচালনা করবার অধিকার প্রাপ্ত হলেন। ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির নিয়মে এই পরিবারের ভিতর ভাঙন দেখা দিল। এদিকে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের হাওয়া বইতে লাগল। নেপালের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতবর্ষ কংগ্রেসের পতাকাতলে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালাতে লাগল। নেপালীরাও তাদের দেশে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা

লাভের জন্য নেপাল কংগ্রেস গঠন করে আন্দোলন সুরু করে দিল। বহু নেপালী কারাবরণ করলেন, বহু ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'ল। নেপালী যুবকেরা কিন্তু অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকলেন।

এই সময় একটি অঘটন ঘটল। সাধারণতঃ নেপালের সত্যকার অধিপতি যিনি, রাজা, রাজত্ব শাসনে তাঁর কোন হাতই থাকত না। এখনও সেই অবস্থাই বজায় ছিল। চল্লিশ বৎসর ধরে রাজা হয়েও রাজা ত্রিভুবনের নিজের কোন ক্ষমতাই ছিল না। তিনি যেন স্বর্ণ পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। বিধি নিষেধের মধ্যে তাঁর চলাফেরা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রাজপ্রাসাদের পুরু দেয়াল ভেদ করে বাইরের এই আন্দোলনের খবর কি করে ভিতরে পৌঁছাল। রাজা আর নিজের কয়েদী জীবনে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। ভারতের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে গোপনে দেখাসাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। একদিন রাজা ত্রিভুবন সপরিবারে রাষ্ট্র দূতের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে সেখান থেকে দিল্লিতে পালিয়ে এলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরু তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। ভারতের এই নৈতিক সমর্থনে নেপালী কংগ্রেস উৎসাহ পেয়ে নেপালে তাদের সৈন্য দিয়ে গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করে বসল। জনসাধারণ সকলেই কংগ্রেসকে সমর্থন করত, এমনকি সৈন্যদলের মধ্যেও কংগ্রেস ও রাজাকে সমর্থনের আভাস দেখা দিল।

মুখ্যতঃ "রাণাশাহী"র বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ রাণা পরিবারের প্রধানগণ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে আপোষ মীমাংসার জন্য আগ্রহী হলেন। দুই দলের প্রতিনিধিরা ও রাজা ত্রিভুবন দিল্লিতে আলাপ আলোচনা চালাতে লাগলেন। ফলে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কাঠমাণ্ডুতে ফিরে এসে নতুন অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠনের কথা ঘোষণা করলেন এইভাবে "রাণাশাহীর" পতন হ'ল।

"রাণাশাহীর" পতন হলেও রাণা পরিবারকে একেবারে বাদ দেবার কথা কেউ ভাবতে পারলেন না। তাই নতুন অস্থায়ী গণতান্ত্রিক

গবর্ণমেণ্ট রাজাকে প্রধান করে এবং রাণা পরিবারের পাঁচজন সদস্য ও বাইরের চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হ'ল। রাণাপরিবারেরই মোহন সমশের জঙ্গবাহাদুর রাণা, পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী, অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হলেন।

সেই থেকে প্রতিবৎসর ৭ই ফাল্গুন প্রজাতন্ত্র দিবসরূপে নেপালে উৎসব প্রতিপালিত হয়।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দেই নেপালের প্রধানমন্ত্রী এবং এযাবৎ সর্বেসর্বা মহারাজা মোহন সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাজত্ব ত্যাগ করে ভারতবর্ষে নির্বাসনে চলে আসেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজা ত্রিভুবন মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে মারা যাবার পর ৩৪ বৎসর বয়স্ক যুবরাজ মহেন্দ্র বীর বিক্রম সাহদেব রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

রাজা মহেন্দ্র প্রথমে একটি মন্ত্রীসভা নিয়ে কাজ সুরু করেন। তাঁর উদ্যোগে নেপাল জাতিসংঘের সদস্য হ'ল। তিনি ইটালী, রাশিয়া, চীন, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন। অবশ্য ভারত, বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার সঙ্গে আগে থেকেই কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। রাজ্যের নির্বাচন ব্যবস্থাও সুষ্ঠুভাবে তিনিই পরিচালনা করেন।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে নেপালের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হয়। নেপাল কংগ্রেস দল বি, পি, কৈরালাকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে।

নেপালের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াতে বিশ্বের নানা দেশ থেকে এদেশের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার সাহায্য আসতে সুরু করেছে। আমেরিকা থেকে Ford Foundation সাহায্য পাঠাচ্ছে, চীন ও রাশিয়া রাস্তা, ব্রীজ প্রভৃতি তৈরীর কাজে সাহায্য করছে, সুইস্ কারিগরীর সাহায্যে Gyaltshan Gompaতে একটি পনীরের ফ্যাক্টরী তৈরী হয়েছে। ভারতবর্ষ সুন্দরীজলে ওয়াটার ওয়ার্কস ও ত্রিশূলীতে মস্ত একটি হাইডেল প্রজেক্ট তৈরী করে দিচ্ছে, তাছাড়া

ত্রিভুবন রাজপথের কথা আগেই বলেছি।

অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে রাজা মহেন্দ্র নেপাল রাজ্য নিজের চোখে দেখবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। এর আগে একথা অচিন্ত্যনীয় ছিল, কেননা নেপালের অধিকাংশ অঞ্চল এখনো দুর্গম। কিন্তু রাজা কোন বাধাই মানলেন না। তিনি যেখানে সম্ভব মোটরগাড়ীতে ও ঘোড়ার পিঠে গেলেন, যেখানে তা সম্ভব হল না, সেখানে পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরলেন। এইভাবে সুদীর্ঘ ছয়মাস ধরে বহু দুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণ করে দেশের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। প্রজাদের সুখদুঃখের খবর সংগ্রহ করে যথাযোগ্য সাহায্যের বন্দোবস্তেরও ত্রুটি করেন নি।

নেপাল পরিভ্রমণ করে রাজা মহেন্দ্র দেশের আভ্যন্তরিন যোগাযোগ ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা দেখে পূর্বসীমান্ত থেকে পশ্চিমসীমান্ত অবধি একটি রাজপথ নির্মাণ করবার সঙ্কল্প করলেন। এর আগে মহারাজা পঞ্চম শমশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এর উদ্যোগ হয়েছিল কিন্তু কাজ বেশীদূর এগোয় নি। এখন নেপালের পূর্বে অবস্থিত কোন জায়গা থেকে পশ্চিমের কোথাও যেতে হলে অনেক ঘুরে যেতে হয়। দক্ষিণে ভারতের মধ্যে প্রবেশ করে রেলপথে গিয়ে তবে আবার নেপালের ভিতরে যাওয়া। এমন কি তরাই অঞ্চলের বড় বড় শহর যেমন বিরাটনগর, বীরগঞ্জ, জনকপুর, নেপালগঞ্জ, ভৈরবা প্রভৃতি শহরের মধ্যেও এরোপ্লেন ছাড়া সোজাসুজি মোটরে বা ট্রেনে যাতায়াত করা যায় না। তাই নেপালে এই রকম একটি রাস্তা তৈরী করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছিল।

এই রাস্তা তৈরীর জরিপের কাজ হয়েছিল বি, পি কৈরালার সময় রাশিয়ান বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক। কিন্তু ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই এপ্রিল রাজার স্বয়ং উপস্থিতিতে এই রাস্তা তৈরীর কাজ নেপালীরা নিজেরাই সুরু করে দিল। কাজ আশাতীত ভাবে দ্রুত অগ্রসরও হয়। নেপালীদের কাজে উৎসাহ যোগাচ্ছেন কবি ধর্মরাজ থাপা। কবি স্বরচিত গান গেয়ে জনসাধারণকে কাজে উদ্বুদ্ধ করছেন। কিন্তু কাজ

সুরু হবার কিছুদিনের মধ্যেই বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানানো হ'ল। সর্বপ্রথম সাড়া দিলেন রাশিয়ানগণ, তারপর ক্রমে ক্রমে চীন, বৃটেন, আমেরিকা ও ভারত। এক একটি অঞ্চলের রাজপথ এক এক রাষ্ট্র তৈরী করবার ভার নিয়েছেন।

এই মহেন্দ্র রাজমার্গর কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সাংবাদিক-দের মতে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই একাজ শেষ হয়ে যাবে। এ পথ তৈরী শেষ হলে পূর্বে মৌহ নদী থেকে পশ্চিমে মহাকালী নদী পর্যন্ত যোগা-যোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবে। দুটিই-নেপাল-ভারত সীমান্তে। কিন্তু এই রাজপথ তৈরী শেষ হলেও নেপালের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার বহু দেরী, তখন সুরু হবে দক্ষিণ থেকে উত্তরাঞ্চলে যাবার বিভিন্ন দিকে পথ তৈরীর কাজ। তাই কবির গান তখনো চলবে, তখনো নেপালীদের কাজে উদ্বুদ্ধ করে কবি ধর্মরাজের নিরলস কণ্ঠ গান গেয়েই যাবে।

ভারতের পরই নেপালের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে তিব্বতের নাম করতে হয়। নেপালের উত্তরে তিব্বতের মালভূমিতে বহুযুগ আগে থেকে নেপালের সঙ্গে যাতায়াত ছিল, বাণিজ্য-সম্বন্ধও ছিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত চীনের অধিকারে চলে যাবার পর সেখানকার অবস্থার পবিবর্তন ঘটে। ১৯৫২-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তারপর থেকে ধীরে ধীরে কিছুদিন ধরে তিব্বত ও চীনের সঙ্গে নেপালের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠছে। কাঠমাণ্ডু থেকে বাস-সড়ক তৈরী হয়েছে তিব্বত সীমানা পর্যন্ত—কাঠমাণ্ডু-কোডারী রোড। এই রাজপথ কাঠমাণ্ডু থেকে বানেপা হয়ে ইন্দ্রাবতী নদীর উপর ব্রীজ পার হয়ে উত্তরে সোজা সীমান্ত সহর কোডারী গেছে, সেখান থেকে লাসা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। চীনা কারিগর নেপালী মজুরদের সহায়তায় এই পথ তৈরী করেছে। কাঠমাণ্ডুর বাজারের দোকানে দোকানে আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব দেশের তৈরী মাল সাজানো দেখা যায়, অবশ্য তার মধ্যে ভারতীয় মালেরই প্রাধান্য চোখে পড়ে।

তিন

নেপালের তীর্থ মুক্তিনাথ দেখা শেষ করে প্লেনে পোথারা থেকে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু এলাম। এই প্রথম আমাদের কাঠমাণ্ডু আসা। কাঠমাণ্ডুর এয়ারপোর্টটি ছোট, কিন্তু বেশ ছিনছাম পরিচ্ছন্ন। পাহাড়ঘেরা উপত্যকার মধ্যে সবুজ ঘাসে ঢাকা, ঝকৃঝক্ করছে। বহু ট্যুরিষ্ট এসেছেন বিভিন্ন দেশ থেকে। অবশ্য আমেরিকানদের প্রাধান্যই বেশী। অনেক পর্বতারোহীকেও দেখতে পেলাম, সঙ্গে তাদের রুকস্যাক বোঝাই মাল, পর্বতারোহণের যোগ্য মালবোঝাই কিটব্যাগ। হিমশৃঙ্গ বহুল নেপাল দেশ, তাই নেপাল পর্বতারোহীর স্বর্গ।

কাষ্টম্সের বেড়া ডিঙোনো ভারতীয়দের পক্ষে কঠিন নয়, কিন্তু অন্য বিদেশীদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। ছোট কিন্তু সুসজ্জিত আধুনিক বিশ্রামাগার আছে। এয়ারপোর্টের বাইরে বের হয়ে এলাম। কেমন যেন চেনা চেনা মনে হয়, কোথায় যেন ভারতবাসীর সঙ্গে মিল আছে নেপালীদের। তেমনি ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, অর্ধনগ্ন; দরিদ্র কুলির দল দৌড়াদৌড়ি করছে মাল বইবার জন্য। ট্যাক্সিও পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গেই, কিন্তু অধিকাংশই অত্যন্ত পুরনো ঝরঝরে। তাও পড়ে থাকতে পায় না, এত চাহিদা। এয়ারপোর্ট থেকে চওড়া

বাঁধানো রাজপথ চলে গেছে কাঠমাণ্ডু শহর অবধি। মাইল চার পাঁচেক দূরে শহরের মধ্যস্থলে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌সের অফিসের পিছনেই মাড়োয়ারী সেবাসমিতির বাড়ী। সহজ ভাষায় সস্তার হোটেল। এখানে থাকবার চলনসই ব্যবস্থা, খাদ্যের ব্যবস্থাও আছে, তবে কেবল নিরামিষ। কাছে পিঠে আরও হোটেল আছে, মস্ত মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো বিলিতি ঢঙের হোটেল—Panaroma Hotel, Paras Hotel, Soaltee Hotel, Hotel Annapurna প্রভৃতি। যেমন তাদের কৌলিন্য, তেমন মূল্য দিতে হয়। অর্থবান বিদেশী, বিশেষ করে আমেরিকানদেরই আনাগোনা সেখানে বেশী। ছোটখাট রেষ্টুরেণ্টও আছে, বিভিন্ন রুচির খাবার সেখানে পাওয়া যায়। আমরা কিন্তু সেবাসমিতিই পছন্দ করলাম। থাকবার ঘর আলাদা পাওয়া গেল বলেই। বেড়ানোটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। টাকাটা দেহের সুখে ব্যয় না করে যত বেশী জায়গা দেখা যায় অল্পসময়ের মধ্যে, তার জন্যেই আমরা ব্যস্ত বেশী।

বাজারও কাছেই, নামটি বড় সুন্দর, ইন্দ্রচক। অসংখ্য 'কিউরিও শপ'—বিদেশীদের মনোহরণের জন্য মনোরম করে সাজানো। নেপালের তৈরী ধাতুর দ্রব্য, পাথর বসানো পিতলের মূর্তি প্রভৃতি। সূক্ষ্মকারুকার্যকরা নানা দ্রব্যে বোঝাই। বিদেশ থেকে আমদানী করা আধুনিক পোষাক পরিচ্ছদের দোকানও কম নেই। আলোয় আলোয় জমজমাট।

কাঠমাণ্ডুর আসল বাজার দেখতে হলে আর একটু এগিয়ে যেতে হবে 'আসানে'। চৌমাথার মোড় পেরিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে ধীরে ধীরে অলিগলির সুরু, আর সুরু নোংরা জামাকাপড় পরা নেপালীদের ভীড়। অধিকাংশ নেপালীরা মাথায় কালো টুপী পরে, গায়ে গরম কোট ও সরু চোঙা পাজামা। মাল বয় তারা কাঁধে ঝোলান বাঁকের মাথায় ঝুড়িতে, নয়তো পিঠের চৌকো ঝুড়িতে, সে ঝুড়ি ফিতে দিয়ে কপালে আঁটা।

মাড়োয়ারী সমাজ এখানেও জাঁকিয়ে বসেছে। বহু দোকান এদের মালিকানাতে। নেপালী কর্মচারী রেখে তারা দোকান চালাচ্ছে।

অলিগলি ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যেন কলকাতার বড়বাজারের একাংশ তুলে এনে কাঠমাণ্ডুর আসান বাজারে বসানো হয়েছে।

এখানকার কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল গাঙ্গুলিমশাই এখানে থেকে থেকে নেপালী বনে গেছেন। অনর্গল নেপালী ভাষায় কথা বলেন, পোষাকও নেপালী ধরনে পরেন। তিনি একদিন আসান বাজারের মধ্যে "বড়বাজারে" নিয়ে গেলেন। কাঠমাণ্ডুর পশমিনার চাদর বিখ্যাত, সেই চাদর কিনবেন উমাপ্রসাদ দাদা। অনেক অলি-গলি ঘুরে ঘুরে আধ-অন্ধকার এক নোংরা গলির মধ্যে ভিড় ঠেলে সরু সিঁড়ি বা কাঠের মই বেয়ে কাঠের দোতলায় উঠে দেখি বিরাট ব্যাপার! এত ভীড় এখানে! বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাতে তৈরী গরম কম্বল, চাদর এসেছে, কেনাবেচা হচ্ছে পাইকিরি হারে। কত দূর দূরের গ্রাম থেকে লোকেরা বয়ে বয়ে এনেছে তাদের ঘরে তৈরী গৃহপালিত ভেড়ার লোমের তৈরী কম্বলাদি। স্তূপাকার করে রাখা। যেন দম আটকে আসছে। ২৫০।৩০০ নেপালী টাকা দামের পশমীনার সূক্ষ্ম চাদরও পাওয়া গেল। এক একটা চাদর এমন মোলায়েম ও হালকা, অথচ অসম্ভব গরম হয়, লেপের অভাব মেটাতে পারে। টেঁকসইও খুব।

কিন্তু সবচেয়ে যা ভাল লাগল তা হ'ল এখানকার কারুশিল্প। কাঠমাণ্ডুর পথে ঘাটে কারুশিল্প ছড়ানো। এখানকার শিল্প ও ভাস্কর্য্য দেখতে হলে আর্ট মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারীতে খুঁজে বেড়াতে হয় না। পথে ঘাটে সর্বত্র পুরণো ঘরবাড়ীর চৌকাঠ, জানালা, দোকান পাট, বাজার ঘর সবই সূক্ষ্ম শিল্পীদের দিয়ে তৈরী করান। দূর থেকে কাঠমাণ্ডুর বাজার দেখতে দেখতে এলে মনেই হবে না যে বাজারে

ঢুকছি। মনে হবে মন্দির ও প্যাগোডা দেখতে দেখতে চলেছি। ভীড় বুঝি ওই প্যাগোডা বা মন্দিরের পূজার্থীদের। প্যাগোডা ও মন্দিরের চত্বরেই ফলমূল, শাকশব্জী বিক্রি হচ্ছে। বর্তমানের সভ্যতার অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ঘরবাড়ী, প্রাসাদ তৈরী হয়েছে। নতুন নতুন আধুনিক রুচিসম্মত রেষ্টুরেন্ট ও হোটেল সর্বত্রই ছড়ানো। বিশাল বিশাল আধুনিক অট্টালিকা উঠেছে বিশেষ করে এম্ব্যাসীগুলির জন্য। বর্তমানের প্রগতিশীল রুচি তাই অতীতের শিল্পকে ঢেকে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কিন্তু অতীতের কাঠের কারুকার্য্য ও স্থাপত্যশিল্প বর্তমান সভ্যতার স্থাপত্যের চেয়ে অনেক উঁচু দরের। তাই কাঠমাণ্ডুর পুরনো সহরের ভিতর মাইলখানেক হাঁটলেই মনে হয়েছে যেন কোন স্বপ্নপুরীতে পৌঁছে গেছি।

চার

কাঠমাণ্ডুর আসল নাম কাষ্ঠমণ্ডপ। অতীতে এই স্থানের নাম ছিল কান্তিপুর। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মী নর সিং মল্ল একটি আস্ত গাছের কাঠ থেকে একটি বিশাল মণ্ডপ-গৃহ নির্মাণ করান। সেটি আমরা দেখতে পেলাম। বহু পুরণো তাই অনেকাংশ ভেঙে গিয়েছে, এখন মেরামত হচ্ছে। সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা এই পুরাতন মণ্ডপগৃহটি আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করছে। কাষ্ঠমণ্ডপের অপভ্রংশই ক্রমশ 'কাঠমাণ্ডুতে' পরিণত হয়েছে।

কাঠমাণ্ডুর রাজবাড়ী আধুনিক রুচি সম্মত করে তৈরী করান, শহরের কেন্দ্র থেকে সামান্য দূরে বিরাট এলাকা জুড়ে—দূর থেকেই দেখা গেল। এই সব এলাকা আধুনিক ধাঁচে তৈরী, বিরাট চওড়া রাস্তা, অগুনতি মোটরের আনাগোনা, কাছেই বিরাট ময়দান—প্যারেড গ্রাউণ্ড, পাশে রাণী-পোখরী—বিশাল সুরক্ষিত পুষ্করিনী, সু-উচ্চ ঘণ্টাঘর, মস্ত পোষ্টাপিস। প্রাচীন রাজাদের বাসগৃহ যেখানে ছিল, সেখানকার রূপ কিন্তু অন্যরকম। সেখানকার নাম হনুমান ঢোকা। মল্লরাজ বংশের অন্যতম রাজা প্রতাপমল্ল ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজাদের বাসের জন্য বিশাল প্রাসাদ তৈরী করিয়েছিলেন। এখন সেই রাজপ্রাসাদটি মিউজিয়মে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই এলাকাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য করা অট্টালিকা আছে।

তার মধ্যে তেলেজু মন্দিরটি রাজা মহেন্দ্র মল্ল তৈরী করিয়েছিলেন, দেখতেও ভারি সুন্দর। ভৈরবের একটি বিশাল ত্রাসোৎপাদক মূর্ত্তি আছে, সৃষ্টি ও ধ্বংসের রূপ নিয়ে এই বিশাল মূর্ত্তি অদ্ভুত দেখতে। ষড়ভুজ মূর্ত্তি, গলায় মুণ্ডমালা, পদতলে অসুর নিধন করছেন। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে পারা যায় না যেন!

বসন্তপুর দরবার গৃহ বা নওতালা দরবার, রাজ্যাভিষেকের চত্বর, প্রজাদের সভার জন্য বিশাল সভাগৃহ, ঘণ্টাঘর, এসবেরও শিল্প কলা দেখলে আনন্দ হয়।

দরবার ক্ষেত্রের কাছেই আছে কুমারী দেবীর মন্দির। কুমারী পূজা নেপালের জনজীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মন্দিরটি অপূর্ব-কারুকার্য্যময়। সূক্ষ্ম কারুকার্য্যকরা কাঠের জানালা দরজা, ঝুলানো বারান্দায় পরিশোভিত। এই কুমারী পূজা এখানকার একটি বিশেষ উৎসব। রাজ্যের প্রধান পুরোহিত দেবীকে নির্বাচন করেন। অনেকগুলি বালিকার মধ্যে যিনি নানারকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হ'ন, তিনি দেবীরূপে মনোনীতা হ'ন। শুনেছি, সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হ'ল এই, কুমারী দেবীকে সারারাত ধরে একটি নির্জন ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়। সেই ঘরে সদ্যছিন্ন মহিষমুণ্ড থাকে। কুমারী দেবী যদি ভীতা না হয়ে রাত কাটাতে পারেন, তবেই তিনি যথার্থ দেবী বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। বয়ঃ প্রাপ্ত না হওয়া অবধি কুমারী দেবী দেবীরূপে পূজিতা হ'ন। তাঁর নিজস্ব বাসগৃহের দোতলার ঝোলান বারান্দা থেকে তিনি তাঁর ভক্তজনকে দর্শনদানে তৃপ্ত করেন। শুনেছি, ইন্দ্রযাত্রা উৎসবের সময় কুমারী দেবীকে শোভাযাত্রা করে নগর প্রদক্ষিণ করান হয়। ঐ সময় দেবী রাজার পূজা গ্রহণ করেন। নেপালের রাজাকে নেপালের প্রচলিত রীতিতে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করা হয়।

দরবার ক্ষেত্রের কাছে রাজা প্রতাপ মল্ল ও তাঁর চার ছেলের মূর্তি আছে। প্রস্তরের পদ্মশোভিত স্তম্ভের উপরিভাগে উপবিষ্ট মূর্তি। ভাস্কর্য্যের অপূর্ব নিদর্শন এগুলি।

পাঁচ

আমাদের কাছে সাধারণত নেপালের তীর্থ বলতে পশুপতিনাথই বোঝায়। এমন নয় যে ভারতীয়দের কাছে নেপালের অন্যান্য তীর্থ-স্থানগুলির কোন মূল্য নেই, তবে পশুপতিনাথের নামই সবচেয়ে বেশী পরিচিত। আমাদের চেনাজানা অনেকেই নেপালে এসেছেন, এসেছেন পশুপতিনাথে পূণ্য সঞ্চয় করতে। আমার মনে পড়ে, শুনেছি আমার শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী এঁরা একদল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে এসেছিলেন। তখন প্রায় মাইল চল্লিশ মত পথ হাঁটতে হ'ত। এসেছিলেন কেবল পশুপতিনাথে মহাশিবরাত্রিতে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে। সে কতকাল আগের কথা, তারপর কত কাল কেটে গেছে, কত পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তীর্থ হিসাবে পশুপতিনাথ এখনো সকলের নিকট চরম আকর্ষনীয় হয়ে রয়েছে।

কাঠমাণ্ডু শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে মাইল তিনেক দূরে পুণ্যতোয়া বাগমতী নদীর তীরে পশুপতিনাথের এই বিখ্যাত মন্দির। শহর থেকে যাতায়াতের জন্য নিয়মিত বাস সার্ভিস আছে। ট্যাক্সিও যায়। সহরের প্রান্তদেশে নিস্তব্ধ সুন্দর পরিবেশে মন্দিরের অবস্থিতি। মন আপনা আপনিই প্রসন্নতায় ভরে ওঠে।

অপরূপ কারুকার্যময় তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করেই প্রথমে চোখে পড়ল সামনের অঙ্গনে বিশাল স্বর্ণময় বৃষ—নন্দীর মূর্তি, শিবের

বাহন। মন্দিরের অঙ্গন শ্বেত ও কষ্টিপাথরে বাঁধানো, তারপরই শ্বেতপাথরের চার পাঁচটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে মন্দিরের চত্বর। প্যাগোডার ঢংএ তৈরী তিনটি চূড়াবিশিষ্ট কারুকার্যখচিত মন্দির। মন্দিরের চূড়াগুলি স্বুবর্ণমণ্ডিত, রৌদ্রালোকে জ্বল জ্বল করছে।

চৌকোনো মন্দিরের চারটি দরজাই রৌপ্যমণ্ডিত। কারুকার্যময় গর্ভগৃহ রৌপ্যনির্মিত রেলিং দিয়ে ঘেরা। চারিদিক ঘুরে শ্বেত ও কষ্টি পাথরের বারান্দা। বারান্দায় রূপার টাকা বসানো—ঠিক যেমনটি আছে বিশ্বনাথের মন্দিরে। মন্দির খোলা থাকলে চারটি দরজার সম্মুখে সর্বদাই পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর ভীড় থাকে। মন্দিরে শিবের পঞ্চমুখ জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপিত। তাতে বসান সোনার চোখ জ্বল জ্বল করছে।

পশুপতিনাথের মন্দির রাজ্য সরকার থেকে তদারক করা হয়। তাই এখানকার ব্যবস্থাও অত্যন্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ। পূজারীগণ নিয়মিত সময়ে রক্তবর্ণ বস্ত্রভূষিত স্বর্ণময় কারুকার্য করা গরম পোষাকে নগ্নপদে শিবের সেবা করেন। গম্ভীর স্বুরে ঘণ্টাধ্বনি হয় বাইরে, পূজারীগণ সর্বদাই মুখে মন্ত্রপাঠ করেন, হাতে পূজার কাজ। ধনী নির্ধন ভেদাভেদ নেই, দরজার বাইরে থেকে সকলেই সমভাবে স্নান, আরতি প্রভৃতি দর্শন করে তৃপ্তি পান। পূজারী সমানভাবে দেবতাকে সকলের পূজা দেন, সকলকে প্রসাদ বিতরণ করেন, মঙ্গলারতির দীপ স্পর্শ করান।

পশুপতিনাথের মন্দিরের চত্বরের চারদিকে আরও কয়েকটি মন্দির আছে, তাতে নানা হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপিত। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি। মন্দিরের ঠিক পিছনে একটি অপরিসর চৌবাচ্চা আছে। তাতে পাথরের একটি মূর্তি শয়ান—অনন্তশয্যায় নারায়ণ। এই মূর্তি পেরিয়ে অঙ্গনের শেষপ্রান্তে অনেকগুলি সিঁড়ির ধাপ সোজা নেমে গেছে, বাগমতী নদী অবধি। খরস্রোতা নদীটাতে জল বেশী নেই, হেঁটে পার হওয়া যায় সহজেই। পুণ্যতোয়া বাগমতীতে স্নান করে পশুপতিনাথ দর্শন এই বিধি।

নদীর ওপার থেকে পশুপতিনাথের মন্দিরের পূর্ণ আকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। অপরূপ কারুকার্যখচিত, নানা বর্ণরঞ্জিত রাজসিক সে রূপ। চোখ যেন ঝল্‌সে যায়।

চত্বরের প্রাঙ্গন পার হয়ে পাশে আরেকটা অঙ্গনে প্রবেশ করা যা। সেখানে একটি "গোলকধাঁধাঁ" তৈরী করা আছে। ১০৮টি শিবলিঙ্গ সারি সারি সাজিয়ে এটি তৈরী। প্রথা, যাত্রীগণ জলপূর্ণ পাত্র নিয়ে বাঁদিক থেকে শিবের মাথায় জলদান করতে সুরু করবেন, ১০৮টি শিবকে জলদান না করে সে ধাঁধাঁ থেকে বের হওয়া যাবে না।

মহা শিবরাত্রিতে এখানে মস্ত মেলা বসে। তখন শুনেছি, লক্ষ দীপ জ্বালান হয়, সারারাত ধরে চলে পূজার্চনা। উপবাসী থেকে হাজার তীর্থযাত্রী শিবমহিমা গান করে শিবপূজা করেন। এই সময়েই বিশেষ করে, ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী পশুপতিনাথ আসেন।

প্রথমদিন পশুপতিনাথ দেখবার সময় গাঙ্গুলিমশাই সঙ্গে ছিলেন। বললেন, একবার পূর্ণিমার দিন আসুন, এখানে প্রতি পূর্ণিমাতে অন্নকূট হয়। নেপাল সরকারের তরফ থেকে ঐদিন শব্জীসহ ঘৃতপক্ক অন্ন স্তূপাকার করে পশুপতিনাথের মন্দিরের চত্বরের উপর রাখা হয়। সর্বসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সে একটা দেখবার মত ব্যাপার।

আমাদের হাতে সময় কম, তাই সে উৎসব দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। কথিত আছে, পশুপতিনাথ শিব, অরণ্যে হরিণের মূর্তিতে বিচরণ করছিলেন। এক শিকারীর তাড়া খেয়ে তার হাত এড়াতে না পেরে গহন বনে এইরূপ শিবমূর্তিতে আত্মগোপন করে থাকেন। পরে এই পঞ্চমুখ শিবরূপেই তার প্রকাশ হয়।

এই মন্দিরে এবং নেপালের অন্য অনেক হিন্দু মন্দিরে হিন্দু ও বৌদ্ধ ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রবেশাধিকার নেই।

একাধিকবার কাঠমাণ্ডুতে বেড়াতে এসেছি, তবারই আমরা পশুপতিনাথের মন্দিরের আকর্ষণে সময়ে অসময়ে মন্দির দর্শন করতে এসেছি। বিশেষ করে সন্ধ্যারতি দেখতে আমরা বারবার ছুটে এসেছি। ধ্যানগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই সন্ধ্যারতি আমাদের মুগ্ধ করেছে। কেবল আরতিই বা কেন, আমরা কতবার এসেছি সকাল দশটায় স্নানপর্ব দেখতে। কতভাবে, কত আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেবতাকে স্নান করানো হয় শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশ, দেখতে আমাদের বড় ভাল লাগত। বেলা বেড়ে যেত, কিন্তু আমরা সেই স্নানপর্বের খুঁটিনাটি দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি কতদিন।

একদিন আরতির শেষে প্রধান পুরোহিত দেবমন্দিরের একটি দুর্লভ বস্তু দেখালেন, সেটি হচ্ছে একটি "একমুখী রুদ্রাক্ষ"। রুদ্রাক্ষর দেশ নেপাল। বহু রুদ্রাক্ষের গাছ আছে এখানে। পঞ্চমুখী, ষড়মুখী, অষ্টমুখী প্রভৃতি নানারকম রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায় এখানে। কিন্তু এখানের এই "একমুখী রুদ্রাক্ষ" নাকি এই একটিই আছে, এই পশুপতিনাথের মন্দিরে। একটি মস্ত রুদ্রাক্ষের মালার লকেট করে বাঁধিয়ে সেটি রাখা আছে।

ছয়

পশুপতিনাথের মন্দিরের অনতিদূরে জগদম্বিকার মন্দির। উমাপ্রসাদ দাদার পরামর্শে আমরা পশুপতিনাথ দেখা শেষ করে সেখানেই চলে গেলাম। সতীর বাহান্নপীঠের অন্যতম—গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির। কারুকার্য্য খচিত, সযত্ন রক্ষিত মন্দির, সুন্দর ছবি আঁকা কারুকার্য্যময় দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশদ্বারে অনেকগুলি সিঁড়ি, দু'দিকে মস্ত মস্ত জোড়া চোখ আঁকা। নাতি-প্রশস্ত চত্বরের মাঝখানে মন্দিরের সুদৃশ্য রৌপ্যমণ্ডিত দরজা। প্রস্তর শৈলী এখানেও লক্ষ্য করে চমৎকার হতে হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমাদের দলের পুরুষেরা তাই বোকার মত বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি একা গর্ভগৃহে প্রবেশ করলাম। সিন্দুর লিপ্ত একখণ্ড প্রস্তর ফুল বেলপাতা ঢাকা, এই হল দেবীর মূর্ত্তি।

কাঠমাণ্ডুর চারমাইল দক্ষিণে চোবর গিরিসঙ্কট। কথিত আছে, মঞ্জুশ্রীদেব তিব্বতে থেকে এসে এইখানে পর্বতমালা ছেদ করে কাঠমাণ্ডু হ্রদের জল নিকাশের পথ করে দেন। এখানে পাহাড়ের উপর আদিনাথের মন্দির আছে। দেখতে প্যাগোডার মত। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে হিমালয়ের তুষার সৌন্দর্য্যের অপূর্ব শোভা দেখা যায়।

কাঠমাণ্ডুর চারমাইল পশ্চিমে কীর্ত্তিপুরে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়। মল্ল রাজাদের রাজধানী এককালে এই কীর্ত্তিপুরেই ছিল। সময়াভাবে আমাদের কোনটাই দেখা হয়নি।

সাত

সমস্ত কাঠমাণ্ডুর দ্রষ্টব্য ঘুরে ঘুরে দেখেছি, কিন্তু আমার মতে এই উপত্যকার প্রস্তর শৈলীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'ল "বুড়া নীলকণ্ঠ নারায়ণ।"

"বুড়া নীলকণ্ঠ" নাম কেন হল, প্রশ্ন করে একথার উত্তর কারু কাছ থেকে পাওয়া গেল না। সত্যি বলতে কি "বুড়া নীলকণ্ঠ" নাম শুনে ভাবলাম, হয়তো কোন প্রাচীন শিবমন্দির দেখতে চলেছি। কিন্তু সেখানে পৌঁছে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

শিবপুরী পর্বতমালা কাঠমাণ্ডুর উত্তরদিকে মাইল ছয়েক দূরে। তারই পাদদেশে এই তীর্থ। আঠারো ফুট লম্বা একটি বিশাল প্রস্তর মূর্ত্তি একটি আস্ত প্রস্তরে খোদিত, এবং একটি প্রস্তর বাঁধানো পুষ্করিণীর জলে অনন্তনাগ বা শেষ নাগের কুণ্ডলিত দেহের উপর শায়িত। শেষ-নাগের সহস্র ফণা শায়িত নারায়ণের মস্তকের উপর ছত্রাকারে শোভা পাচ্ছে। পুষ্করিণীটি ঝরণার জলে সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে।

ঘুরে ঘুরে নানাদিক থেকে আমরা নীলকণ্ঠ নারায়ণকে দেখি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে জলের কাছ অবধি পৌঁছানো গেল, নারায়ণের পদ মূলে। দেখে দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আমরা ক্রমাগত ছবি তুলে চলি, নানাভাবে মূর্ত্তিটি দেখে প্রণাম জানাই এই প্রস্তর শিল্পের সৃষ্টিকর্তাকে।

অপূর্ব সৃষ্টি ! অবর্ণনীয় প্রস্তর শৈলী !

কথিত আছে, এই দুর্লভ সৃষ্টি একজন কৃষক আবিষ্কার করে চাষ করতে করতে সে এটি দেখতে পেয়েছিল, সেও কয়েকশত বৎসর আগেকার কথা।

হরি বোধিনী একাদশীতে সকালে উপবাস থেকে পবিত্র তুলসী বৃক্ষের পূজা করা হয়। পরদিন দলে দলে পূজার্থী এই বুড়া নীলকণ্ঠ নারায়ণকে দর্শন করতে আসেন। লোকের বিশ্বাস, চারমাস নিদ্রার পর ভগবান বিষ্ণু এইদিন জাগরিত হন।

*　　*　　*　　*　　*

দেশাচার অনুসারে নেপালের রাজা এইস্থানে নীলকণ্ঠ নারায়ণকে দর্শন করতে আসতে পারেন না। কেননা, লোকের বিশ্বাস মত তিনি স্বয়ং নারায়ণের অংশ। সেইজন্য অনন্তশয্যায় নারায়ণের অনুরূপ একটি মূর্ত্তি 'বালাজু'তে স্থাপন করা হয়েছে। কাঠমাণ্ডু থেকে বালাজুর সুরম্যউদ্যান উত্তর পশ্চিম দিকে দুই-তিন মাইল দূরে নাগার্জ্জুন পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে মস্ত একটি পুষ্পশোভিত উদ্যানের মধ্যভাগে অনন্তশয্যায় নারায়ণের একটি ছোট মূর্ত্তি জলের মধ্যে স্থাপিত আছে। উদ্যানটিতে বাইশটি ধারায় ঝরণার জল পড়ছে বাইশটি সুদৃশ্য প্রস্তর নির্মত ড্রাগনের মুখ হতে। পুরাতন বাগান ঘিরে বাগান বড় করা হয়েছে, একটি সুইমিংপুলও নতুন তৈরী হয়েছে। পাহাড়ের গা ঘেঁসে একটি পায়ে চলা পথ উঁচুতে উঠে গেছে। আধুনিক রুচি অনুসারে সেখানে রেষ্টুরেন্ট তৈরী সুরু হয়েছে। পুরাতন ও নূতনের সমাবেশে বালাজু উদ্যানের শোভা বেড়েছে বই কমেনি।

আট

কাঠমাণ্ডু মস্ত ছড়ানো সহর। অনেকগুলি চওড়া চওড়া পীচঢালা বাঁধানো রাস্তাও আছে। আধুনিক যুগের কৃপাতে ট্যাক্সিও যথেষ্ট, তাই আমাদের পক্ষে একইদিনে "বুড়া নীলকণ্ঠ" ও "বালাজু" দেখে "স্বয়ম্ভুনাথ" দেখতে যাবার কোন অসুবিধাই হ'ল না।

সহরের কেন্দ্র থেকে দুই মাইল পশ্চিমে ছোট একটি পাহাড়ের চূড়াতে "স্বয়ম্ভুনাথ" একটি বহু প্রাচীন সুরম্য স্তূপ। এই উপত্যকার প্রাচীনতম স্তূপ। লোকে মনে করে এটি দুই হাজার বছরের পুরনো। পৃথিবীর এক বিখ্যাত আকর্ষণ। এই ঐতিহাসিক চৈত্য খাঁটি বৌদ্ধ স্তূপ বলে সকলের ধারণা। ঐতিহাসিকেরা বলেন, এটি নাকি স্তূপের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যই বহন করছে।

বিষ্ণুমতী নদীর ওপর ব্রীজ পার হয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছানো গেল। বহুদূর থেকেই এই মঠের স্বর্ণনির্মিত চূড়াটি পাহাড়ের উঁচুতে জ্বলজ্বল করছে দেখতে পেলাম। নীচে পৌঁছে দেখি প্রায় শ' তিনেক সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে একেবারে পাহাড়ের চূড়া অবধি। সিঁড়ির দুই পাশে কিছুটা পরপর পাথরের তৈরী বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্তি বসানো আছে। সেগুলির অধিকাংশই বড় বড় গাছের তলায় স্থাপন করা হয়েছে। সিঁড়ির শেষ ধাপ পার হলেই উপরে দেখা যায় একটি স্বুবর্ণময় বজ্র স্থাপিত। একটি কারু-কার্য খচিত পাথরের স্তম্ভের উপর এটি জ্বল জ্বল করছে।

চৈত্যটি মাটি ও ইটের তৈরী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি স্তূপ, তার উপর ত্রিকোণাকৃতি একটি চূড়া আছে। চূড়াটির উপরাংশ সুবর্ণমণ্ডিত। পাহাড়ের চূড়াতে অবস্থিত এই মন্দিরটি, তাই কাঠমাণ্ডু উপত্যকার বহু দূর থেকেও এটিকে দেখা যায়। মন্দিরের নীচের অংশ চৌকোনা—চারদিকে চার জোড়া চোখ আঁকা আছে। এইরকম আঁকা চোখ কাঠমাণ্ডুর অনেক মন্দিরেও দেখিছি। লোকে বলে; সর্বদর্শনক্ষম বুদ্ধের চক্ষুর প্রতিকৃতি। এটি এখানকার আরেকটি বিখ্যাত প্রাচীন স্তূপ "বোধনাথ" এর মত অনেকটা দেখতে, কেবল এর গম্বুজটা একটা উল্টানো চায়ের কাপের মত একটু লম্বাটে।

চৈত্যের একধারে একটি তিব্বতী বিহার আছে। সেখানে অমিতাভ বুদ্ধের এক বিরাট সুবর্ণময় উপবিষ্ট মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রশান্তবদন বুদ্ধমূর্ত্তির বেদীর নীচে সারি দিয়ে বসে মুণ্ডিতমস্তক পীতবসনধারী অল্পবয়সী কয়েকজন ভিক্ষু নিবিষ্ট চিত্তে সুর করে শাস্ত্র পাঠ করছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে তাঁদের কেউ কেউ গরাদের ভিতর দিয়ে আমাদের ইশারায় ডেকে অন্দরে প্রবেশ করতে বললেন।

অন্যপাশে প্যাগোডা ঢং-এর এক মন্দিরে শীতলা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত—বসন্ত রোগহারী শীতলা। তাঁর দয়া হিন্দু, বৌদ্ধ সকলেই কামনা করে। স্তূপের গায়ে খাঁজ করে করে অনেকগুলি সুবর্ণময় মূর্তি বসানো, সামনেটা লোহার পাতলা জালে ঢাকা। মূর্তিগুলি হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুদ্ধমূর্তি। আমরা স্তূপটি ঘুরে ঘুরে দেখছি, উনি ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলছেন। তাঁর ছবি তোলা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল, একি! এতো বুদ্ধমূর্তি নয়! ওকে বললাম সেকথা—

"এতো বুদ্ধমূর্তি নয়। এতো কোন নারীর মূর্তি, মাথায় মুকুট, গলায় হাতে গহনা। কোন দেবীর প্রতিমূর্তি? ভাল করে দেখ তো একবার।"

একজন নেপালীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন উনি, সে বলে, ওতো "দশ মহা বিদ্যার" মূর্তি, কেন নীচে লেখা আছে, পড়তে পারো না?

উনি বল্লেন, আমরা কি নেপালী ভাষা জানি যে পড়বো? কোনটা কার মূর্তি, বলো দেখি!

সে তখন দয়াপরবশ হয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাল, এই দেখ এটি কালী, এই তারা, এই ষোড়শী,—এইভাবে ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা—পর পর সবগুলি মূর্তির নাম করে দেখিয়ে গেল।

আমরা তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখি আর অবাক হয়ে ভাবি, কি বিচিত্র এই নেপাল দেশ! কি বিচিত্র এর ধর্ম-সমন্বয়!

শুনলাম স্বয়ম্ভুনাথ হিন্দু-বৌদ্ধ দুই ধরণের লোকেরই তীর্থক্ষেত্র। উৎসব হলে সকলেই সেই উৎসবে যোগ দেয়, তাই বৌদ্ধস্তূপে "দশ-মহাবিদ্যার" মূর্তি স্থাপন করা তাদের কাছে আশ্চর্যের বিষয় নয়। কে জানে, কত হাজার বছর আগে থেকে এমনি রীতি চলে আসছে। যেন কত সহজ কত স্বাভাবিক এই দুটি ধর্মের সহাবস্থান। কত সহজ এমন মিলেমিশে থাকা।

বালাজু উদ্যান পার হয়ে বড় রাস্তা ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে ঘরবাড়ী বিরল হয়ে আসে। এমন জায়গায় ডানদিকে একটি ছোট পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে বিখ্যাত পর্বতারোহী Col. J.O.M. Roberts এর ছোট সুন্দর দোতলা বাড়ীখানি। ইনি পর্বতারোহনের ইতিহাসে মস্ত একটি স্থান অধিকার করে আছেন। ইনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কারাকোরামের "মাশের ব্রুম" আরোহণের চেষ্টা করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কুলুর নিকটবর্তী "পার্বতী" উপত্যকা ধরে গিয়ে "White Sail" (২১,১৪৮) আরোহণ করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার কারাকোরামে গিয়ে "সাসের কাংড়ি" (২৫,১৭০) সার্ভে করেন। ১৯৫০ খ্রীঃ বিখ্যাত পর্বতারোহী টিলম্যানের নেতৃত্বে নেপালের "অন্নপূর্ণা ৪ (২৪,৬৪৪) আরোহণের চেষ্টা করেন। ১৯৫৩ সালে Col Hunt-এর নেতৃত্বে গঠিত প্রথম এভারেষ্ট আরোহণকারী দলের সাহায্য করেন। ১৯৫৪ খ্রীঃ নিজেই বৃটিশ দলের নেতৃত্ব করে নেপালের

Putha Hunchuli আরোহণ করেন। ১৯৬০ খ্রীঃ আবার একটি বৃটিশ দলের নেতৃত্ব করে "অন্নপূর্ণা ৪ আরোহণ করেন।" ১৯৬২ খ্রীঃ "ধৌলগিরি ৪" এর পশ্চিম দিক থেকে পরীক্ষা করে ১৯,০০০ ফুট পর্যন্ত পথ তৈরী করতে সক্ষম হন। ১৯৬৪ খ্রীঃ এভারেষ্ট আরোহণকারী আমেরিকান দলের সাহায্য করেন, বিশেষ করে শেরপা সরবরাহ ব্যাপারে। এখন এখানেই বাড়ী তৈরী করে বসবাস করছেন। বহু বিখ্যাত শেরপা পর্বতারোহীদের নিয়ে ইনি একটি সঙ্ঘও গঠন করেছেন। প্রয়োজন হলে এখানে তাঁর সাহায্য পাওয়া যায়। নেপালের বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধেও নানারকম তথ্য তাঁর কাছ থেকে মেলে।

কাঠমাণ্ডু থেকে সাড়ে তিনমাইল পূর্বদিকে বিখ্যাত "বোধনাথ" স্তূপ। এটি বৌদ্ধ লামাধর্মের কেন্দ্রস্থল বলে বিখ্যাত। স্বয়ম্ভুনাথের মত এটিও দুই হাজার বছরের পুরাতন বলে দাবী করা হয়। এটি নাকি পৃথিবীর মধ্যে একটি উচ্চতম স্তূপ।

কথিত আছে, ভগবতী মণিযোগিণীর আদেশে নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য রাজা মানদেব এই স্তূপটি নির্মাণ করেছিলেন। অষ্টভুজ বনিয়াদের ভিত্তির উপর স্থাপিত স্তূপটি ৩৮ মিটার উঁচু, ব্যাস ৩৮ গজ। নীচের অংশে ধর্মচক্র শোভিত। তার উপর শ্বেত স্তম্ভ, স্তম্ভের মধ্যে খাঁজে খাঁজে গোলাকারে আশিটি বুদ্ধমূর্তি শোভা পাচ্ছে। বিশাল শ্বেত স্তম্ভের উপর চৌকোনো গম্বুজ—তার উপর সর্বদর্শী বুদ্ধের শান্ত নীল চক্ষু আঁকা। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারিদিকে চার-জোড়া চক্ষু আছে। যেন দেখানো হয়েছে যে, ভগবান বুদ্ধের দৃষ্টি মানবের হিতার্থে সদ্‌বুদ্ধির দিকে সর্বদাই সজাগ।

আমরা বিশাল স্তূপটিকে প্রদক্ষিণ করি, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মচক্রগুলি নাড়িয়ে দিই, সেগুলি ঠুন্ ঠুন্ করে বাজতে বাজতে ঘোরে। স্তূপের চারদিক ঘিরে তিব্বতী ও নেওয়ারী বৌদ্ধদের ঘরবাড়ী। কাছেই এখানকার লামাদের বাসগৃহ। এখানকার প্রধান লামা—"চিনিয়া

লামা” এখানেই থাকেন। ইনি দালাইলামার প্রতিনিধি বলে পরিচিত। বোধনাথ স্তূপ বৌদ্ধজগতের প্রকাণ্ড আকর্ষণ। বিশেষতঃ বার্মা, সিংহল ও তিব্বতীদের নিকট এটি একটি মস্ত তীর্থ বলে পরিগণিত। আজকাল বহু তিব্বতী উদ্বাস্তু এসে এখানে বাসা বেঁধেছেন।

শ্বেত মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দিরের উল্লেখ করলেই বোধহয় মোটামুটি কাঠমাণ্ডু উপত্যকার প্রাচীন দর্শনীয় স্থানের নাম বলা শেষ হয়ে যাবে। করুণার ভগবান মচ্ছেন্দ্রনাথ এখানে হিন্দুবৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলের নিকট পূজা পান। ইনি বৃষ্টির দেবতা বলেও প্রচলিত। এটি মচ্ছেন্দ্রবাহালে অবস্থিত প্যাগোডা ধরণের মন্দির।

নয়

ললিতপুর বা পাটন ঃ

কাঠমাণ্ডু থেকে পাটন বা ললিতপুর বেশীদূরে নয়. মাত্র তিন মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এই নগরের প্রাচীন নাম ললিত পাটন অর্থাৎ সূক্ষ্ম শিল্পের নগর। শোনা যায়, এই সহর ২৯৯ খ্রীষ্টপূর্বে রাজা বীরদেব পত্তন করেন।

আগেই বলেছি, খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ সালে প্রিয়দর্শী আশোক নেপাল ভ্রমণ করেন। তখনও এই সহর জমজমাট ছিল। এখানে তিনি চারটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন, এক একটি সহরের এক এক কোণে। স্তূপগুলি ইঁট ও মাটীর তৈরী। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, উপরে পাথরের গম্বুজ ছিল। এখন গম্বুজের কোন চিহ্ন আমরা দেখতে পাইনি, কেবল স্তূপের ধ্বংসাবশেষ সামান্য পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকেরা বলেন, এই স্তূপগুলি আসলে চৈত্য।

ললিতপাটন নামকে সার্থক করে পাটনের লীলায়িত সৌন্দর্য সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে, সর্বত্রই কারুশিল্পের ছড়াছড়ি। সরু সরু গলির দু'পাশের ঘরবাড়ীগুলি কাঠমাণ্ডুর পুরাতন ঘরবাড়ীর মত কারুকার্য করা কাঠের দরজা, জানালা, বারান্দা কড়িবরগা শোভিত। দরবার স্কোয়ারের শোভাও অপূর্ব। শত শত বৎসর আগেকার শিল্পীদের হাতের কাজ সহরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে পথ চলি।

মল্ল শাসকদের প্রাসাদের নিকট অনেকগুলি সুন্দর মন্দির, ঝরণা প্রভৃতি ছিল। এখন অবশ্য তার খুব অল্প অংশই চেনা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হল, রাজা যোগনরেন্দ্র মল্লর স্বর্ণমূর্তি, রাজাদের স্নানগৃহ, মূলচক, আর্কেওলজিকাল গার্ডেন ইত্যাদি।

ললিতপাটনের যে কয়েকটি বিখ্যাত শিল্পের নিদর্শন দেখা যায়, তার মধ্যে লোকেশ্বর বুদ্ধের স্বর্ণমন্দির "হিরণ্যবর্ণ মহাবিহার" বিশেষ আকর্ষণীয়। এটি বারশত খ্রীষ্টাব্দে রাজা ভাস্কর বর্মা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

একটি সরু গলিরাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে এই জমকালো বৌদ্ধ-মন্দিরে পৌঁছাতে হল। মন্দিরের মূর্তিগুলি স্বর্ণময়, পিত্তলের, কাঠের ও পাথরের উপর খোদাই করা। এই সব মূর্তি দিয়ে প্যাগোডাকৃতি মন্দিরের তিনটি তলাই সুশোভিত। যখনই যাওয়া যায়, সর্বদাই পুণ্যার্থীদের দেখা যায়, তারা চারিদিকে বসানো "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ" লেখা ধর্মচক্রগুলি নেড়ে নেড়ে দর্শন করে যাচ্ছেন। আমরাও তাদের পথ অনুসরণ করে চলি।

ললিতপাটনের দরবার ক্ষেত্র একটি বিশাল উঠানের মত। এক-ধারে মস্ত একটি কৃষ্ণমন্দির। ভগবান কৃষ্ণের এই মন্দিরটি রাজা সিদ্ধিনারায়ণ সিংহ মল্ল ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী করান।

বেশ বড় মন্দিরটি, কিন্তু এর আয়তনের জন্য যত নয়, এর কারু-শিল্পের জন্য এটি পরম আকর্ষণীয় হয়েছে। এর গঠনও অপূর্ব। কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্মিত এই মন্দিরটির কারুকার্য যদি সবটুকু খুঁটিয়ে দেখতে হয়, তবে সারাদিন কেটে যাবে। সমস্ত মন্দিরটির গায়ে মহাভারত ও রামায়ণের সব ঘটনা খোদিত আছে। আমরা একটু একটু করে দেখতে দেখতে অবাক হয়ে গিয়েছি কি করে মানুষের হাতে এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি হতে পারে। বহু পুরাতন, কিন্তু ছবিগুলি এখনো কত স্পষ্ট, কত প্রাণবন্ত।

পাটনের আরেকটি আকর্ষণ "মহাবৌদ্ধবিহার"। এই মন্দিরটি

১৪ শতকে শহরের পূজারী অভয়রাজ কর্তৃক নির্মিত হয়।

সরু সরু অলিগলি পেরিয়ে তবে এই সৌন্দর্য্যময় মন্দিরটিতে পৌঁছানো গেল। মস্ত উঁচু বিহার। বুদ্ধগয়ার বিহারের অনুকরণে নির্মিত। শোনা যায়, অভয়রাজ তীর্থ করতে বুদ্ধগয়াতে এসেছিলেন। এখানেই বুদ্ধদেব "বোধিলাভ" করেছিলেন। বুদ্ধগয়ার বিহার দেখে তাঁর এই রকম বিহার নির্মাণ করবার বাসনা হয়। মহা বৌদ্ধ বিহারটির বৈশিষ্ঠ্য যে এটি পোড়ামাটির তৈরী। এর প্রত্যেকটি ইঁটের উপর ছোট ছোট বুদ্ধমূর্ত্তি খোদাই করা আছে। লাল ইঁটের রঙের বিহারটি দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যেতে হয় নেপালের শিল্পীদের শিল্পচেতনার সমৃদ্ধিতে। পোড়ামাটির কাজও এদের কত উঁচুদরের।

কাছেই আরও একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহার আছে। সেখানে প্রস্তর শিল্পের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করলাম। ধাতুর কারুকার্য্যও অজস্র।

রুদ্রবর্ণ মহাবিহারও কাছেই, এটিও প্রাচীন বৌদ্ধবিহার। সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি আছে কারুকার্য্যকরা মন্দিরের মধ্যে। আরও একটু দূরে আছে কুম্ভেশ্বরের মন্দির, মস্ত পাঁচতলা শিবমন্দির।

এই এলাকার সবচেয়ে পুরণো মন্দির হল 'মীননাথের' মন্দির। লোকে বলে এই মন্দিরটি সুবিখ্যাত মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দিরের চেয়েও পুরণো। দেখেও তাই মনে হল। যত্নের অভাবে এখানে ওখানে ঘেণাঘাস গজিয়ে গেছে। ভগ্নপ্রায় মন্দির।

আমরা ঘুরে ঘুরে একটার পর একটা মন্দির দেখেই চলি। যেন এর শেষ নেই। মাথার উপর সূর্য্য জ্বলতে থাকে, কিন্তু তার উত্তাপ আমাদের মনে সাড়া জাগায় না। স্থানীয় একটি লোককে গাইডরূপে সঙ্গে নিয়ে আমরা পাটনের অলিগলি ঘুরে বেড়াই।

এ অঞ্চলে বিশেষরূপে পূজা পান "রক্তবর্ণ মচ্ছেন্দ্রনাথ।" ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে মচ্ছেন্দ্রনাথের এই মন্দিরটি তৈরী হয়। মহাবৌদ্ধবিহার থেকে এক ফার্লং মত পথ এগিয়ে এসে আমরা এই মন্দিরটি দেখতে পেলাম। অবলোকিতেশ্বর বা লালমচ্ছেন্দ্রনাথ এই মন্দিরে ছয়মাসের

জন্য অবস্থান করেন। নেপালীরা বলে, মচ্ছেন্দ্রনাথই এই উপত্যকার রক্ষাকর্তা।

মচ্ছেন্দ্রনাথের যাত্রার সময় হ'ল মে জুন মাস। খুব জাঁকজমকের সঙ্গে কয়েকদিন ধরেই উৎসব চলে। উৎসবের সময় সর্বপ্রথম প্রতিমাকে নদীতে স্নান করানো হয়। কয়েকদিন পর মস্ত একটা উচ্চ-চূড়া বিশিষ্ট কাষ্ঠনির্মিত রথে ঠাকুরকে বসিয়ে সুসজ্জিত করে সহস্র উৎসাহী ভক্তগণ রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যান সেই রথ। যেমন রথযাত্রায় পুরীর জগন্নাথের রথ টানা হয়। সহস্র সহস্র ভক্ত এই দৃশ্য দেখেন। বিভিন্ন রাত্রিতে রথ সহরের বিভিন্ন এলাকাতে অবস্থান করে। যেদিন যে এলাকাতে অবস্থান করে সেদিন সেখানে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পান ভোজন চলে। উৎসবের শেষদিনে প্রধান পুরোহিত দেবমূর্ত্তির বসন উন্মোচন করে ভক্তগণকে মূর্ত্তির পূর্ণ অবয়ব প্রদর্শন করান। লোকে বলে, এই সময় কোন না কোন প্রকার অঘটন ঘটে। সচরাচর বৃষ্টি সুরু হয়ে বৃষ্টিরূপে ভগবান তাঁর ভক্তদের আশীর্বাদ করেন।

দশ

ভাটগাঁও:

কাঠমাণ্ডু থেকে কাঠমাণ্ডু-কোডারী রোড ধরে এগোলে নয় মাইল দূরে ভাটগাঁও সহর। রাজা আনন্দমল্ল ৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন। মতান্তরে, লিচ্ছবিরাজাদের সময় এই সহরটির পত্তন হয়।

কাঠমাণ্ডু থেকে একটা ট্যাক্সি সংগ্রহ করে চওড়া বাঁধানো পথে চলেছি। সবুজ ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পথ। দূরে নীলপাহাড়ের মাথায় কোথাও কোথাও হাল্‌কা তুষারের প্রলেপ দেখতে দেখতে চলা। মনোরম পরিবেশ। খানিক এগিয়ে "থিমি" গ্রাম পড়ল। এই গ্রামটি মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত। তার নমুনা সমস্ত পথ ধরে দেখা গেল। কত অজস্র রকমের মাটির তৈরী জিনিষপত্রে পথের ধারের দোকান সাজানো। তাছাড়া, কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরী এখানকার মুখোশ নেপালের সর্বত্র সমাদৃত হয়। নানারকম উজ্জল রঙে এগুলি চিত্রিত করা হয়। এই মুখোশ পরে উৎসবের সময় নেপালে নাচ হয়। এই মুখোশগুলিতে দেবতা ও দানব দুয়েরই মুখাবয়ব অনুকরণ করে তৈরী করা হয়। কোন কোন মুখোশ কাঠেরও তৈরী হয়, তাতে আবার কারুকার্য্যও করা থাকে।

থিমি গ্রাম পার হয়ে আরও কিছুদূর এগোলে ভাটগাঁও। এর অন্য নাম ভকতপুর বা ভক্তপুর। এই সহরটি নাকি বিষ্ণুর হস্তধৃত শঙ্খের আকৃতির মত, তাই এটি ভকতপুর বা ভক্তদের দেশ।

ভাটগাঁও-এ মধ্যযুগের শিল্প ও স্থাপত্যের অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানকার অগুন্‌তি হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির গুলিতে এইসব শিল্প-কলার সমাবেশ দেখা যায়। এটাই মনে হয় নেপাল উপত্যকার সবচেয়ে শিল্পসমৃদ্ধ স্থান। নেওয়ার জাতির প্রাচীন শিল্প নৈপুণ্যের অগুন্‌তি নিদর্শন এখানে সর্বত্র ছড়ানো।

চারিদিকে প্রাকার বেষ্টিত ভাটগাঁও-এর সীমানার প্রবেশদ্বারের পাশেই চৌকোনা পুষ্করিণী আছে। এটির নাম 'সিদ্ধ পোখরী'। প্রধানমন্ত্রী ভীমসেন থাপা এটি খনন করান। পোখারী পার হলেই ভকতপুরের সীমানাতে ঢোকা গেল। ভকতপুরের পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত পথঘাট দর্শকের মন প্রফুল্ল করে। তাছাড়া চারদিকের অট্টালিকাগুলির শিল্পৈশ্বর্য্যতো আছেই। বিশেষ করে এখানকার ময়ুর লাঞ্ছিত কাষ্ঠনির্মিত দরজাজানালা অতীব মনোমুগ্ধকর। ভকত-পুরের শ্রেষ্ঠ অংশে দরবার ক্ষেত্র—প্যাগোডাধরণের মন্দিরে ভরা, শিল্প ঐশ্বর্য্যের লীলা নিকেতন বললে কম বলা হবে।

ভাটগাঁও-এর শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ অবদান এখানকার "স্বর্ণ-দরওয়াজা," পুরাতন রাজপ্রাসাদের শোভাবর্দ্ধন করছে। এখনো এর ঔজ্জ্বল্য সামান্যমাত্রও ম্লান হয় নি।

১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ভূপতীন্দ্রমল্ল তাঁর প্রাসাদ নির্মাণ করান। সেই প্রাসাদে নিরানব্বইটি মহল ছিল। প্রাসাদের প্রধান প্রবেশদ্বারে তাঁর পুত্র রঞ্জিত মল্ল ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সুন্দর স্বুবর্ণময় তোরণ নির্মাণ করান। এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সমন্বিত শিল্প পৃথিবীতে আর নেই, নেপালীরা এই গর্বই করে থাকে। নেপালী স্বর্ণকারদের শিল্পোৎকর্ষের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

তোরণটীর শীর্ষদেশে সুবর্ণময় তিনটি ঘণ্টা শোভা পাচ্ছে, একটু নীচে সুবর্ণময় হস্তী প্রভৃতির মূর্ত্তি। দরজার উপরিভাগে গরুড়ারূঢ় লক্ষ্মী ভগবানের মূর্ত্তি আছে, সঙ্গে দুইপাশে আছে স্বর্গের পরীর মূর্ত্তি। দরজার দুইপাশে কয়েকটি অন্য দেবদেবীর মূর্ত্তিও নিখুঁতভাবে আঁকা

আছে। দরজার সামনে ভাটগাঁওএর দরবার ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের চারিদিকে ছড়ানো কারুকার্যময় মন্দির, মূর্ত্তি, স্তম্ভ, প্রস্তরের তৈরী বিশালকায় জন্তু আছে। এ সকলই প্রাচীন নেওয়ার জাতির শিল্পোৎকর্ষের চিহ্ন।

দরবারক্ষেত্রের একপাশে আছে "সিংহ-দরওয়াজা", হনুমান-ভৈরব, নরসিংহ প্রভৃতির মূর্ত্তি। এগুলি ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

রাজা ভূপতীন্দ্র মল্ল ১৮ শতকের প্রথমভাগ থেকে চৌত্রিশ বৎসর ভাটগাঁও-এ রাজত্ব করেন। তিনি এখানে বহু সুন্দর সুন্দর মন্দিরাদি তৈরী করে বিখ্যাত হয়েছেন। বিখ্যাত "নয়াৎপলা মন্দির" তাঁরই সৃষ্টি। রাজপ্রাসাদের বিখ্যাত স্বর্ণদরওয়াজার সম্মুখে স্তম্ভের উপর রাজা ভূপতীন্দ্র মল্লর স্বর্ণময় মূর্ত্তি বসানো আছে। স্তম্ভের উপর মস্ত একটি প্রস্তরময় পদ্মফুল, তার উপর হাত জোড় করে উপবিষ্ট স্বর্ণমূর্ত্তি, শিরে সুবর্ণছত্র শোভিত—প্রশান্ত মুখশ্রী, অপূর্ব তার নির্মাণ-শৈলী।

রাজা ভূপতীন্দ্র মল্ল উদার মতাবলম্বী রাজা ছিলেন। তিনি সূক্ষ্ম শিল্পকলার উৎসাহদাতা ছিলেন। সর্বোপরি তাঁর ধর্মমত উদার হওয়াতে সর্বধর্মমত-সহনশীল ছিলেন। তাঁর সময়ে তাই নেপালের উন্নতিও খুব হয়েছিল।

দরবারটিও নেপালের বিশিষ্ট পদ্ধতিতে তৈরী করা। ইটের তৈরী বাড়ী, সূক্ষ্ম কারুশিল্প-সমম্বিত কাষ্ঠনির্মিত দরজা জানালায় সুশোভিত। দরজা, জানালা শুধু নয়, ঘরের চৌকাঠ, আড়া সবই কারুকার্য করা।

ভাটগাঁও দরবার ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৭৬৮ খ্রী: ইন্দ্রযাত্রার সময় বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যখন গুর্খারাজা পৃথ্বিনারায়ণের হাতে কাঠমাণ্ডুর পতন হয়, তখন শেষ তিনজন মল্লরাজা এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাঠমাণ্ডুর শেষরাজা জয়প্রকাশ গুরুতরভাবে আহত হয়ে পুণ্যতোয়া বাগমতীর তীরে আনীত হন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এইভাবে এখানেই মল্লরাজ বংশের রাজত্বের শেষ হল।

॥ পাঁচাশঢ়ুয়ারী ॥ কারুশিল্পের আরেকটি অনবদ্য নিদর্শন। এর উজ্জ্বলতা এখনো বিস্ময়ের বস্তু। ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে যক্ষমল্লর সময় এটি তৈরী হয়।

মল্লরাজাদের রাজত্বকালে বিপদসঙ্কেত দেবার জন্য ব্যবহৃত মস্ত একটা ধাতুনির্মিত ঘণ্টাও এখানে দেখা যায়।

আমরা পায়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে চলেছি একটার পর একটা দ্রষ্টব্য দেখতে দেখতে। সরু সরু গলিপথ, দুধারে অগুণতি বাড়ী, যেন কাশীর গলিপথ। পথের ধারেই চট পেতে ব্যাপারীরা শাক-সব্জী ফলমূল নিয়ে বিক্রি করতে বসেছে। খানিক বাদে বাদেই আশ্চর্য সুন্দর মন্দির বা বিহারে পৌঁছে যাচ্ছি। এই অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু এবং দর্শনীয় মন্দির হল "নয়াৎপলা মন্দির"। প্যাগোডা ধাঁচে তৈরী এই মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা ভূপতীন্দ্রমল্ল তৈরী করান। সেকথা আগেই বলেছি।

এই মন্দির তৈরীর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। নেপালীদের মতে এ রাজ্যের রক্ষাকর্তা হলেন ভৈরব। তিনি একটি তিনতলা মন্দিরে অবস্থান করে রাজ্য দেখাশুনা করে রক্ষার ব্যবস্থা করবেন, এইভাবে তাঁর মন্দিরটি তৈরী করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ তা হল না। দেশের জ্ঞানীলোকেরা তখন একত্র মিলে রাজাকে পরামর্শ দিল যে, তিনি যেন ঈশ্বরী দেবীর একটি মন্দির ভৈরবের মন্দিরের নিকট তৈরী করান। ভৈরব ঈশ্বরীর পরম অনুগত, কাজেই মনে হয় এতে ফল হবে।

১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে, শুভদিন দেখে রাজা ভূপতীন্দ্রমল্ল তিনখানা ইট বহন করে মন্দিরের স্থানে আনলেন। তাঁর লোকজনেরা বাকী মালমশলা পাঁচদিনে এনে ফেলল। মন্দির তৈরী শেষ হ'ল। অত্যন্ত গোপনে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত এক দেবতাকে মন্দিরে আনা হ'ল, কেউ তাকে দেখতে পেল না। এখন পর্যন্ত সেই গোপনতা রক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু সেই হতে ভৈরব শান্ত হয়ে গেলেন এবং দেশের প্রতি দয়া দেখাতে সুরু করলেন। এখন পর্যন্ত এই মন্দিরের দরজা সর্বদা বন্ধই থাকে।

মন্দিরের গায়ের কাঠের উপর কারুকার্য অদ্ভুত সুন্দর। এর স্তম্ভ, ছাদ ও দেয়ালে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর নানারকম ছবি আঁকাআছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল, এই মন্দিরের সিঁড়িতে বসানো পাঁচ জোড়া বিশাল মূর্তি। সবচেয়ে নীচের সিঁড়িতে বসানো আছে প্রথম জোড়া দুই বীরের মূর্তি। তাঁরা মানুষের চেয়ে দশগুন শক্তিশালীর প্রতীক। পরের জোড়া দুটি হাতি—তারা বীরের চেয়ে দশগুণ শক্তি ধারণ করে। তারপরে ক্রমান্বয়ে আছে একজোড়া সিংহ, একজোড়া দেবী বাঘিনী, একজোড়া দেবী সিংহী। প্রত্যেক জোড়া তার নীচের জোড়ার দশগুণ শক্তিশালী। সুতরাং দেবীগণ মানুষের চেয়ে দশ হাজার গুণ শক্তিধারণ করেন, এইরূপ কাহিনী প্রচলিত।

ভৈরবের মন্দিরও নয়ৎপলা মন্দিরের কাছেই। রাজা জগৎজ্যোতি মল্লর সময়ে এই মন্দির নির্মিত হয়। প্রথমে মন্দিরটি একতলা ছিল, পরে তিনতলা করা হয়। সেটা রাজা ভূপতীন্দ্রমল্ল ১৭১৮তে করে দেন। এটিও অপূর্ব কারুকার্যময় মন্দির।

ভাটগাঁও-এ একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। নাম "দত্তাত্রেয়" মন্দির। কথিত আছে যে, মাত্র একখানি গাছের কাঠ থেকে পুরো মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরটি রাজা যক্ষমল্ল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে রাজা বিশ্বমল্ল এটির সংস্কার সাধন করেন, সেটা হ'ল ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সালেই রাজা বিশ্বমল্ল ঐ মন্দিরের নিকট একটি ময়ূরাঙ্কিত গবাক্ষ তৈরী করান; সেটির নির্মাণ কুশলতা আশ্চর্য সুন্দর।

ভাটগাঁও দরবার ক্ষেত্র থেকে কিছু দূরে বন্য আবহাওয়ার মধ্যে একটি সুন্দর মন্দির আছে। এটিতে গণেশের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, নাম সূর্য্যবিনায়ক মন্দির। উদীয়মান সূর্য্যের রক্তবর্ণ রশ্মি এই মন্দিরে প্রত্যুষে পতিত হয়, তাই এই নাম।

এ ছাড়া আরও কত মন্দির এদিক ওদিক ছড়ানো, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে দিনের পর দিন কেটে যাবে, সময়ের হিসাব রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

১১

নাগারকোট :

এতদিন নেপালে কেবল স্থাপত্য সৌন্দর্য দেখে বেড়ালাম, এবার তুষার সৌন্দর্য দেখবো। নেপালের কয়েকটি জায়গা থেকে তুষার এত ভাল দেখা যায় যে, এখানে এইসব জায়গার নাম সকলের মুখে মুখে চলছে। কাঠমাণ্ডুতে বেড়াতে এলাম, আর দামানে, নাগারকোটে, কাঁকনিতে গেলাম না, একথা শুনলে লোকে বিশ্বাসই করবে না। ত্রিভুবন রাজপথ ধরে আসতে আসতে দামান পড়ে, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। কাঠমাণ্ডু-বানেপা-কোডারী রোড ধরে ভাটগাঁও এসে উত্তরের রাস্তাধরে আরও নয় মাইল পাহাড়ের উঁচুতে উঠলেই নাগারকোট পৌঁছানো যায়। উচ্চতা ৮,০০০ ফুট।

পথ ভালো নয়। ভাটগাঁও-এর পর থেকে যে পথ, তাতে কেবলমাত্র জিপ চলতে পারে। আমরা সেই ব্যবস্থাই করে নিলাম। দুপুরে জিপে রওনা হয়ে সন্ধ্যের আগে নাগারকোট পৌঁছনো, সেখানে ট্যুরিস্ট বাংলোতে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরেই আবার কাঠমাণ্ডু ফিরে আসা।

ভাটগাঁওর পরে রাস্তা সত্যিই অতিশয় খারাপ। পথের মাঝে মাঝে বৃষ্টির জল জমে জমে কাদা হয়েছে তাই অসমতল পথ চলবার অযোগ্য হয়ে গেছে। এমনি একটা জায়গায় গাড়ীটার চাকা বেকায়দায় আটকে গেল। অনেকক্ষণ ধরে ধ্বস্তাধস্তি করে, পাশের বস্তি থেকে

কয়েকজনা লোক ডেকে এনে গাড়ী তুলতে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। পাহাড়ী পথ ঘুরে ঘুরে উঁচুতে উঠেছে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে পাহাড়ের চূড়ার শেষপ্রান্তে হঠাৎ একটা সাদা ধব্‌ধবে বাড়ী উঁকি দিল, চারিপাশ তার ফুলভরা গাছে ঢাকা। এইটিই ট্যুরিষ্ট বাংলো অন্ধকারে চারিদিকের দৃশ্য দেখা গেল না।

নেপাল গবর্ণমেন্ট ট্যুরিষ্ট বাংলো তৈরী করে, তাতে থাকবার আধুনিক ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু নিকটস্থ গ্রাম থেকে খাদ্য আহরণ করা শক্ত, এমনকি অসম্ভব বলে ট্যুরিষ্ট অফিসার জানালেন। তাই সকলেই এখানে খাবার সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। আমাদেরও সেই ব্যবস্থা করে আসা। কিন্তু বাংলোয় পৌঁছে একটু বিপদে পড়লাম। প্রথমে তো চৌকীদারের পাত্তাই মিললো না। খানিকপরে তাকে যাওবা দেখা গেল, সে দুজনের থাকবার একটা ঘরে চারজনকে থাকতে দিতে নারাজ। বাড়ীর অন্যঘরটি একটি ইউরোপীয় দল এসে দখল করেছেন, দু'জনের থাকবার ঘরে তাঁরা কিন্তু তিনজনা আছেন। অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থাও সে করে দেবেনা। অচিরেই তার রাগের কারণ বোঝা গেল। ওই ইউরোপীয় দলটি চৌকিদারের কাছ থেকে রাতে খাওয়ার অর্ডার দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের খাবার নিজেদের সঙ্গেই ছিল, তাছাড়া আমরা সকলেই নিরামিষাশী, চৌকিদারের সাহায্যের দরকার নেই তাই তার এত রাগ। কিন্তু আমার স্বামীও ছাড়বার পাত্র নন, সুতরাং অনেক গরম গরম কথা কাটাকাটি হবার পর স্থান মিলল, জ্বালানী কাঠও পাওয়া গেল। ঘরের ভিতর ফায়ার প্লেসের ধারে বসে আড্ডা ও খাবার গরম করা দুই-ই চলল, বেশ শীত এখানে।

একটি রাত কাটলো। প্রত্যুষ হবার আগেই গাইড ডেকে তুললো, প্রাত: সূর্য্য উঠে গেলে আকাশে মেঘ জমতে পারে, তাই উষার আধ অন্ধকার থাকতেই তুষার মৌলি গিরিশ্রেণী দেখে নিতে হবে। বাইরে বের হয়ে আধ অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে বাংলো ছেড়ে একটু দূরে

পাহাড়ের প্রান্তদেশে এসে দাঁড়ালাম। যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেই চূড়াটির উপর থেকে নীচে দেখা যাচ্ছে গভীর কালো উপত্যকা, দূরে দূরে কোথাও বা ছুটো একটা গ্রামের আভাস। উপত্যকা পেরিয়ে সারি সারি পাহাড়ের ঢেউ সমান্তরালে দাঁড়িয়ে। কয়েকসারি পাহাড়ের পর আকাশের গায়ে শেষ ধোঁয়াটে পাহাড়ের চূড়াতে অত্যুচ্চ তুষার শৃঙ্গরাজির শোভা একটু একটু করে ফুটে উঠতে লাগল। আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা নির্মেঘ নীলাকাশের একধার থেকে অন্যধার অবধি অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে অবস্থিত বিখ্যাত শিখরাবলী প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম দেখতে বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেষ্ট (২৯,০২৮ ফুট) ; তাছাড়া লোৎসে (২৭,৮৯০ ফুট) ও নুপৎসে (২৫,৭০০)। আরও দেখেছি, ধৌলাগিরি (২৬,৭৯৫) হিমলচুলী (২৫,৪০১ ফুট), মানাসলু (২৬,৬৫৮ ফুট), গণেশ হিমল (২৩,৩৬১ ফুট), ল্যাংট্যাং (২৩,৭৭১ ফুট), গোসাঁই থান (২৬২৯১) দোর্জে লাক্পা (২৩,২৪০ ফুট), চৌবে ভামরে (১৯,৫৫০ ফুট), গৌরী শঙ্কর (২৩,৪৪০ ফুট), চৌ ইউ (২৬,৭৫০), মাকালু (২৭,৭৯০) কাঞ্চন জঙ্ঘা (২৮,১৬৮ ফুট), নাম্বুর (২২,৪১৭ ফুট) প্রভৃতি।

বারো

কাঁকনি

দুর্ভাগ্যও অনেক সময় সৌভাগ্যের সূচনা করে। একবার নেপালে বেড়াতে এসে হাঁটতে হাঁটতে পা মচকে গেল, পা ফুলে ঢোল। আর তো হাঁটা চলে না, কি করা যাবে। ট্যুরিষ্ট অফিসে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেলাম। হঠাৎ দেখা পুরাতন বন্ধু জগ্‌দীশ মানসিং-এর সঙ্গে।

প্রশ্ন করেন, "কি ব্যাপার, খোঁড়াচ্ছেন কেন?"

আমার স্বামী আমার হয়ে উত্তর দেন, "দেখেছেন কাণ্ডটা! পা মচকে আমাদের পুরো দলটাকেই একেবারে খোঁড়া করে দিয়েছে, কোথায় যাই বলুন তো এখন?"

"কাঁকনি চলে যান হাঁটতে হবে না। মোটরে যাবেন, বাংলোর দোরগোড়ায় পৌঁছাবে গাড়ী। কয়েকটা সিঁড়ি মাত্র উঠতে হবে। ওখানে তিন দিন থেকে বিশ্রাম করে পা সারিয়ে আস্থন। দেখে আস্থন কি অপূর্ব রূপ দেখা যায় হিমালয়ের সেখান থেকে।"

"কবে বাংলো খালি পাওয়া যাবে?"

তাড়াতাড়ি খাতাপত্র খুলে বসেন তিনি, তারপর বলেন, "কাল

বিকালেই বাংলো খালি পাবেন, তিনরাত্রি থাকতে পারবেন। এক্ষুনি পারমিট ইস্যু করে দিচ্ছি।" স্মিত হেসে ঘাড় নেড়ে সদা ব্যস্ত জগদীশবাবু বলেন।

কাঠমাণ্ডু সহর থেকে উত্তরে আঠারো মাইল পথ। সর্বদাই গাড়ী যাতায়াত করছে। এপথে সোজা চলে গেলে আরও ছাব্বিশ মাইল পর ত্রিশূলীবাজার পাওয়া যাবে। ত্রিশূলীবাজারের কথা অন্যত্র বলব। খানিকটা বড় রাস্তায় চলে, শেষের মাইল দুই ছোট রাস্তা ধরে এঁকে বেঁকে পাহাড়ের উঁচুতে উঠলে একটা যেন চূড়োতে পৌঁছানো যায়। চূড়াটি কিন্তু মাত্র ৬৫০০ ফুট উঁচু, আর চূড়োতে আছে একটি ধব্‌ধবে সাদা দোতলা বাংলো। দূর থেকে মনে হল যেন শিখরের উপর এক টুকরো শুভ্র তুষার ফেলে রেখেছে কেউ।

শুধু বাংলো নয়, বাংলোর চারদিকের ছোট জমিটুকু ঘিরে সুন্দর একটি ছোট ফুলের বাগানও করা আছে। গাড়ী যেখানে থামলো, সেখান থেকে বাংলোর দোরগোড়ায় পৌঁছাতে আটদশটি পাথরের সিঁড়ি পার হতে হয়। সিঁড়ির পাশে খাঁজ কেটে ফুলগাছ লাগানো হয়েছে। অজস্র ফুল সিঁড়ির গায়ে হাওয়ার সাথে ঢলে ঢলে পড়ছে।

মাথার উপর পরিষ্কার নীলাকাশ পাহাড়ের একদিকে দেখা যাচ্ছে, দূরে কাঠমাণ্ডু উপত্যকার ঘরবাড়ীর আভাস। গাছপালার সঙ্গে একাত্মা হয়ে মিশে রয়েছে। নদীগুলির রূপালী রেখা, পথঘাটের সরু সরু ফিতে, সবুজের মধ্যে লাইন টেনে রেখেছে। অন্যদিকে দেখছি, স্তরে স্তরে সবুজ পর্বতমালার সারি ধীরে ধীরে রঙ পরিবর্তন করে নীলাভ হতে হতে নীলাকাশের সঙ্গে যেন মিশে গেছে।

সারাদিন দোতলার ছাদে বসে বসে রোদ পোহাই আর প্রকৃতির শোভা দেখি। উত্তরদিকে নীচের পাহাড়গুলির গায়ে কোথাও কোথাও ছোট ছোট গ্রাম দেখা যায়। স্তরে স্তরে সবুজ ক্ষেত কোথাও

হলদে হয়ে গেছে, শস্য পেকে গেছে। গ্রামের লোকেরা আলপথ বেয়ে উঁচু নীচু পথে চলা ফেরা করে। দুটো ছোট ছোট নদী আপন মনে উঁচু নীচু পথে বয়ে চলে। পাহাড়ের দেশে সমান পথ কোথাও নেই। সামনে বাগান পার হয়ে খানিকটা খোলা জমি। তারপরেই টিলার উপর বেশ বড় লাল টালী ছাওয়া বাড়ী, শুনলাম British Guest House, শূন্য পড়ে আছে এখন।

আমাদের বাংলোতে আসবার পথের পাশেই পড়ে একটি তামাং জাতের লোকদের গ্রাম। তাদের ঘর-বাড়ীগুলি দেখতেও অন্য ধরণের। ছোট ছোট ঘর ঘিরে ক্ষেত, নানারকম সবজি লাগানো হয়েছে, ফলেছেও নানারকম। তৃতীয় দিনে, পা একটু সারতে, গেলাম ওদের বাড়ীতে বেড়াতে। অমনি ইচ্ছা, টাট্‌কা কিছু সজি সংগ্রহ করি। সজি চাইতে, গ্রামবাসীরা দেবে না কিছুতেই, বলে "ছইনা"—অর্থাৎ নেই। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ভাব-ভঙ্গিতে জানায়, দেব না। পয়সা বের করে দেখালেও দিতে চায় না। অবশেষে অনেক কাকুতি-মিনতিতে মন গলল, রাজী হ'ল বিক্রি করতে। এদেশের এই-ই রীতি। বিক্রি এরা করে না, কেবল বড় বড় শহরের বাজার ছাড়া কোথাও কোন গ্রামে খাদ্যদ্রব্য পাওয়াও যায় না কিছু।

একদিন ছিল ছুটির দিন। সেদিন সারাদিন ধরে দলে দলে ইস্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা এলো পিকনিক করতে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা সুন্দর সুন্দর পোষাকে সজ্জিত ছেলেমেয়েগুলি সারাদিন হৈ-হৈ করে বেড়াল। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলেও খাবার তাড়া নেই যেন তাদের।

ট্যুরিষ্ট বাংলো, তাই ট্যুরিষ্টেরও আনাগোনার বিরাম নেই। আমরা আসবার পরই একদল চলে গেলেন, স্বামী-স্ত্রী দুটি সন্তান সহ, ইউরোপীয়ান। সন্ধ্যায় দিকে এলেন দুজন, একজনের নাম JHON শুনলাম, আরেক জন সাহেব সাধু, গেরুয়ালুঙ্গি পাঞ্জাবী পরা,

লম্বা চুল দাড়ি। তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন। এখানের নেপালীরা তাকে ডাকে "মহাত্মা" বলে। সারাদিনই দেখি বাগানে রোদে চেয়ার টেবিল নিয়ে তিনি বসে কি লিখছেন। মধ্যে মধ্যে উঠে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করছেন। মস্ত একটা ষ্টেসন ওয়াগন বাইরে দাঁড়িয়ে, ওঁদেরই গাড়ী। বিকালে জনকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন সেই গাড়ী করে। চৌকীদার বলল, নীচে গ্রামের দিকে গেছেন খাবার সংগ্রহ করতে।

পরদিন সকালে একদল ইটালীয়ান বিশেষজ্ঞের দল এলো। একটা Air-Strip তৈরী করবেন এঁরা, তারই জায়গা খুঁজতে এসেছেন। সঙ্গে নেপালী অফিসারও আছেন একজন। অনেক আলাপ হ'ল তাঁদের সঙ্গে। আমরা পর্বতারোহণে উৎসাহী শুনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন সবাই। কিছুটা অবাকও হলেন জেনে যে ভারতীয় মেয়েরাও পর্বতারোহণে উৎসাহী হয়েছেন। আমরা গোঁসাইকুণ্ড যেতে চাই শুনে বলেন তাঁরা, সে পথ তো অতি কঠিন—১৭,০০০ ফুট উঠতে হবে, অবশ্য কুণ্ডটি একটু নীচে, সেটুকু নামতে হবে। তাঁদের মধ্যে একজন জানালেন তিনি ওপথে যাবার চেষ্টা করছেন। শুনেছেন, সুন্দরীজল হয়ে গোঁসাইকুণ্ড গিয়ে ফিরবার সময় ত্রিশূলীবাজার হয়ে ফিরলে পথ অনেকটা সহজ হবে। অবশ্য দুটো পথই অতিশয় কঠিন।

প্রতিদিনই সন্ধ্যার একটু আগে নীলাভ চূড়াগুলিতে দু'টা একটা তুষারশৃঙ্গ হঠাৎ ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে। গণেশহিমল সবচেয়ে কাছে, তার চারটে চূড়াই সর্বপ্রথম লাল হয়ে জ্বলজ্বল করে ওঠে। কিন্তু সারি সারি অনেকগুলি তুষারশৃঙ্গ দেখতে হলে চাই ভোরের বেলা। আর চাই সৌভাগ্য। সৌভাগ্য যদি থাকে, তবে আকাশ থাকবে নির্মেঘ, তখন বাঁদিক থেকে ডাইনে সারি সারি দেখা যাবে তুষারশৃঙ্গাবলী—অন্নপূর্ণা (২৬,৪৯২ ফুট) মানাসলু (২৬,৬৫৮ ফুট), হিমলচুলী (২৫,৮০১ ফুট), গণেশহিমল (২৩,৩৬১ ফুট), চৌবর ভামুরে

(১৯,৫৫০ ফুট), গৌরীশঙ্কর (২৩,৪৪০ ফুট) এবং অস্পষ্ট আরও কয়েকটি শিখর। কি অপূর্ব দৃশ্য!

নেপালের সৌন্দর্য কিসে, শিল্পকলাতে না তুষারমৌলী গিরিশৃঙ্গাবলীর রূপে? এর জবাব আজও দিতে পারি না।

মুক্তিনাথ

এক

"ও মণি ! এবারও তাহলে যাওয়া হলো না, কি বল ?"

হতাশাভরা কণ্ঠে উমাপ্রসাদ-দাদা বলেন আমার স্বামী ডাঃ বিশ্বাসকে। "এই নিয়ে তিনবার হলো, জান। একবার তো টিকিট পর্যন্ত কাটা হয়ে গিয়েছিল। রওনা হবার দু'দিন আগে চিঠি এলো বিরাট একটা ধসে পথ নষ্ট হয়ে গেছে, মেরামত করতে দু'মাস লাগবে। কি আর করা, টিকিট ফেরত দিয়ে আবার কেদারবদ্রীর দিকে গেলাম।"

তিনজন নির্বাক হয়ে বসে বসে ভাবি।

যুদ্ধ বেধে গেলো হঠাৎ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে, ৫ই সেপ্টেম্বর। আমাদের টিকিট কেনা, মালপত্র বাঁধা-ছাঁদা তখন সব শেষ। কিন্তু এই অনিশ্চিত অবস্থায় ঘর ছেড়ে বেরুনোই তো মুস্কিল।

খানিকবাদে দাদা আবার বলেন, "তাহলে মুক্তিনাথ এবারেও হলো না।"

কিন্তু হলো না বললেই হলো ? মন যে পড়ে আছে সেই দুর্গম রাজ্যের পথে পথে। সেই যে পথ চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম শৃঙ্গগুলির অন্যতম দুটি পর্বত অন্নপূর্ণা ও ধৌলাগিরি শৈলমালার মধ্য দিয়ে! উত্তরে তিব্বত থেকে নেমে এসেছে কালীগণ্ডকী নদী, এই দুটি চির-তুষারাবৃত গিরিমালার মধ্য দিয়ে পথ করে, তারই তীর ধরে ধরে চলবার পথ! সে পথ যে সৌন্দর্যের আধার, সৌন্দর্য পিপাসুর স্বর্গ!

নেপালের পশুপতিনাথের নাম ডাক বেশী, কিন্তু মুক্তিনাথের নাম কটা লোকেই বা জানে। যায়ই বা কজন? কি যে আকর্ষণে আমরা ঐ কঠিন তীর্থে যাবার বাসনা করেছি. সে কি কেবল তীর্থেরই টানে? বহুরূপী হিমালয় তার নব নব রূপের আকর্ষণে আমাদের মন টানে, তাই যেমন প্রতি বৎসর হিমালয়ের পথে পথে বের হয়ে পড়ি, এবারও তেমনি চেষ্টা করা হচ্ছিল। এমন সময় এই বিপত্তি!

রাত্রির অবসানে আসে উষার আলো। আমাদের দুঃসময়েরও এক সময় অবসান হোল। যুদ্ধ শেষ হলো। হঠাৎ যেমন সুরু -হয়েছিল, তেমনি। হঠাৎই আবার শেষ হলো। আমরাও আর সময় নষ্ট না করে· চারদিনের মধ্যে আবার সব ব্যবস্থা করে রওনা হয়ে পড়লাম।

কলকাতা ছেড়ে রওনা হয়ে বারাউনি হয়ে গোরক্ষপুর পৌঁছনো গেল ১লা অক্টোবর '৬৫ খ্রীঃ। সেখানে থাকেন আমার ভাসুর-ঝি রুবি ও তার স্বামী অরুণ রায়।

শ্রীমান তখন সেখানে এয়ারফোর্স অফিসার। তাঁরা আমাদের পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন। গোরক্ষপুর থেকে ৩৪ মাইল দূরে কুশীনগর। আড়াই হাজার বছরেরও আগে বুদ্ধদেব এখানে মহাপ্রয়ান করেছিলেন। এত কাছে এসে কুশীনগর না দেখেই ফিরবো! তাই তাড়াতাড়ি করে একখানা গাড়ী যোগাড় করে ফেললেন দাদা।

কুশীনগরে প্রাচীন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে, নতুন তৈরী মনোরম বৌদ্ধ মন্দিরও আছে কয়েকটা, কোনটা বার্মিজদের তৈরী, কোনটা চীনাদের তৈরী, কোনটা বা ভারতীয়। এই মহাপুরুষ যেখানে মহাপ্রয়াণ করেন, সেই জায়গাটিতে আছে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল মৃত্তিকা স্তূপ, চারিদিকের লালমাটির পথ দিয়ে চলে স্তূপটিকে প্রদক্ষিণ করা। পথের ধারে ধারে সযত্নে-লাগানো ফুলভরা গাছের শোভা। গম্ভীর ভাবপূর্ণ পরিবেশ। শ্রদ্ধায় মাথা আপনিই নুয়ে আসে মহামানবের স্মৃতি ভরা এই তীর্থে।

বিকালের ট্রেনে গোরক্ষপুর ছাড়বার কথা, যাবো নওতনওয়াতে।

কিন্তু নতুন টাইম টেবলের গোলযোগের জন্য ট্রেন ফেল করে রাত্রির ট্রেন ধরতে হল। নওতনওয়াতে রাত একটাতে পৌঁছেও কোন অসুবিধা হলো না। গোরক্ষপুরের কমিশনার মিঃ মিত্র দাদার বন্ধু। তাঁর লোক আমাদের নিয়ে ডাক বাংলোতে যাবার জন্য অত্তরাত্রেও জিপ নিয়ে হাজির ছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে তাঁরাই জিপ ও সাইকেল রিক্সা করে আমাদের ভৈরবাতে পৌঁছে দিলেন। পথে ভারত-নেপাল সীমান্ত পার হয়ে এলাম। মাঝপথে তাই কাষ্টমসের ঝামেলা। মাইল দশেক দূরে ভৈরবা পৌঁছে সেখানে প্লেন ধরবো, যাবো মধ্য নেপালের পোখারা সহরে। সেখান থেকে এবারের পদযাত্রা সুরু হবে।

ভৈরবাতে আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন ওখানকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ কোরেশী। কেরোসিন, পেট্রোল জাতীয় যাবতীয় তেলের ব্যবসাতে একছত্র আধিপত্য তাঁর ভৈরবাতে। এছাড়া ইঁট তৈরীর কারখানা, মদের ভাঁটিও আছে। মোটাসোটা হাসিখুশি মুসলমান ভদ্রলোক, অবাঙ্গালী, এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। এখানে থাকবার সাধারণ হোটেল আছে. কিন্তু মিঃ কোরেশীর আগ্রহাতিশয্যে তাঁর দোকানে মালপত্র রেখে তাঁর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করলাম।

ভৈরবার দিনটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আমরা মিঃ কোরেশীর বাড়ীতে বসে আছি, যেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে আছি ট্রেনের অপেক্ষাতে। মাঝে মাঝে খবর নেওয়া হচ্ছে ভৈরবার প্লেন কখন আসবে। বিকালে যখন স্থিরনিশ্চয় হওয়া গেল যে কাল দুপুরের আগে আর কোন প্লেন আসবার সম্ভাবনা নেই, তখনই কেবল আমরা মিঃ কোরেশীর বাড়ীতেই থাকবার ব্যবস্থা করে নিলাম।

ভৈরবা একেবারে সীমান্তের সহর। তাই এখানে ভারতীয় ও নেপালী একাকার হয়ে মিশে গেছে। চেহারা বা চালচলন কোনটাতেই দুই জাতের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট নয়। সহরটি ছোট, সন্ধ্যে হতে না হতেই এত নির্জন বোধ হল যেন নিশুতি রাত। মিঃ কোরেশীর গৃহের

ছাতে বসে বসে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে দেখি দূরে সহরের বাতিগুলি মিটমিট করে জ্বলছে, আরও দূরে আকাশের গায়ে হিমালয়, যেন কতো দূরে তার অবস্থিতি। ঐদিকে নতুন তৈরী বাস সড়ক চলে গেছে বুটোয়ালের দিকে। সেখান থেকে আরও এগিয়ে যাবে পোখারা অবধি। এখন সে পথ তৈরী হয়ে গেছে, নিয়মিত বাস চলাচল করে। মাথার উপর তারাভরা নীলাকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবতারা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, আর, যেন কতো কাছে এসে গেছে।

বুদ্ধদেবের জন্ম হয় লুম্বিনীতে, ভৈরবা থেকে মোটরে ২১ মাইল। এখন বর্ষার পর পথে নদী পার হওয়া অসম্ভব জেনে আমাদের লুম্বিনী দেখার আশা ত্যাগ করতে হোল। এখানকার এয়ার পোর্টের নামও লুম্বিনী এয়ারপোর্ট।

ভৈরবাতে পৌঁছেই দাদা খুশী—বলেন, "কি বল ভক্তি! আমাদের তাহলে নেপালে আসা হ'ল শেষ পর্যন্ত।"

উত্তর দিই—"কিন্তু মুক্তিনাথ রওনা না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই। কে জানে এখান থেকেই ফিরতে হবে কিনা!" সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তবু নেপালে ঢুকেছি, এতেই আমরা খুশী।

মিঃ কোরেশী বেলাবেলি খেয়ে নিয়ে শোবার ব্যবস্থা করেছেন। বেশ গরম বলে বারান্দায় চারখানা চারপাই পেতে শোবার জায়গা হয়েছে। কোন কাজ নেই, তাই সকলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছি। কিন্তু ঘুম হবে কি করে? সারারাত ঘরের পাশে একটা কুকুর একটানা চিৎকার করে চলেছে। সেটাকে অনেক কষ্টে তাড়ানো হ'ল তো কানের পাশে মশার ভোঁ ভোঁ! সহস্র সহস্র মশা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। অতিষ্ঠ হয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুই, তখন আবার সেই কুকুরের কাতরানি সুরু হ'ল। খুব গরম, চারিদিক থম্‌থম্ করছে, হাওয়া নেই একটুও। আমার স্বামী নিদ্রার আশা ত্যাগ করে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করে মশা তাড়াচ্ছেন। আমরা তারই সুবিধা নিয়ে মাঝে মাঝে তন্দ্রায় ঢলে পড়ছি। আমাদের সঙ্গে আছে আমার ভাগ্নে,

ডাকনাম তার বন্ধু। সে কিন্তু আপদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে মশা কমে গেল, তখন মাছিরা এলো দলে দলে আক্রমণ করতে। কাল দিনমানে যেন অতটা বুঝতে পারিনি। বেলা ন'টা বাজতে বাজতেই অতিষ্ঠ আমরা, মালপত্র নিয়ে ভৈরবার এয়ার পোর্টে গিয়ে হাজির হলাম।

ভৈরবা বা লুম্বিনী এয়ারপোর্টে পৌঁছেই দাদা একজন বাঙালী খুঁজে বের করে ফেললেন। তিনি হলেন এখানকার ষ্টেশন সুপারিন্টেডেণ্ট মিঃ রায়। তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো। আমাদের অনুরোধে তিনি পোখারার ট্যুরিষ্ট অফিসারের কাছে আমাদের আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দিলেন। প্লেন এসে পৌঁছতেই তিনি প্লেনের পাইলট ক্যাপ্টেন বালসারা ও বাচ্চা নেপালী কো-পাইলটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ১৯৭০ এর ফেব্রুয়ারীতে কাঠমাণ্ডু থেকে দিল্লী আসবার সময় ভীষণ দুর্যোগে তাঁর প্লেন "ক্র্যাশ" করে ক্যাঃ বালসারা প্রাণ হারান। এঁরাও আমাদের পরিচয় পেয়ে খুব খুশী। প্লেনের রেডিও অফিসার মিঃ আনিস্ হোসেনও এগিয়ে এসেছেন। তিনি ডাঃ বিশ্বাসকে দেখেই চিনেছেন। তাঁর দাদা মহবুবর্ ওঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন চুয়াডাঙার স্কুলে। এঁরা অতি যত্ন করে আমাদের চারজনকে প্লেনের ককৃপিটে তাঁদের বসবার জায়গাতে নিয়ে গেলেন নেপালের দুর্লভ দৃশ্য দেখাবার উদ্দেশ্যে। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু শত্রুতার এখনো শেষ হয়নি। এদিকে আমরা এখানে একসঙ্গে বসে পাকিস্তানী, নেপালী, ভারতীয় সবাই মিলে মিশে গল্প গুজব করতে করতে চলেছি বন্ধুর মত। আনিস্ জানালেন, তাকে পাকিস্থানী গবর্ণমেণ্ট নেপালে পাঠিয়েছেন শুভেচ্ছা মিশনের তরফ থেকে।

উড়লো প্লেন। ককৃপিট থেকে নীচে দেখছি, যেন সিনেমার ছবি চোখের সামনে সরে সরে যাচ্ছে। নীচে পথ চলেছে, নদী বয়ে চলেছে এঁকে বেঁকে, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, সবুজ জলভরা পুষ্করিনী ঘিরে গ্রামের লাল টালী ও শন ছাওয়া ঘরবাড়ী। গ্রামগুলি ঘিরে

শস্যক্ষেত্র সবুজ হয়ে আছে। ক্রমে ক্রমে এই দৃশ্য মিলিয়ে এগিয়ে আসে তরাই-এর বনভূমি। ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজিপূর্ণ তরাই-এর জঙ্গল, উপর থেকে মনে হয় যেন ছোট ছোট ঝোপে ঢাকা দিগন্ত বিস্তৃত চারণভূমি। ছেদ নেই, বিরাম নেই। মাইলের পর মাইল চলেছে তো চলেইছে। কত বাঘ, ভাল্লুক, রাইনোর বাস এখানে কে জানে। কিছুদূর এগিয়ে ওই জঙ্গলই যেন উঁচু হয়ে উঠলো, তরাই-এর বনসমাচ্ছন্ন শিবালিকের পার্বত্যাঞ্চল সুরু হ'ল। দুই একটি পর্বতমালার পরই পাহাড়ী গ্রাম দেখা যেতে লাগলো। ছোট ছোট পাহাড়গুলির চূড়া থেকে নীচের উপত্যকা অবধি ধাপে ধাপে চাষের ক্ষেত নেমে গেছে— এখানে ওখানে ইতস্ততঃ ছড়ানো দুটি একটি গ্রাম। কয়েকটি সবুজ পর্বতমালা পেরিয়ে মহাভারত লেখ পর্বতমালা, তার সমান্তরালে চলেছে বিরাট একটি পুরাতন নদীর শুকনো চওড়া বুক। নেপাল রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। আমরা সোজাসুজি ঐ অঞ্চল পার হয়ে আরও উত্তরে চলেছি। আরও নতুন নতুন গ্রাম ঘিরে ঘন সন্নিবিষ্ট সবুজক্ষেত দেখা গেল। নেপালের মধ্যাঞ্চলে পৌঁছে গেলাম আমরা। ক্রমশঃ স্তরে স্তরে পর্বতমালা ও আকাশের মিলনক্ষেত্রে দিগন্ত রেখাতে নেপালের বিখ্যাত চিরতুষারময় হিমশৈলশিখরাবলী আব্ছা আব্ছা দেখা যেতে লাগলো। কো-পাইলট দেখাচ্ছেন—

"ঐ দেখুন, বাঁয়ে ধৌলাগিরি, ঐ যে অন্নপূর্ণা, ঐটি মচ্ছপুছারে—অন্নপূর্ণা গিরিমালারই একটি শিখর, ডাইনে হিমলচুলী, আরও দূরে মানাসলু।"

মেঘের পর্দা ঠেলে ফেলে উজ্জ্বলরূপে এগিয়ে এসেছে অনুপম সৌন্দর্যরাশি, আমাদের হৃদ্‌স্পন্দন যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, কেবল নিঃশব্দে চেয়ে চেয়ে দেখি। আমরা উত্তরের এইসকল হিম শিখরের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি।

নীচে এখনো সবুজ ক্ষেতে ঢাকা পর্বতমালা, তার উপর দিয়ে আমাদের প্লেন উড়ে চলেছে। এমনি একটি পর্বতমালাকে প্রদক্ষিণ

করে ঘুরতেই পোখারা সহর দেখা গেল। প্লেন বেঁকে ঘুরে ধীরে ধীরে নামলো পোখারা এয়ারপোর্টে, আমাদের বাঁয়ে রইল নীল জল ভরা পোখারার সৌন্দর্যময় "ফিউয়া" হ্রদ। যেন ইন্দ্রনীলমণি বসানো রয়েছে ওখানে, তার রংটি এমনি মনোরম। পঁচিশ মিনিট লাগলো ভৈরবা থেকে পোখারা আসতে।

পোখারা শহরটি বিরাট একটি সবুজ উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। জিওলজিষ্টরা বলেন, এককালে এখানকার সমস্ত এলাকা জুড়ে বিরাট একটি হ্রদ ছিল। এখনকার হ্রদগুলি তারই অবশিষ্টাংশ। চারিদিকে বনসবুজ শৈলরাজি, উত্তরদিকে সারি সারি তুষারশিখর। অপূর্ব সুন্দর পোখারার অবস্থিতি। ফিউয়া হ্রদ এয়ারপোর্ট থেকে মাইল খানেক দূরে। হ্রদের জলে নীলাকাশের ছায়ার সাথে সবগুলি তুষার-শৃঙ্গের ছায়া পড়ে—যেন বিশাল একখানা আরসীতে মুখ দেখা। মুক্তিনাথ হতে ফিরে একদিন এই দৃশ্য দেখতে এসেছিলাম। সেদিন সামান্য হাওয়া বইছিল। মৃদু হাওয়াতে ওই ছবি আঁকা আরসীখানা কে যেন বারে বারে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিচ্ছিল। নিশ্চল হ্রদের বুকে তুষারশুভ্র শৃঙ্গ "মচ্ছপুছারে"র (fish tail) প্রতিবিম্বের সৌন্দর্যের জগৎজোড়া খ্যাতি।

সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে তারপর প্লেনে চড়ে অভুক্ত অবস্থায় বেলা শেষে পৌঁছনোর পর আমাদের পথ চলার উৎসাহের আর কণামাত্রও অবশিষ্ট রইল না। তবু কর্তব্যের খাতিরে ডাঃ বিশ্বাস, দাদা, আর বন্ধু গেলেন ট্যুরিষ্ট অফিসে হোটেলের খোঁজ করতে, আর আমি রইলাম মালের জিম্মাতে। কিছুক্ষণ পর বন্ধু ফিরে এলো—Sun-N-Snow হোটেলে জায়গা নেই, অমর হোটেলে স্থান পাওয়া যেতে পারে, সেও কেবল আজ রাতের জন্য। হোটেলওয়ালী মেয়েটি বলেছে, কাল ভোরে তাদের আত্মীয়স্বজন আসবে দশেরা উপলক্ষ্যে, সুতরাং কাল ঘর খালি করে দিতে হবে। আমরা আপাততঃ তাতেই রাজী। অমর হোটেলের কথা শুনে ট্যুরিষ্ট অফিসার মিঃ মানসিং মুখ

টিপে হেসে বললেন, হ্যাঁ, ভালই, আপনারা নিজের বাড়ীর মত আনন্দে থাকতে পারবেন (Well, you will feel homely there)!

বন্ধু তাঁর বক্রোক্তি শুনে এসে আমাকে বলে, "ছোট মামা তো মানছেন না, ওখানেই থাকবেন ঠিক করেছেন। আমরা আজ রাতটা না হয় ট্যুরিষ্ট বাংলোর মাঠে তাঁবু পেতে কাটিয়ে দিতাম, কাল একটা-না একটা ব্যবস্থা হয়েই যেতো।" আমার বলবার কিছু নেই, ভাববার শক্তিও নেই। শান্ত মুখে ওঁদের সবার পিছু পিছু অগ্রসর হই। এখানেও বিপত্তি। ওঁর পিছনে আমাকে আসতে দেখেই হোটেলের কর্ত্রীর মেজাজ গরম হয়ে গেছে। সে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত আমাদের আর ঘর দিতে চায় না। কথা কাটাকাটি, অবশেষে রাগারাগি!

দাদা এদিকে টুক্ করে কোথা থেকে ঘুরে এলেন। আমাকে আড়ালে ডেকে বলেন, "বাথরুমের অবস্থা অতি শোচনীয়, সুতরাং ভেবে দেখ একবার!" পাহাড়েও দাদা বাথরুম-বিলাসী!

ডাঃ বিশ্বাস তো রেগে চটে লাল। এদিকে সকলেই প্রচণ্ড ক্লান্ত। বন্ধু কথা না বাড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত অন্নপূর্ণা হোটেলে দু'খানা কামরা পাওয়া গেল। এটি তিব্বতী শের্পা হোটেল। আমরা সেখানেই চলে যাবো। ইতিমধ্যে মেয়েটির অর্থাৎ হোটেলের কর্ত্রীর রাগের কারণও বোঝা গেল। বিকাল হতে না হতেই সে অতি আধুনিক সাজে সজ্জিত হতে সুরু করল। ঘর থেকে বেরুলো নানারঙের মদের বোতল, অনেকগুলি চেয়ার, আর নানা বয়সের নানাদেশের ছেলেরা জমায়েত সুরু করল। ট্রান্‌জিস্টার রেডিওতে বাজছিল বোম্বাই ফিল্মের গান। ট্যুরিষ্ট অফিসারের বক্রোক্তির অর্থও হৃদয়ঙ্গম হোল এতক্ষণে। ডাঃ বিশ্বাস এতটা বুঝতে পারেন নি, সকলের ঠাট্টায় অস্থির হতে হলো তাঁকে।

অন্নপূর্ণা হোটেলটি বেশ ভালো। এই হোটেলের মালিক তিব্বতী অর্থাৎ হিন্দী, বাংলা, ইংরাজী, নেপালী কোন ভাষারই চলনসই জ্ঞান

নেই। ওখানকার যাবতীয় কর্মীও তিব্বতী। কিঞ্চিৎ জলাভাব থাকলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো হোটেলটি। অনেক ইউরোপীয় ট্যুরিষ্ট এসে রয়েছেন এখানে।

পোখারা থেকে মুক্তিনাথের দূরত্ব সঠিক বলা কঠিন। পাহাড়ী পথ, তার উপর এইসব অঞ্চলে কস্মিনকালেও সার্ভের রশি পড়েনি। তবে মনে হয়, পঁচাত্তর বা আশি মাইলের কম তো কিছুতেই নয়। কাজে কাজেই আমাদের বন্দোবস্ত তদানুরূপ করতে হবে। আমরা সময়মত আসতে না পারাতে সময়টা যাত্রার পক্ষে খানিকটা দেরী হয়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণই প্রকৃষ্ট সময়। বর্ষার পরেও কিছু যাত্রী যায় বটে, এখন তাদেরও ফিরবার সময় হয়ে এসেছে। আজ দশহরার দিন, এমন সময় নেপালের মত পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাজ্যে কুলি পাওয়া খুব দুর্ঘট। দশহরার উৎসব ছেড়ে কেবা চাইবে আমাদের সাথে বনে বাদাড়ে ঘুরে মরতে? তবু, এখানকার ট্যুরিষ্ট অফিসারের আন্তরিক সহযোগিতায় চারজন কুলির বন্দোবস্ত হ'ল দৈনিক ১৪ টাকা (নেপালী) হিসাবে। পূজার সময় বলে তাই, নইলে ১০।১২ টাকায় পাওয়া যায়। দোকান বন্ধ, ব্যাঙ্ক বন্ধ, অনেক কষ্টে ভারতীয় টাকাগুলি পরিবর্তন করে নেপালী টাকা নেওয়া হলো। ভৈরবাতে মিঃ কোরেশী ভারতীয় টাকা কিছু বদলে দিয়েছিলেন। ভারতীয় ১০০ টাকায় নেপালী ১৬০ টাকা পাওয়া গেল। এখন অবশ্য ১০২ পাওয়া যায়। এদের আট-আনাকে এরা "মোহর" বলে; টাকার চেয়ে মোহরের ভাষাতে এরা দাম নির্ধারণ করে সহজে।

কুলির বন্দোবস্ত করে ফেলাতে মনটা অনেক হালকা হলো।

দুই

"ও মনি! ভক্তি! উঠে এসো, বাইরে এসে দেখে যাও একবার," প্রত্যুষে দাদার সাদর আহ্বান কানে আসতেই দুজনে বিছানা ছেড়ে বাইরের মাঠে বেরিয়ে পড়ি।

কাল দিনের প্রখর সূর্য্যালোকে মেঘে ঢাকা তুষার শিখর ভাল করে দেখা যায়নি। আজ বাইরে বেরিয়ে অপরূপ দৃশ্য দেখি। উত্তর দিগন্তের সবটা গোলাকারে ঘিরে সারিসারি তুষারশিখর অনুপম রূপ নিয়ে যেন হাসছে। শুভ্র চূড়াগুলিতে কেবল একটু একটু লালচে আলোর ছোঁয়া লেগেছে, বাকিটা এখনো নীলচে। উজ্জ্বল সূর্য্যালোক ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে নামছে, সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র শিখরগুলি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ডাঃ বিশ্বাস তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বইখানা বের করে আনেন, একজন জার্মাণ পর্বতারোহী ছবি এঁকে দিয়েছেন, ট্যুরিষ্ট অফিস থেকে তাই টুকে এনেছেন—

সামনে থেকে পশ্চিমে অন্নপূর্ণা (সাউথ), অন্নপূর্ণা (১), মচ্ছপুছারে, অন্নপূর্ণা (৩), অন্নপূর্ণা (৪), অন্নপূর্ণা (২), লামজুং হিমল পরপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমপ্রান্তে আছে ধৌলাগিরির খানিকটা, আর পূর্ব প্রান্তে আছে মানাসলু, গণেশ হিমল ও ল্যাংট্যাং শিখর, অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে মচ্ছপুছারে শৃঙ্গটি। মাছের লেজের

মত দেখতে, তাই এই নাম। কি উজ্জ্বল, কি বলিষ্ঠ রূপ তার। ওই পশ্চিমে ধৌলাগিরি, ওই অন্নপূর্ণা, ওরই মাঝখান দিয়ে আমাদের চলার পথ। পায়ের কাছে অন্নপূর্ণা হোটেলের ফুলভরা বাগান, সাথে লাল-টালীর ঘরগুলির অবস্থিতি যেন সে সৌন্দর্য আরও পরিস্ফুট করছে।

আটটার একটু পরে ভীমবাহাদুর তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হলো। তার আসবার কথা ছিল সাতটায়। ভীমকে আমাদের কুলিসর্দার ও রাঁধুনি নিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু সে এসে সুসংবাদ দিল একটা কুলি ইতিমধ্যে পালিয়ে গেছে। সে দশেরার দিন তার বাড়ী থেকে বেরোবার অনুমতি পায়নি। অন্নপূর্ণা হোটেলের মালিক একজন তিব্বতী কুলি নিয়ে এলেন, ইতিমধ্যে ভীমও একজন কুলির যোগাড় করে ফেলেছে। যাই হোক্, ভীমের আনা নেপালীটির সঙ্গে কথা বলে বন্দোবস্ত করে শেষ পর্যন্ত আমরা যখন রওনা হলাম, বেলা ন'টা বেজে গেছে তখন।

আজকের গন্তব্যস্থল হলো, এগারো মাইল দূরে অবস্থিত নওদাঁড়া বা নওদাণ্ডা গাঁও। পোখারা উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে কতকগুলি পাহাড় দেখা যায়, তারই একটির চূড়ায় এই নওদাঁড়া গ্রাম।

এয়ারপোর্ট থেকে পোখারা বাজারের দূরত্ব দুই মাইলের বেশী ছাড়া কম হবে না। লাল মেটে পথ, সবুজ গাছপালার মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে গিয়েছে। মাঝে মাঝে বট, অশ্বত্থ গাছ ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে। বাজারের ঘরবাড়ীগুলি দুধারে সারি দেওয়া; মাঝখানে সরু অসমতল পথ, কাঁচা, তবে সাইকেল চলে, আর চলতে পারে জীপ। চলেও। বেশীর ভাগই পায়ের উপর ভরসা করে থাকতে হয়। বাজারের কাছে, পথের মধ্যস্থলে একটা ছোট্ট মন্দির। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে বীভৎস দৃশ্যে আর থামবার ইচ্ছা হয় না। পশুবলির রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছে মন্দিরের ভিতরের দেবমূর্তি ও চারিদিকের বারান্দা, দরজা ইত্যাদি। কিছু পরে দেখি, একটা বড় নল থেকে জল পড়ে পড়ে পথ ভেসে যাচ্ছে। তার পরই একটি পথের

সংযোগস্থলে একটা বাঁধানো অশ্বত্থ গাছের নীচে একজন ইউরোপীয় ট্যুরিষ্ট তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দুটি ঘোড়ায় চড়ে ছায়াতে অপেক্ষা করছেন। নল পার হয়ে বাঁধানো ফুটপাথ ও লাল মাটীর পথ ধরে এগিয়ে চলেছি, কিন্তু পিছনে বারবার তাকিয়ে দেখছি, ভীম বা অন্য "পাণ্ডব"দের দেখা নেই। পথ প্রায় নির্জন বললেই হয়। বাজারও বন্ধ, কেবল দু'চার জন পূজার্থী পূজার সামগ্রী নিয়ে মন্দিরে চলেছেন। দু'তিন জন লোক ধরাধরি করে একটা সদ্য বলি দেওয়া ভেড়ার ধরটা বয়ে নিয়ে চলেছে, একজনার হাতে মাথাটা। দুটো থেকেই রাস্তায় টপ টপ করে রক্ত ঝরছে। আমরা তিনজন পথের ধারে "ভেষজ সদন" নামে বন্ধ একটা কবিরাজী দোকানের বারান্দায় বসে রইলাম। বন্ধু এগিয়ে গেছে।

পোখারা সহরটি ছোট, কিন্তু চারিদিকের পাহাড়পর্বত ঘেরা পরিবেশে সেটুকু যেন ছবির মত সুন্দর মনে হয়।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ভীমের দেখা পাওয়া গেল। নতুন আগন্তুক কুলিটি খেতে বাড়ী গিয়েছিল, ভীমও তার সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ীতে গিয়েছিল ওকে সামলাতে। দাদার পরামর্শ মত পোখারা বাজার থেকেই কিছু মিঠাই কিনে নেওয়া হলো। পথে চা তৈরী করে খেয়ে একটানা চলা যাবে। নওদাঁড়ার আগে থেমে থাকা আজ ঠিক হবে না।

পোখারা বাজার ছেড়ে রওনা হতে আমাদের সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। অল্প কিছু এগিয়ে পথ বাঁদিকে ঘুরে গেছে সোজা মাল্‌টিপারপাস্‌ স্কুল ও নতুন আমেরিকান হাসপাতালের দিকে। আরও কিছুদুর এগিয়ে শ্বেতী নদীর তীর ধরে ধরে পথ। প্রথম মাইল ছয় কোথাও চড়াই বা উৎরাই নেই। শ্বেতীর ধারে ধারে মাইলখানেক গিয়ে নদী পার হতে হলো। বর্ষার জলের তোড়ে ব্রীজটির ওপারের সিঁড়ি ভেঙে গেছে, তাই আধভাঙা ব্রীজের ভাঙা অংশটুকু পার হবার জন্য একটি অভিনব উপায় এরা সৃষ্টি করেছে। জলের

ধারাটা আস্ত অংশের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে। শেষপ্রান্তে প্রায় ছয় ইঞ্চি চওড়া একটি বাঁশকে গাঁটের উপরের অংশ কেটে কেটে মই-এর ধাপ তৈয়ারী করেছে; সেই মই নামধেয় বস্তুটি ব্রীজের গায়ে আটকে রেখেছে। ওরই সাহায্যে সেতুর বক্ষে নেমে পাথর ডিঙিয়ে নদী পার হওয়া।

আরও মাইল তিন এগিয়ে "হুন্‌জা" গ্রাম পেলাম। দলে দলে তিব্বতী ও নেপালী ছেলে-মেয়েরা চলেছে বোঝা নিয়ে; তাদের গাঁয়ের দিকে। আমরা তাদের দলে ভিড়ে এগিয়ে চলেছি। বেলা পৌণে একটার সময় একটা মাঠের মধ্যে ছোট্ট গ্রামে আমরা পৌঁছলাম। এটি তিব্বতী হুন্‌জা গ্রাম, তিব্বতী বাস্তুহারাদের গ্রাম, তাই গ্রামটির ঘরবাড়ীর অবস্থাও শোচনীয়। হুন্‌জা একটি গ্রাম নয়, বিরাট এলাকা জুড়ে পর পর তিনটি গ্রাম, তিনটির নামই হুন্‌জা। গ্রামগুলি বেশ ছড়ানো। প্রচুর শস্যক্ষেত্র চারধারে। তিব্বতী হুন্‌জা গ্রামে একটি দরিদ্র তিববতীর ছোট্ট কুঁড়েতে বসে চা তৈরী করে, সঙ্গের আনা খাবার খেয়ে চাঙ্গা হওয়া গেল। তিববতী গৃহকর্তা আমাকে ক্লান্ত দেখে তাড়াতাড়ি ঘরের বেড়া দেওয়া অংশে একটা বাঁশের মাচাতে ময়লা কম্বল পেতে দিয়ে আমাকে বিশ্রাম করবার জায়গা করে দিলেন। দরিদ্র খুব এরা, কিন্তু এদের আন্তরিকতা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করল।

বিশ্রামের পর আবার চলা সুরু, তখন বেলা দুটো। চলতে চলতে গ্রামগুলির বড় বড় মাঠে কয়েকটা সরষের তেলের ঘানি দেখলাম। মেয়েরা নিজেরাই ঘানি ঘুরাচ্ছে। বড় বড় মাঠের কোথাও কোথাও আমগাছের তলায় গ্রামবাসীরা একত্র গোল হয়ে ভিড় করে বসে উদ্‌গ্রীব হয়ে কি যেন দেখছে। আমরা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, দশেরা উপলক্ষ্যে যে মহিষ বলি হয়েছে, সেই মাংস কুঠার দিয়ে কেটে কেটে টুকরা করে ভাগ করা হচ্ছে। ওরা এই মাংসকে "শিকার" বলে। মহিষের মাংস ওদের কাছে নিষিদ্ধ নয়। শুনলাম

ওদের মন্দিরে মুর্গি, পাঁঠা, ভেড়া বলি দেওয়া হয়। মুর্গির ডিমকে ওরা 'ফুল' বলে, এই ফুল ঠাকুর পূজার একটি বিশেষ উপকরণ। পথে আসবার সময় পোখারাবাজারে চন্দন, তুলসী, কুশ, বেলপাতার সঙ্গে দুটি মুর্গির ডিম সাজিয়ে নিয়ে পূজার জন্য চলেছে, দেখে এসেছি।

হুন্জার শেষ গ্রামে পৌঁছাতে আমাদের প্রায় আড়াইটা বেজে গেল। একটা বাঁধানো অশ্বত্থ গাছের তলায় বন্ধু বসে চা খাচ্ছে। সে চলে তাড়াতাড়ি। আমাদের জন্যেও চা রেডি। গাছতলায় একটুক্ষণ অপেক্ষা করতেই কুলিরা এসে হাজির হলো। একজন আমেরিকান যুবক এসে গাছ তলার বেদীতে বসে চা খাচ্ছেন, পরণে তাঁর পর্বতারোহীর পোষাক, পিঠে মালবোঝাই দামী রুক্স্যাক, সঙ্গে মাল নিয়ে আরও কয়েকজনা কুলি চলেছে। বললেন "তুকুচে" পিক চড়তে যাচ্ছেন। তবে তো আমাদের পথেই এখন চলবেন।

এখনো মাইল পাঁচ ছয় বাকি। এখানে চা খেতে খেতেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। আমরা মালপত্র থেকে বর্ষাতি বের করে নিলাম। এখান থেকে একটি বিরাট শস্যক্ষেত্রের সুরু। শস্য-ক্ষেত্রটিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে একটি খাল গেছে, তারই বাঁধের উপর দিয়ে এখনকার পায়ে চলা পথ। পথের মধ্যে মধ্যে কয়েকটি ছোট ঝরণাও পেলাম। ঝরণাতে ও খালের টলটলে জলে ছোট্ট ছোট্ট রূপালীমাছ খেলে বেড়াচ্ছে।

হুন্জার শস্যক্ষেত্র শেষ হতে হতেই নদীর বুক চিরে পথ গেছে সোজা পোখরা থেকে দেখা সেই ধোঁয়াটে পাহাড়ের নীচ অবধি। এ পর্যন্ত পৌঁছাতেই সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এলো। আমরা যথাসাধ্য দ্রুত চলবার চেষ্টা করছি। শুভ্র বেলাভূমির মাঝে মাঝে নদীর স্ফটিক স্বচ্ছ ধারা বয়ে চলেছে। সেই ধারাগুলি পার হবার সময় আমাদের জুতো মোজা সব জলে ভিজে একসা হয়ে গেছে। এখানে অল্প জল নদী পার হবার কোন বন্দোবস্ত নেই, সকলে হেঁটেই পার হয়। এখন

আবার-ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়তে সুরু হ'লো। পথও চড়াই, তাছাড়া ঘনবনের মধ্য দিয়ে। তাই আমাদের দ্রুত চলবার চেষ্টায় বিশেষ ফল হচ্ছে না। নওদাঁড়া এখনো অন্ততঃ দুই মাইল দূরে, দেড় হাজার ফুট উঁচুতে। দাদা তাঁর স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছেন। বন্ধুও এগিয়ে গেছে, সে দেরাদূনের পাহাড়ী পথে চলে অভ্যস্ত, চলায় কোন অসুবিধা নেই। আমরা দুজন চড়াই পথে চলে অভ্যস্ত নই, তাছাড়া আজ যাত্রাপথে প্রথমদিন বলে বেশ ধীরে ধীরে চলেছি। ফলে কালো পাথরে বাঁধানো সিঁড়ির মতন পথে চলতে চলতে কখন যে সন্ধ্যা আঁধার আমাদের ঘিরে ফেললো, আমরা টের পেলাম যখন তখন আর চলবার পথ চোখে দেখতে পাচ্ছি না। একটা পথের সংযোগস্থলে দেখি একদল মেয়ে পিঠে ঘাসের বোঝা নিয়ে কলরব করতে করতে বাড়ী ফিরছে। প্রশ্ন করে বুঝলাম, পথ দুটি একই দিকে গেছে, তবে একটি সিঁড়ির মত পাকদণ্ডি পথ বলে কম সময়ে যাওয়া যাবে। আমরা দায়ে ঠেকে পাকদণ্ডি পথই বেছে নিলাম। এই পথ খানিকটা এগিয়ে চওড়া পথে মিশেছে।

"ছোটমামা, ও-ও ছোটমামা, মামী-মা-আ"

"কে, বন্ধুর গলা না ?" নীচে থেকে বন্ধুর গলা ভেসে আসছে। আমরাও চেঁচিয়ে জবাব দিই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে ও আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য পথে থেমেছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও আমাদের দেখতে না পেয়ে চেঁচাতে সুরু করেছে।

বলে, "আমি কি ভাবতে পেরেছি যে আপনারা ওই বিচ্ছিরি সর্টকাট্‌ ধরবেন ?"

খুব বিপদে পড়েছি, তবে এখন সাহস দেবার জন্য বন্ধু রয়েছে! বৃষ্টিতে ভিজে একশা, রেনকোটের ফাঁক দিয়ে জল ঢুকছে, চোখে চশমাতে জল পড়ে পড়ে চোখেও দেখতে পাচ্ছি না। এদিকে পথের অবস্থাও কহতব্য নয়। ভুল করে কেউ আজ টর্চও সঙ্গে আনিনি। এত দেরী হল অপ্রত্যাশিতভাবে, কেবল কুলিদের জন্য। অতি সাবধানে

একপা একপা করে এগিয়ে চলেছি। এক অন্ধ অন্যজনের হাত ধরে চলবার চেষ্টা করছি। দুরবস্থার আর অন্ত নেই। পথে লোকও নেই বললেই চলে। দু'একজনা যার সাথে দেখা হচ্ছে, প্রশ্ন করলে বলে "নওদাঁড়া ইস্কুল? ওতো এক-দো ফার্লং হোগা।"

কিন্তু আমাদের সেই এক-দো ফার্লং কি আর আজ শেষ হবে না?

আকাশ মেঘে ঢাকা। শীতের সুরু, সকাল সকাল অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। আমরা প্রায় অচল, এমনি সময়ে একজন যেন দৈব প্রেরিত হয়ে আমাদের পিছন থেকে এসে আমাদের পার হয়ে এগিয়ে চলেছে, সেও নওদাঁড়া যাচ্ছে। আমরা তারই পদক্ষেপ অনুসরণ করে চলেছি।

হঠাৎ অদূরে পাহাড়ের চূড়ার দিকে মনে হল একটা আলো নড়ছে, যেন এগিয়েও আসছে আমাদের দিকে। একটু কাছে আসতেই দেখি, লণ্ঠন হাতে আমাদেরই এক কুলি মহাত্মা। ধড়ে প্রাণ এলো। অন্ধকারে পাথুরে পিছল পথে আমাদের বিপদ অনুমান করে দাদা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নওদাণ্ডা আর দূরে নেই। মনে হলো স্বর্গ থেকে দেবদূত যেন আলো হাতে নেমে এসেছেন।

সকলে কাকভিজে হয়ে যখন নওদাণ্ডা ইস্কুলে পৌছলাম, তখনো অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। শীতে আমরা জড়সড়। রাত সাড়ে সাতটা। পৌঁছে দেখি, ইতিমধ্যেই দাদা তাঁর নরমগরম স্লিপিং ব্যাগখানা খুলে আরাম করে জড়িয়ে বসেছেন। তিনখানা বেঞ্চি জোড়া দিয়ে নিজের জন্য শোবার চৌকী তৈরী করে নিয়েছেন। আমাদের তিনজনের জন্যও কয়েকখানা বেঞ্চি জোড়া দিয়ে ঠিক করিয়ে রেখেছেন খাটের মত করে। ওদিকে দোকানে চা আনতে পাঠানো হয়েছে।

শ্রান্ত ক্লান্ত আমরা, অন্ধকারের জন্য যেন একটু দিশাহারা। এই ভাব কমলে ডাঃ বিশ্বাস বলে ওঠেন, "দেখি বাবা, আমার পায়ে আবার জোঁক টোঁক নেইত! বনে জঙ্গলে বৃষ্টিতে হেঁটেছি, মোজার ভিতর কেমন যেন সুড়্ সুড়্ করছে।"

পাটনের কৃষ্ণ মন্দির (কাঠমাণ্ডু)

"এইতো"! বলে ওঠেন উনি একপায়ের মোজা খুলেই।

ঠাট্টার সুরে বন্ধু বলে, "ছোট মামীমা তো সারাপথ জোঁক জোঁক করতে করতে এসেছেন"—তার বলা আর শেষ হয় না—"ও ও মামা, আমার পায়েও, ছু-ছুটো—"।

"ইস্ আমার পায়েও একটা" কাঁদ কাঁদ সুরে বলি। "কখন থেকে বলছি যে আমি শুনেছি সিকিমের মত জোঁক এখানেও আছে। কেমন হলো তো!" বন্ধুকে কটাক্ষ করে আবার বলি, "তুমি তো মানতেই চাওনা—কেবল ঠাট্টা কর"। বন্ধু নীরবে অভিযোগ মেনে নেয়।

"আমার পায়েও আছে কিনা দেখি!" অবহেলা ভরে দাদা বলেন। সঙ্গে সঙ্গে যোগ দেন জোঁক খুঁজতে। পরক্ষণেই আঁৎকে ওঠেন, "এঃ, আমার বিছানা পত্তর যে একেবারে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল।"

ভীমের ডাকাডাকিতে কুলিরা ছুটে এসেছে আমাদের জোঁক মুক্ত করবার জন্য। আমরা একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। কিন্তু উপায় কি, জোঁক জড়িয়ে তো ঘুমাতে পারব না!

দাদা বলেন, "ভুকুচে পিক চড়নে ওলা ইউরোপীয় ছেলেটিও এই বাড়ীরই অন্য ঘরে আস্তানা নিয়েছে।"

ডাঃ বিশ্বাস এবার সাথে করে ছোট্ট একটা ট্রানজিষ্টর রেডিও এনেছেন, কি জানি কখন আবার যুদ্ধ বাধে। রাত্রে স্লিপিংবাগের ভিতর শুয়ে খবর শোনা হলো। অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই।

তিন

ভোরে উঠে দেখি, বৃষ্টি থেমে গেছে। চারিদিকের মাঠ ঘাট গাছ পালা বৃষ্টির জলে ধোয়া, কিন্তু ঘন কুয়াশায় এখনো চারিদিক ঢাকা। পথ চলেছি, বিশেষ চড়াই বা উৎরাই কোনটাই নেই। পর্বতমালার গিরিশিরার উপর নওদাঁড়া একটি সৌন্দর্যপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। আমরা গ্রামের বাজার ও ঘরবাড়ীর সারির মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা পথে চলেছি। গিরিশিরার উপর দিয়ে পথ, তাই পাহাড়ের দুদিকেরই উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। কিছুদূর চলার পর মেঘ ধীরে ধীরে সরে গেলেও দূরের পাহারগুলির গায়ে এখনো স্তূপ স্তূপ শুভ্র মেঘ জমে প্রায় পুরো পাহাড়গুলিকেই ঢেকে রেখেছে। ফিরবার সময় এই পথেই পৃথিবীর বৃহত্তম শৃঙ্গগুলির অন্যতম অন্নপূর্ণা গিরিশ্রেণীর অনুপম সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ফিরেছিলাম। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত তুষার মৌলী শিখরাবলী উজ্জ্বল পরিষ্কার দেখা গিয়েছিল। সেই সময় এখান থেকে পোখারার "ফিউয়া" হ্রদেরও পূর্ণাবয়ব চোখে পড়েছিল। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়ের সার চলেছে দিগন্ত অবধি, দূরের শৈলমালার চূড়া শুভ্র তুষারে আচ্ছন্ন, মাঝখানে ঘন সবুজ উপত্যকায় কে যেন একখানা নীলাপাথরের বিশাল টুকরো ফেলে রেখে দিয়েছে। আজ কিন্তু সবই পেঁজা তুলোর মত মেঘের স্তূপে ঢাকা পড়ে আছে। চারিদিকের মেঘের সমুদ্রের মধ্যে

কিছু যে আছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। ওই মেঘের সমুদ্র যেন মাটির ও পাহাড়ের ঘন কুয়াশার সঙ্গে যোগ দিয়ে একাকার হয়ে মিশে গেছে। আমরা সেই ঘন কুয়াশার পর্দা ঠেলে এগিয়ে চলেছি।

গ্রাম পার হতেই হুজন আমেরিকান মহিলার সঙ্গে দেখা। সঙ্গে মাল বইবার কয়েকজন কুলি চলেছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তাঁরা আমেরিকান পিস্ কোরের লোক, বাদ্‌লুঙ্ যাচ্ছেন। বাদ্‌লুঙ্ যেতে এখান থেকেই নীচের পথ ধরতে হয়। আমরা ঠিক করলাম, ফিরবার সময় আমরাও বাদ্‌লুঙ্ হয়ে ফিরবো।

একটার পর একটা গ্রাম পেরিয়ে চলেছি। বেশ বড় বড় সুন্দর সাজানো সমৃদ্ধশালী গ্রাম। সবই প্রায় পাহাড়ের গিরিশিরাতে, হুয়েকটা পাহাড়ের পায়ে বসান। গ্রামের আশে পাশে পাহাড়ের গায়ে, উপর থেকে নীচ অবধি যতদূর দৃষ্টি চলে সব চাষের ক্ষেত ভরা। ফসল ফলে সবুজ হয়ে আছে। গ্রামের বাড়ীগুলি মাটি ও পাথরের তৈরী বেশ ছিম্‌ছাম্ পরিচ্ছন্ন, লাল মাটি দিয়ে নিকানো পুঁছানো। কিন্তু গ্রামের মাঝখান দিয়ে গ্রামের পথ, পাথরে বাঁধানো হলেও সাধারণ ভাবে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। ওদের বাথরুম পায়খানার বালাই নেই, তাই এই হুরবস্থা। পাহাড়ীরা স্বভাবজ নোংরা, কিছুটা জলাভাবের জন্য কিছুটা শীতের জন্য। কিন্তু তাদের স্বাস্থ্য পরিপূর্ণ উজ্জ্বল দেহ দেখলে বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না যে এদের খাদ্যাভাব নেই। লাল টুকটুকে আপেলের মত ফুলো ফুলো হুটি গাল নিয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চারা সর্বত্র দৌড়াদৌড়ি করে আনন্দে খেলা করছে। আমাদের দেখেই দৌড়ে এলো। প্রতি গৃহের উঠানে বাঁশ মাটিতে পুঁতে দাঁড় করিয়ে তাতে অজস্র ভুট্টা শুকনো করবার জন্য উঁচুতে ঝোলান রয়েছে। হাঁস, মুর্গি, গরু, মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। মাঠে আছে ধান, কিছু কিছু গম। স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ সজীব গৃহগুলিতে স্বাস্থ্যবান লোকদের আনাগোনা দেখে আনন্দ হয়। নেপালে আধুনিক সভ্যতা এখনো সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার পায় নি। এটি সহজেই লক্ষ্যনীয়। কৃষি নির্ভর দেশ,

তাই এখনো এখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মুখ ফিরিয়ে নেই। এখানকার জন-সাধারণ আত্ম-সন্তুষ্ট বলে মনে হলো। এদের কাঁচা টাকা পয়সার অভাব আছে কিন্তু সহজভাবে থাকা খাওয়ার অভাব নেই।

ক্রমশঃ, সুন্দর একটা সমৃদ্ধিশালী গ্রাম—লুমলে পার হ'লাম। চলার পথে গ্রাম থেকে অনেকে যেচে এসে আলাপ করে গেলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কলকাতা, ব্যারাকপুর, লক্ষ্ণৌ গেছেন ফৌজের কাজ নিয়ে। এখন ফিরে এসে শেষ জীবনে ক্ষেত খামারের দেখা শোনা নিয়ে সুখে আছেন।

লুমলের পর আরও দু' একটি ছোট গ্রাম পার হয়ে গিরিশিরার শেষপ্রান্ত চন্দ্রকোটে পৌঁছলাম। চন্দ্রকোটের শেষে পাহাড়ের গায়ে একটা আমগাছ আছে। তার পাশে একখানা ঘরে একটি নেপালী মেয়ে আমাদের চা খাওয়ার জন্য ডেকে বসাল। দাদা ও বন্ধু এখানে চা খেয়ে গেছেন। বৌটি ফেরৎ পয়সা না দিতে পারায় ওঁরা আমার জন্য চায়ের কথা বলে গেছেন।

আমগাছের নীচে থেকেই উৎরাই পথের সুরু। প্রচণ্ড খাড়া উৎরাই। নীচে নামাও যে এত কষ্টকর হতে পারে, সেদিন প্রথম অনুভব করলাম। খাড়া সিঁড়ির মত উঁচু পাথরের অসমতল ধাপ সোজা নিচের দিকে নেমে চলেছে। প্রতি পদক্ষেপে মনে হয় আর টাল সামলানো গেল না। দাদা ও বন্ধু অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। আমরা দুজন একত্র চলেছি।

চন্দ্রকোটের পর বীরথাটে পৌঁছাতে আমাদের দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে গেল। কাল বৃষ্টির মধ্যে জোঁকের কামড় সহ্য করে প্রাণপাত পরিশ্রম করে যে দেড় হাজার ফিট উঁচুতে উঠে এসেছিলাম, আজ আবার প্রায় ততটাই নীচে নেমে আসতেও আমাদের কম কষ্ট পেতে হলো না। মণ্ডীনদীর উপরের ঝোলান ব্রীজ পার হলেই বীরথাটে গ্রাম, মণ্ডী-ভুরুণ্ডীর সঙ্গমে। একটু এগিয়ে পথের ধারে ভুরুণ্ডী নদীর তীরে ইস্কুলবাড়ী। আমরা ইস্কুলের বারান্দা-মত ঘরের

মধ্যে বেঁঞ্চি জোড়া দিয়ে তার উপর বিশ্রাম করবার জন্য গা এলিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে দাদা আগে পৌঁছে বিশ্রাম করে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। এখন স্নানের উদ্যোগ করছেন।

এখানে আসবার সময় রৌদ্রে থাকতেই আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল, আকাশও ঘন মেঘে ঢেকে গেলো, কুয়াশা আমাদের চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। দাদা বললেন, আমরা এখানে খাওয়া সেরে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে সুদামে-র পথে রওনা হব। মাইল চারেক চললে সুদামে পাওয়া যাবে আশা করা যাচ্ছে। পাহাড়ী মতে পথও "ময়দান-মাফিক" অর্থাৎ চড়াই-উৎরাই নেই। ভীমবাহাদুর বললে, সুদামে গ্রামে থাকবার ভালো ঘর পাওয়া যাবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

"হ্যালো! ডাক্তার!" সেই আমেরিকান ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। ইনি ফিজিওলজিষ্ট, একাই এসেছেন। পোখারাতে ট্যুরিষ্ট অফিসে অনেকক্ষণ এঁর সাথে গল্প করা গিয়েছিল। এখানে দেখে মনে হলো, যেন পুরণো বন্ধুর দেখা পেলাম। আমি আমার স্বামীর সাথে হেঁটে বেড়াতে এসেছি দেখে খুব খুশী হয়েছেন। উৎসাহিত হয়ে বলছেন, আগামী বারে নেপালে সস্ত্রীক বেড়াতে আসবেন। এখানে একজন নেপালী রোগীর চিকিৎসাতে ব্যস্ত রয়েছেন।

পোখারা ছেড়ে এ পর্যন্ত যতদূর এসেছি, বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন পাহাড়ী বন্য সৌন্দর্য কোথাও চোখে পড়ে নি। তার প্রধান কারণ মেঘ ও কুয়াশা। সকলে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছি, যেন খাটুনীর তুলনায় মজুরী অতি কম। এদিকে বৃষ্টির জন্য জোঁকের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেড়েছে, পথে চলবার সময় পদে পদে অসংখ্য জোঁক দেখতে পাচ্ছি, তাই পথ চলার আতঙ্কও বেড়ে গেছে। পথ চড়াই না হলেও পাথুরে, তেমন সমতল নয়। কোথাও কোথাও আবার ঝরণার ধারা গ্রামের ভিতর পথের উপর দিয়ে বয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে, দুধারে বিছুটির ঘন জঙ্গল। এই পথে জুতো শুকনো রেখে, বিছুটি ও জোঁকের

আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে চলা যেমন কষ্টকর, তেমনি বিরক্তি-জনক। তবুও আজ দুপুরে বিশ্রাম করে ক্লান্তি অপনোদনের পর বিকালের পড়ন্ত বেলায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে নদীর তীর ধরে ছায়া ঢাকা পথে চলতে কিন্তু বেশ লাগছে। তিনটের সময় রওনা হয়ে পাঁচটা অবধি প্রায় সমান রাস্তায় চলেও আমরা কিন্তু সুদামে গ্রাম পেলাম না। আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি এল বলে, অন্ধকারও হয়ে এসেছে। তখন দাদার পরামর্শ অনুযায়ী লাম্‌ভারে গ্রামে রাত্রি-বাস করাই ঠিক হলো।

লাম্‌ভারে অত্যন্ত ছোট একটি গ্রাম। তারই ততোধিক ছোট ঘরের মালিকের নিকট থাকবার অনুমতি পাওয়া গেল। মালিকের চেয়ে মালিকানীর প্রতাপ বেশী। সেই আমাদের থাকবার অনুমতি দিল। ঐ একই ঘরে একপাশে আমরা আমাদের বিছানা চারটি ঘেঁষাঘেঁষি করে পেতে ফেললাম। অন্য কোণে ঝুড়ি ঢাকা মুর্গি ও হাঁসের পালের কোঁকর-কোঁ ও প্যাঁক-প্যাঁক শোনা যাচ্ছে। তারই পাশে বিছানো সবুজ কচি ঘাসের উপর একটি মহিষ-বৎস বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে। ঘরের ভিতরের দিককার দরজার কাছে আমাদের পায়ের দিকে উনানে রান্না চড়লো। উনানের ঠিক উপরেই শিকে ঝুলান "শিকার" অর্থাৎ বলি দেওয়া মোষের মাংস শুকনো করা হচ্ছে। কিন্তু ঘরটি বেশ পরিষ্কার ভাবে লালমাটি দিয়ে নিকানো। এককোণে ছোট ছোট সরু সরু কাঠের তাকে কাঁচের ও ঝক্‌ঝকে পিতলের বাসন শোভা পাচ্ছে। ঘরটিতে ঢুকলেই পরিচ্ছন্নতার জন্য মনটা বেশ একটা প্রসন্নভাবে পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের রান্না ভীম্‌-বাহাদুরই করল। বাড়ীর নেপালী গৃহিনী ভীমবাহাদুর ও তার দল-বদলের জন্য খাবার তৈরী করে দিলেন, মোটা চালের ভাত ও ওই শিকারের ঝোল। ঘর ছোট হলেও রাত্রে ঘুমের তেমন কোন ব্যঘাত কিন্তু হলো না। কেবল একটি দুটি ইঁদুর মধ্যরাত্রে বোধহয় কুকুর বেড়ালের তাড়নায় সশব্দে আমাদের গায়ের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল।

চার

আজ ৬ই অক্টোবর। পরিষ্কার দিন, আকাশ নির্মেঘ, চারিদিক-কার পাহাড় ঘনসবুজ। লাম্‌ভারে ছেড়ে চলেছি। স্বচ্ছাতোয়া ভুরুণ্ডী নদীর তীর ধরে ধরে পথ চলেছে। প্রথমদিকে জঙ্গলের পথে মাইল দুই সামান্য চড়াই ও উৎরাই। মাঝে মাঝে শস্যভরা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলা। একটা ঝর্ণার উপর দুটি গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি পাতা, তারি উপর দিয়ে পার হয়ে সুদামে গ্রাম বাঁয়ে ফেলে হিলে গ্রামে পৌঁছলাম। এখানে একটি ঘরে বিশ্রামের ফাঁকে চা ও আলু-পোড়া খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আবার এগোই। একটা বড় ঝরণা এসে নদীতে মিশেছে, তার উপরে একটি নড়বড়ে কাঠের পোল।

এখানে একটা ঘরের বাইরে দেখি বিলিতি দামী নতুন রুকস্যাক ভরা মাল পড়ে আছে। কৌতূহলী হয়ে উঁকি মেরে দেখি ঘরে আগুনের ধারে উবু হয়ে বসে একজন আমেরিকান ট্যুরিষ্ট চা খাচ্ছেন।

এই পোল পার হয়েই উলেরির বুকফাটা চড়াইর শুরু হল। ওঃ কি কষ্টকর পথ! কেবল সিঁড়ি—সিঁড়ি, আর সিঁড়ি। এমনটি আমাদের কল্পনাতীত ছিল। এমন চড়াইর খবর আগে জানা থাকলে মুক্তিনাথ আসবার ইচ্ছা কতদূর বজায় থাকতো বলা কঠিন। বীর-ঘাটের পর পথে গ্রামবাসীদের যাকেই দেখেছি জিজ্ঞাসার উত্তরে ওরা হাত উঁচু করে আকাশের মধ্যস্থলে আঙুল উঁচিয়ে বলেছে, "উলেরি?

ওই উধর।" ভেবেছি, কি যে বলে ওরা তার মাথামুণ্ড কিছু নেই। আকাশের মাঝখানে উলেরি হবে কি করে? আজ চড়াই ওঠা সুরু করে বেশ বুঝতে পারছি, কেন ওরা অমন করে আঙুল নির্দেশ করেছে। উঁচু উঁচু পাথরের ধাপ পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা উপর পর্যন্ত একটানা উঠে গেছে। পথের কোথাও একটাও গাছ নেই যে তার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করা যাবে। আমরা গতকালই ভুল করেছি, কাল যেমন করে হোক সুদামে বা হিলেতে পৌঁছানোই উচিত ছিল। আজ বেলা বেড়ে যাওয়াতে নির্মেঘ নীলাকাশে তপন যেন আগুন ছড়াচ্ছে। পথেরও যেন কোন অন্ত নেই। ভোর সাড়ে ছয়টারও আগে রওনা হয়ে এখন এগারোটা অবধি চলেও উলেরির কোন চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না। নীচেও যেমন সিঁড়ি, সামনেও তেমনি অন্তহীন সিঁড়ি উঠেই চলেছে। আমরা হয়রান হয়ে পথের পাশে এক বৃদ্ধের ছোট কুটিরে ঢুকে শুয়ে পড়েছি। চড়াই পথে এইটিই প্রথম কুটির চোখে পড়ল। দাদা আগেই এসে এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দুজনের অবস্থা অতি কাহিল, আর চলবার সামর্থ্য নেই। বৃদ্ধটি সমবেদনার সহিত অতি যত্ন করে তার গাছের একটি বড় কাঁকুর নুন ও মরিচ সহযোগে খাওয়ালেন, সঙ্গে এক এক গ্লাস করে ঠাণ্ডা ঘোলের সরবৎ! সঙ্গে সঙ্গে সাহস দিয়ে বলেন, উলেরি আর দূরে নেই। অতি ধীরে চললেও পনের মিনিটে আপনারা সেখানে পৌঁছাতে পারবেন।

আবার পথ চলা। তেমনি সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলেছে। কোথায় পনের মিনিট! ঠিক একটি ঘণ্টা পর উলেরির প্রথম বাড়ীঘর দেখতে পেলাম। আরও পনের মিনিট পথ চলে, থাকবার যোগ্য একটা তিন-দিক ঢাকা বারান্দাও পাওয়া গেল। বেশ বুঝতে পারছি, আজ বিকালে আমার নড়বার আর শক্তি হবে না। কুলিরাও এখনো এসে পৌঁছয় নি, কখন আসবে তারও স্থিরতা নেই। তারা এসে পৌঁছালেও এগোতে চাইবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে আমার

স্বামী ও উমাপ্রসাদ দাদা ঠিক করলেন, আজ এখানেই আস্তানা নিয়ে এই বারান্দাতেই রাত্রিবাস করা হবে। আমার মনের একটা উদ্বেগ কাটলো। আমি সবচেয়ে বেশী খুশী। দাদা ছাড়া সকলেই দারুণ ক্লান্ত, দাদার যেন কোন কিছুতেই ক্লান্তি নেই। খুশী হয়ে রাত্রির জন্য আমি স্পেশাল ডিস্ রান্না করতে রাজী হয়ে যাই। বন্ধু কিন্তু তাতেও খুশী নয়। আর একবার চায়ের দাবী করে বসেছে। ভীম বাহাদুর একটার মধ্যে এসে পৌঁছালেও অন্যান্য বাহাদুররা এখানে আসতে আড়াইটা বাজিয়ে ফেলল। তারা পথের কোথায় যেন রান্না বান্না করে খেয়ে তবে এসেছে।

একটি খাড়া পাহাড়ের গায়ের মাঝামাঝি জায়গায় উলেরির ঘর বাড়ীগুলি তৈরী। দূর থেকে মনে হয়, কে যেন পুতুলের ঘর তৈরী করে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বসিয়ে রেখেছে। কয়েকটি চেরীগাছ ফলে ফুলে ছেয়ে আছে তাই উলেরির বন্য সৌন্দর্য আরও খুলেছে। উলেরিতে মাত্র দুটি ঝরণা আছে, বেশ কিছুটা দূরে বলে এখানে বেশ জলাভাব।

উলেরির জলাভাবের অসুবিধাতে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে সুতরাং ঘরের পাশেই একঘটি জলে হাতমুখ ধুয়ে স্নানপর্ব সমাধা করে নিতে আমাদের মোটেই অস্বস্তি বোধ হলো না। যে ঘরের বারান্দায় স্থান পেলাম, সেখানকার গৃহিনীই দুপুরে আমাদের জন্য রান্না করে দিলেন, রাত্রিবেলা আমি ভীমবাহাদুরকে রান্নাতে সাহায্য করবো।

এখান থেকে মচ্ছপুছারে শৃঙ্গটি ভারি সুন্দর দেখা গেল। দুটি সবুজ পাহাড়ের শৃঙ্গের খাঁজের মধ্যে মচ্ছপুছারের মৎসপুচ্ছটি দেখা গেল, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে বারবার তৃপ্তিভরে শিখরটির অনুপম সৌন্দর্য দেখতে থাকি।

আজ দশেরার উৎসব উপলক্ষ্যে উলেরিতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক অতিথি এসেছে। বিকালে কয়েকটি সুন্দরী সুসজ্জিতা তরুণী সপ্রতিভ ভাবে আমাদের গা ঘেঁষে বসে গল্প করবার চেষ্টা করল।

ভাষার বাধা না থাকলে ওদের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতার সৃষ্টি হতো। লাল টুকটুকে লম্বা হাতা জামা, গাঢ় নীল রঙের ঘাঘরা, মাথায় সাদা চাদর ঢাকা, কোমরে মস্ত কাপড় জড়ানো, গলায় এক বোঝা পুঁতির মালা, হাতে কাঁচের চুড়ি পরা মোটাসোটা গোলগাল একটি তরুণী আমার কাছে ঘেঁষে বসে প্রশ্ন করে "ঘর কিধর?"—"কলকাতা"। আরও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু বুঝবার সামর্থ হয় না। তাতে মেয়েটি দমবার নয়, ইসারা ইঙ্গিতে কথা চালাবার চেষ্টা করে। আমার পাশে বসে হাত দিয়ে আমার কানের ফুল, হাতের বালা দেখতে দেখতে বলে, "রামরু ছে।" অর্থাৎ "সুন্দর"!

সন্ধ্যে হতে হতেই চারিদিকে নানারকম বাজনার শব্দে উলে'র মুখরিত হয়ে উঠলো। মেয়েরা বাজনার আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি উঠে পালালো। উৎসবে যোগ দিতে গেল তারা। পাহাড়ী গানে ও বাজনায় সারারাত উলেরি উৎসব মুখর হয়ে রইল।

দশেরা উপলক্ষ্যে নেপালের ছেলেমেয়েরা কপালে টিপ পরে। ওরা এই উৎসবকে বলে "টিকা"। আমাদের পক্ষে কুলি সংগ্রহের একটি মস্ত বাধা ছিল এই "টিকা" পরা উৎসব। মেয়েরা এই সময় ছেলেদের কিছুতেই ঘরছাড়া হতে দেয় না। এখানে আজ দেখছি, সমস্ত ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে রঙ্গিন চাল ও আরও কতরকম কি গুড়ো দিয়ে কপাল জোড়া "টিকা" পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নেপালের সর্বত্র মদ খাওয়ার খুব প্রচলন। ঘরে তৈরী দিশি মদ ছাং ওদের খুব প্রিয়। ছোট, বড়, ছেলেমেয়ে সকলেই অল্পবিস্তর ছাং খেতে অভ্যস্ত। ঘোরেপাণিতে দেখেছি, মেয়েরা তাদের কোলের শিশুটিকে পর্যন্ত মদ খাওয়াচ্ছে। বিদেশী ট্যুরিস্ট যাঁরা এপথে আসেন তাঁদের অনেকেই এই নেপালী মদ পছন্দ করেছেন। আমার সঙ্গে যে আমেরিকান ফিজিওলজিষ্টের আলাপ হয়েছিল, তিনি প্রথম দিনই পোখারাতে বলেছিলেন, "মিসেস্ বিশ্বাস, তুমি ছাং খেয়ে দেখেছ, এদের ছাং কিন্তু খেতে খুব ভালো!"

উলেরির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পায়খানার ব্যবস্থা। আগেই বলেছি, নেপালের গ্রামে এসবের কোন বালাই নেই, তাই সাধারণভাবে রাস্তাঘাট অপরিষ্কার থাকে। এখানে এক অভিনব উপায়ে সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে। উলেরির ঘর বাড়ী শেষ হবার অনতিদূরে একটি শুকনো ঝরণার ধারা উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে। তারই উঁচু দুই তীরে যোগ করে একটি লম্বা ও যথেষ্ট চওড়া তক্তা পাতা। এইটিই পায়খানা। তাই অন্যান্য গ্রামের চেয়ে এই গ্রামটি বেশ পরিচ্ছন্ন।

পরদিন প্রত্যুষে উঠেই আবার একবার মচ্ছপুছারে শিখরের প্রভাত সৌন্দর্য দেখে নিই। প্রভাতের সূর্যের লাল আলো পড়েছে শুভ্র তুষার শিখরে। কালচে সবুজ দুটি পাহাড়ের মাঝখানে নীল আকাশের নীচে অনন্তরূপে শোভা পাচ্ছে। চোখ ফেরানো কঠিন।

কালকের কঠিন চড়াই আজ উলেরি ছেড়েও এগিয়েছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে দুই ফার্লং পথ উঠতে তাই বেশ কষ্ট হয়। পরের পথও চড়াই, তবে সে চড়াই খুব ধীরে ধীরে উঠেছে। প্রায় সমস্ত পথটাই ঘন বনের বড় বড় গাছের নীচে দিয়ে। এমন পথে চলতে আনন্দ আছে, দম নিতেও কষ্ট নেই তেমন।

উলেরি থেকে একজন ইণ্ডিয়ান আর্মির লোক আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। সে শিখা যাচ্ছে, ওখানেই ওর বাড়ী। আজ বিকালেই শিখা পৌঁছাবে। তিন বছর পর ছুটি পেয়েছে, তা-ও তার মায়ের মৃত্যুর জন্য। তাই বেচারী বড় মনমরা হয়ে চলেছে। সঙ্গে একটি কুলি তার মস্ত একটি ট্রাঙ্ক বয়ে নিয়ে চলেছে। আমরাও আজ শিখায় থামব।

অল্প দূর এগিয়েই ঘন বনের সুরু। আদিম বন, বিরাট বিরাট গাছে ভরা। কত জাতের গাছ, কত রকম লতা বৃক্ষকাণ্ডগুলি জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে, কোথাও কোথাও ছোট-ছোট ফুল ফুটেছে লতাগুলিতে। কোন কোন ঝোপ পথের পাশে অজস্র ফুলসম্ভার নিয়ে

যেন সাজানো। লাল মাটির পথ। দু' পাশ ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা মধ্যে মধ্যে পাথর ছড়ানো। কোথাও পাহাড়ের গায়ে ঝোপের আড়ালে গুহা, বুঝি কোন বন্য জন্তুর আবাসস্থল। উঁচু উঁচু গাছ থেকে পাতা ঝরে ঝরে পথ ঢেকে গেছে কোথাও কোথাও। ভয় হয়, মনে হয় পাতার ফাঁক দিয়ে জোঁক ধরবে বুঝি, কিন্তু এপথে জোঁক নেই, ঠাণ্ডার জন্যই সম্ভবতঃ। কোথাও ঝিরঝিরে হাওয়ার দোলা লেগে সর্‌সর্‌ করে শব্দ হচ্ছে গাছের পাতায় পাতায়। হাওয়ায় ভেসে আসছে মিষ্ট ফুলের সুবাস। যুঁই, চামেলী কি এখানেও এসে জুটেছে নিস্তব্ধ পথের নীরবতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে দু'টা একটা ঝরণা বয়ে চলেছে কলগুঞ্জন করে! কোন গাছের ডালে ডালে বসছে পাখী, ভাল করে দেখবার আগেই উড়ে পালাচ্ছে।

প্রায় মাঝপথে বেশ বড় একটা ঝরণা পেলাম। অপূর্ব সুন্দর দেখতে। হালকা নীল জলরাশি ঘন গভীর বনের সবুজ গাছপালার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে দুটি পাহাড়ের ফাটল দিয়ে। মস্ত একটা কালরঙের পাথরের তলায় উচ্ছলরূপ তার প্রথম প্রকাশ। পাথরের নীচে জল জমে ছোট্ট জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তার স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জল ছোট ছোট নানারঙের উপলখণ্ড ভরা, যেন অজস্র মণিমুক্তা ঝলমল করছে—মনে হচ্ছে যেন গলানো কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেগুলি। ছোট্ট একটি কাঠের পোল পার হয়ে ওপারে চলার পথ আবার উঁচুতে উঠে গেছে। পোল পার হলেই মস্ত মস্ত কতকগুলি সমতল পাথর। আমরা ঝরণার সুমিষ্ট জল পান করে, বোতল পুরে নিয়ে পাথরের উপর বসে বিশ্রাম করে নিই। উনি এই সুযোগে খানিকক্ষণের জন্য প্রস্তর শয্যা গ্রহণ করেন, মুহূর্তের মধ্যেই নাসিকা গর্জন!

পাহাড়ের পথ চলেছে ওই ঝরণারই একটি ছোট ধারার পাশ দিয়ে। দূরের পাশের পাহাড়ে একটা ঝরণার রূপালী স্রোত উঁচু থেকে পড়ছে ঝরঝর শব্দে। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি, একটি লোক পাহাড়ের

উঁচুতে কি যেন করছে। সেখানে বনভূমির মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গাতে একটা ছোট্ট পাথরের তৈরী ঘর, তার চারপাশ ঘিরে খানিকটা জমিতে চাষ করা। আমরা ভাবি, ঘোরেপানি বুঝি আর দূরে নেই। একদল নেপালী মেয়ে পুরুষ নেমে চলেছে বনের পথে কলরব করতে করতে। ভাষা বুঝি না। তাই প্রশ্ন করেও জানা সম্ভব হলো না যে ঘোরেপানি কতদূর! তা হোক্, দূরত্ব জেনেই বা লাভ কি! কষ্ট যখন নেই, আনন্দের পথ দীর্ঘ হলেও ক্ষতি কি?

কোথাও কোথাও বনভূমি এত গভীর, এত বড় বড় গাছ জন্মেছে, মনে হয় কোন কালেও তার তলায় সূর্যালোক বুঝি প্রবেশাধিকার পায় না। মস্ত মস্ত মূল্যবান দেওদার গাছ যেন পাহাড়ের চূড়াকেও ছাড়িয়ে যেতে চাচ্ছে, কিন্তু এই রাজ্যে কেবা তার মূল্য বোঝে। অতল সাগরের বুকে অজানা মণিমুক্তার মত এও অবহেলায় ছড়ানো, বছর বছর বেড়েই চলেছে। কোথাও বৃষ্টির জলে পথ রেখা টুকু ধুয়ে গেছে, বড় বড় গাছের শিকড় বের হয়ে পড়েছে, তারই খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে চলবার পথ। এখনকার বনে জেঁাক নেই, ঠাণ্ডার জন্য বোধ হয় থাকা সম্ভব নয়, তাই পরম নিশ্চিন্তে চলেছি। পথের ধারে ছোট ছোট বুনো ঝোপে অজস্র হলদে ও লাল বেরী ফল ফলেছে। ডাঃ বিশ্বাস সেগুলি সংগ্রহ করে আমাদের মধ্যে বিলোচ্ছেন। সামান্য টকমিষ্টি তার আস্বাদ, মুখে দিলে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হয়। সমস্ত পথটাই ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠে গেছে। প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমরা দূর থেকে সবুজবনের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গাতে ঘোরেপানির লালটালীর ঘর ক'টি দেখতে পেলাম। ঘর ক'টি যেন ঠিক চূড়ার নিচেই তৈরী।

উলেরি থেকে ঘোরেপানি আরও অন্তত: দু'হাজার ফিট উঁচু, মনে হয় ৯। ৯॥ হাজার হাজার ফিট উঁচু হবে, কেউ সঠিক বলতে পারে না; তাই এখানে শীতও অনেক বেশী। এখানে এখন মোটে দুটি ঘর স্থায়ী বাসিন্দা আছে। শীতের ভয়ে কেউ এখানে থাকতে চায়

না। এই দুটি ঘরের লোকেরা সারাবছর এখানেই থাকে। তারা বলল, আর কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে বরফ পড়া সুরু হবে। ছয় সাত ফিট উঁচু হয়ে বরফ পড়বে। এখনো খুব শীত। আমরা যখন ঘোরেপানি পৌঁছলাম, চারিদিকের শস্য ক্ষেত ও সবুজ বনভূমি রৌদ্রালোকে ঝল্‌মল্ করছে, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কনকনে হাওয়া। চড়াই ওঠার ক্লান্তিতে আমাদের জামাকাপড় ঘামে ভিজে গেছে, এখন থেকে থেকে শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি। ঘর দুটির একটি ঘরে আশ্রয় পেয়ে উনুনের ধারে বসে খানিকটা গরম হওয়া গেল।

এই দুটি বাড়ী ছাড়া বাকী কয়েকটা ঘর খালি পড়ে আছে। সেগুলি যাত্রীনিবাস, এখন নোংরা জমে আছে। উপত্যকার একপাশ দিয়ে একটি নীল স্বচ্ছতোয়া ঝরণা বয়ে চলেছে। ঘোরেপানির অবস্থিতিটি বড় সুন্দর, যেন পটে আঁকা রঙ্গিন ছবি, তেমনি যেন বাছাই করা কয়েকটি ডগমগে রঙ দিয়ে আঁকা। কিন্তু রৌদ্রাভাবে, ঠাণ্ডা হাওয়াতে, শীতে, আমরা কাতর হয়ে পড়েছি। তাই শীঘ্র শীঘ্র রান্না খাওয়ার পাট চুকিয়ে শিখার দিকে রওনা হবার জন্য ব্যস্ত সবাই। আমার স্বামী আজ এখানে সামান্য অসুস্থ বোধ করছেন, বলছেন প্রত্যহ চা খাওয়ার জন্যই তাঁর এই দুর্ভোগ। এবার যাত্রার সুরু থেকে রোজ চা খেতে হয়েছে, এতে তিনি অনভ্যস্ত। তিনি নেপালী গৃহিনীর দেওয়া লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। বন্ধু ও দাদা স্নানের চেষ্টায় আছেন। রোদ না উঠলে, আমি ওদের দলে নেই। তার চেয়ে উনুনের ধারে বসে থাকা অনেক আরামপ্রদ। ডাঃ বিশ্বাস ভাত খেতে পারবেন না বলছেন, ওঁর জন্য একটু স্যুপ তৈরী করবার চেষ্টায় আছি।

ঘরের গৃহিনী বেশ মোটা সোটা হাসি খুশী, গলায় একগাছা পুঁতির মালা পরা, হাতে কাঁচের চুড়ি ভরা। তাঁর চার পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। সকলেই ত'দের মাকে সাহায্য করছে। কেউ

বাসন মেজে দিচ্ছে, কেউ মুর্গী তাড়াচ্ছে, কেউ ফাই ফরমাস খাটছে। ছোট্ট বাচ্চাটি বছর খানেকের হবে, মায়ের কোল জুড়ে বসে আছে। অনেকগুলি মস্ত মস্ত মুর্গী চারিদিকে খুঁটে খুঁটে শস্যদানা খাচ্ছে। ঘরে বাইরে সর্বত্র তাদের অবাধ গতি। ডাঃ বিশ্বাসের শোয়া দেহের উপর দিয়ে নির্বিচারে চলাফেরা করছে। উনি লেপের তলা থেকে বলেন, মুর্গীগুলি কিন্তু খুব ভারী।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা রান্না, খাওয়া, বিশ্রাম সেরে ঘোরে-পানি ছেড়ে শিখার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়ি। এখনকার পথ আগের মতই গভীর বনের মধ্য দিয়ে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা। এখন আবার দুদিকের বন ঘন হয়ে এগিয়ে এসে যেন পথের লাল রেখা-টাকেও নিঃশেষে মুছে দিয়েছে। মাথার উপর বড় বড় গাছের ডাল-পালায় আকাশ সম্পূর্ণরূপে ঢেকে গেছে। চারপাশে কালো কালো গাছের গুঁড়ি, তাঁদের গায়ে উঁচু থেকে নীচ অবধি নানা জাতের ফার্ণ ও পরগাছা। কোথাও বড় গাছের নীচে চারাগাছের ঝোপ। অপূর্ব গম্ভীর, শান্ত বনভূমি। পথটা সবুজ গাছে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া অবধি উঠে আবার ক্রমে নীচের দিকে নেমে চলেছে। দু'দিন ধরে কেবলই উঠেছি, এখন থেকে কেবলই নামা সুরু। নামছি তো নামছিই। বনেরও যেমন শেষ নেই, নামারও শেষ নেই যেন। দু'ধারে পাইন, ফার, দেওদার ছাড়াও অন্যান্য উঁচু উঁচু গাছের সমারোহ। তাদের গায়ের ফুলভরা লতাগুলি ঝুলে ঝুলে নেমেছে কোথাও। লালরঙা মেটে পায়ে চলা পথের পাশে গাঢ় সবুজ পাতা ঢাকা পার্বত্য বনভূমির গাম্ভীর্য আমাদের মনে প্রশান্ত ভাব জাগিয়ে তোলে। মনটা উদাস হয়ে যায়। কোথায় যেন বনের কোন গাছের ডালে একটা নাম-না-জানা পাখী ডেকেই চলেছে। ক্ষণে ক্ষণে নির্জনতা একটু অস্বস্তির সঞ্চার করে। খস্‌খস্ শব্দে চম্‌কে উঠে পাশের জঙ্গলের দিকে তাকিয়েছি, কি একটা মস্ত জানোয়ার যেন! সঙ্গের নেপালী কুলিটি বললে—"গাঁওয়া কি

ভঁইসা।" আশ্বস্ত হয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ি। যদিও জানতাম, পায়ে চলা পথের আশেপাশে সাধারণতঃ বন্য জন্তুরা চলাফেরা করে না।

উৎরাই পথের প্রায় শেষ হয়ে এলো, বনেরও প্রায় শেষ। চোখের সামনে এগিয়ে এলো নতুন নতুন দৃশ্য। যেন পট পরিবর্তন হ'ল। এতক্ষণে প্রায় নয় হাজার ফুট উঁচু ঘোরেপানির পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছি, এখন অন্নপূর্ণা শৈলমালার অন্য অংশের দিকে এগিয়ে চলেছি। পোখারা থেকে আমরা এই শৈলমালার শিখরাবলী দেখেছি পূর্ব দিক থেকে। এখন এই শৈলমালাকেই ডাইনে রেখে আমরা পশ্চিম হয়ে ঘুরে পরে উত্তরের দিকে এগিয়ে যাব। উত্তরে আবার কাগবেনীর পর এই শৈলমালাকে ঘুরে কিছুটা দক্ষিণে এলে পাবো মুক্তিনাথকে।

ঘনবন হালকা হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যেন প্রকৃতির বন্য পর্দাখানি সরিয়ে দিচ্ছে কেউ। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘারে-খোলা নদী, ডান দিকের দুটি গিরিমালার মধ্যবর্তী উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে। তার দুই তীরের পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেকগুলি গ্রাম, এদিক ওদিক ছড়ানো, যেন ছবিতে আঁকা। লাল বাড়ীগুলি যেন পুতুলের ঘর, এখান থেকে তেমনি ছোট ছোট দেখাচ্ছে। ওদিকে আকাশের উঁচুতে ধওলাগিরির শিখরের একটুখানি ঝিক্‌মিক্ করছে দেখা গেল, তারই ঠিক নীচে বাঁ দিকের পাহাড়ের গায়ে শিখা গ্রাম দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। শিখরের জন্যই এই গ্রামের নাম শিখা।

ঘোরেপানির পাহাড়ের উৎরাই শেষে চিত্রে গ্রামের সুরু। এখানে পথ বাঁ দিকে বেঁকে গেছে। বাঁকের মুখে পথের পাশে একখণ্ড জমিতে মস্ত মস্ত উঁচু উঁচু বাঁশ পুঁতে তেপায়ার মত করে দোলনা টাঙানো হয়েছে। গ্রামের অগুন্‌তি ছোট ও মাঝারি বয়সের ছেলে-মেয়ে দোল খাচ্ছে। পোখারা থেকে যতগুলি গ্রামে এমনি দোলনা দেখে এসেছি, তার মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়। বোধহয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দরিদ্র গ্রামবাসীদের উদ্যোগে আনন্দের এই ছোট্ট আয়োজন টুকু তারা করেছে ছেলেমেয়েদের জন্য। চিত্রের শেষদিকের পথের

অনেকটা সমতল, খাড়া পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কাটা পথ। চিত্রে শেষ হতেই ফালাটে গ্রামের সুরু। বন্ধু তার চিরন্তন প্রথানুযায়ী পথের ধারে বসে বসে চা খাচ্ছে। আমরা এসে পৌঁছতেই "দিদি" "দিদি" বলে ডাকাডাকি সুরু করল। ওর ডাক শুনে পাশের পাথরের ঘর থেকে একটি যুবতী বের হয়ে এলো ধূমায়মান চায়ের কাপ হাতে। আমি আর দাদা চা খেতে বসে গেলাম। উনি একগ্লাস দুধ চেয়ে নিলেন, না পেলে দই বা ঘোলও চলবে।

একদল মুক্তিনাথ ফেরৎ যাত্রী আসছে। পূজার সময় মুক্তিনাথে মস্ত মেলা বসেছিল, অসংখ্য ভারতীয় ও নেপালী তীর্থযাত্রী সেখানে গিয়েছিল। আমরা অনেক দেরী করে যাচ্ছি, হয়তো এখন কোন লোকই সেখানে থাকবে না। তা হোক্, বেশী লোকের ভীড় আমরা পছন্দও করি না, এ একরকম ভালই হলো।

এদের সঙ্গে সঙ্গেই একজন বয়স্কা আমেরিকান মহিলাকে আসতে দেখলাম। সঙ্গে চারজন মালবাহী কুলি। চলেছেন একাই। চড়াই উঠে খুব হাঁপিয়ে পড়েছেন। গরমে, রোদে তাঁর মুখটি লাল টুকটুক করছে, টস্‌টস করে ঘাম ঝরছে। বললেন, তাতপানি থেকে আসছেন এখন, আজ ঘোরেপানি যাবেন।

ফালাটে গ্রামের পরেই শিখা। মাঝখানে পাহাড়ের ঢেউ বেঁকে গিয়ে অনেকটা পথ চোখের আড়ালে চলে গেছে। বাঁকের ওপারে শিখাতে সর্বাগ্রে চোখে পড়ছে একটি শুভ্র বৌদ্ধ মন্দির। তারপর একটু এগোলেই ইস্কুলবাড়ি। কথা হয়েছে, আজ এখানেই থাকব।

বন্ধুর পিছু পিছু আমি অনেকদূর এগিয়ে এসেছি। পথে একজন গ্রামবাসীর বাগান থেকে কিছু শব্জী সংগ্রহ করে নিলাম। ডাঃ বিশ্বাস বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন। ওঁর হাতে দুটি ক্যামেরা। আজ নির্মেঘ নীলাকাশ পেয়ে ছবি তোলার মরশুম পড়েছে, তাই আসতেও দেরী হচ্ছে। দাদা তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছেন।

শিখাতে ইস্কুলবাড়ীর একটা দোতলা বাড়ী, তার একতলাতে

একটা দোকানঘর। দোকানী একটি যুবতী, তার স্বামী ইণ্ডিয়ান আর্মিতে সুবাদার। বন্ধু তার স্বভাব মত "দিদি" ডেকে তার সঙ্গে ভাব করে সেখানেই থাকবার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। মেয়েটি হিন্দি বোঝে। তাই মস্ত সুবিধা। চা পাওয়া গেল। আমি আর বন্ধু দোকানেরই একধারে ওদের অপেক্ষায় বসে আছি। এখন বেলা সাড়ে চারটা।

ভীমবাহাদুর এসে পৌঁছেই মাল নামিয়ে ইস্কুল বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে এসে আমাদের উঠবার জন্য তাড়া দেয়। এই ইস্কুলঘর বা দোকান, কোনটাই তার পছন্দ নয়। কাজে কাজেই অত্যন্ত অনিচ্ছায়ও আবার উঠে পড়তে হলো। আর অল্প একটু এগিয়ে কাঠ ও পাথরের তৈরী একখানা দোতলায় দুখানি ঘর, তারই বড় ঘরখানি আমাদের থাকবার জন্য পাওয়া গেল। একতলাতে গৃহস্বামীর শস্য বোঝাই শস্যাগার। পরিচ্ছন্ন ছিমছাম ঘরটি পেয়ে আমরা খুশী। জিনিষপত্র নিয়ে এসে গোছগাছ করে বসি। কিন্তু ঘরের জানালা খুলেই আমরা অবাক! তুষার মৌলী ধৌলাগিরি শিখরের অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। পড়ন্ত সূর্য্যের লাল আলোতে অপূর্ব দেখাচ্ছে শিখরটিকে। পথের ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়, আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি।

পাঁচ

ক'দিন ধরেই দেখছি, নেপালে চাল, শব্জী, যথেষ্ট পাওয়া যায়। আটা খুব কম, ডালও তাই। পোখারা বাজারে অড়হর আর কলাই ছাড়া অন্য কোন ডাল পাইনি। পথেও কলাই ছাড়া আর কোন ডাল পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এ সময়ে প্রচুর শব্জী মেলে। দুধ, ঘি, দই পওয়া যায়, তবে সাধারণতঃ এসব বিক্রি করতে চায় না। চা সর্বত্র সর্বদাই পাওয়া যায়। ভুট্টা, শিমের বীচি, কাঁকুর, আলু, পেয়াজ বীণ, কপি, কুমড়ো, টমাটো, কাঁচালঙ্কা প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। অবশ্য বছরের এই সময় বলেই এত রকম শব্জী মেলে। মুর্গি ও মুর্গির ডিম সর্বত্র, সবসময় পাওয়া যায়। আমরা নিরামিষ খেতাম বলে আমাদের প্রয়োজনে এলো না। ভুট্টার আটা পাওয়া যায়। আমাদের সাহস হলো না পরীক্ষা করে দেখতে। তবে ভুট্টার খই ও ভুট্টাভাজা প্রায় রোজই খেয়েছি। পথের কোথাও দোকান বিশেষ দেখিনি তাই বাজার করার হাঙ্গাম নেই। ঘরে ঘরে চাইলে বা যেখানে আশ্রয় নেওয়া হলো, সেখানে চাইলে এইসব সংগ্রহ করা যায়। ভাল খাঁটি ঘি সর্বদাই মেলে। ভেজাল হবার সম্ভাবনা নেই। কেননা পোখারার ট্যুরিষ্ট অফিসার মিঃ মানসিং বলেছিলেন, এ রাজ্যে দালদার প্রবেশাধিকার নেই। খাঁটি সর্ষের তেলও সর্বত্র পাওয়া যায়।

শিখার ঘরখানি বেশ আরামদায়ক। ঘরের একপাশে একটা

চৌকী আছে। ডাঃ বিশ্বাস তার উপর গালিচা ঢাকা শয্যায় আগেই শুয়ে পড়েছিলেন, এখন ধৌলাগিরির ওই রূপ দেখে আর থাকতে না পেরে ছবি তুলছেন। আমি জানালা ধরে চুপ করে বসে সেই অসীম উপভোগ করছি। দাদা সর্বঘটে আছেন। আমাদের দুজনার সাথে সমান উৎসাহে যোগ দিচ্ছেন, ওঁকে ছবি-তোলা বাতলাচ্ছেন, বন্ধুকে দুষ্টু বুদ্ধি দিচ্ছেন, কি করে ছোট মামাকে ঠকিয়ে চা ও কফি দুটোই আদায় করা যায়। সঙ্গে আলুপোড়া পাওয়া যাবে, না, ভুট্টাভাজা আর চকোলেট, সেই তার বর্তমান সমস্যা। বন্ধুর অবশ্য সবগুলি একত্রে হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু দাদার সম্মুখে মস্ত সমস্যা, ওই চকোলেট, শুকনো মটরশুঁটি, বিস্কুটগুলি কি শেষ পর্যন্ত আবার বয়ে বয়ে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? তাই নিয়ে আমার পেছনে লেগেছেন।

ধৌলাগিরি দেখতে দেখতে গরম গরম কফির গ্লাস হাতে গল্প জমে ওঠে। দাদা বলেন ঃ

"এইসব শিখরগুলির আরোহনের কাহিনী পড়েছ তো?"

তখনি মনে পড়ল বিশ্ব বিখ্যাত পর্বতারোহীদের দুর্গম পথে এই সব অঞ্চলে আসা ও অন্নপূর্ণা হিমল এবং ধৌলাগিরির শিখরাবলী আরোহনের কাহিনী।

বহুকাল পর্যন্ত নেপালে বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। একটি সুইস্ অভিযাত্রীদল অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেও ধৌলাগিরির প্রাথমিক পরীক্ষা করবার অনুমতি পাননি, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল গবর্নমেন্ট হঠাৎ তাদের নেপালের উত্তরপূর্বদিকে যাবার অনুমতি দিলেন।

এই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রখ্যাত পর্বতারোহী Tilman ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে চলে এলেন। এবার তিনি নেপাল-হিমালয়ের গণ্ডকী অঞ্চল পরিদর্শন করবার অনুমতি পেলেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন যে, যে অঞ্চলের পশ্চিমদিকে লামজুর হিমল (২২,৯১০ ফুট) ও

অন্নপূর্ণা হিমল, এবং পূর্বদিকে হিমলচুলী (২৫,৮০১ ফুট) ও মানাসলুর (২৬,৬৫৮ ফুট) সুউচ্চ শিখরাবলী দণ্ডায়মান, আর দুয়ের মাঝখান দিয়ে মার্সিয়ান্দী নদী বৃহৎ হিমালয়কে ছেদ করে নীচে নেমেছে, সেই অঞ্চল পরিদর্শন করবেন। এই অভিজানে তাঁর সঙ্গে রইলেন পাঁচজন পর্বতারোহী—J.O.M Roberts, D.G. Lowndes, R.C. Evans; S.H. Emlyn Jones ও W.P. Packard

অভিযাত্রীদল মার্সিয়ান্দী পৌঁছে থোনজেতে ক্যাম্প স্থাপন করলেন। এই স্থানটি বৃহৎ হিমালয়ের উত্তরে। এখানে দুধখোলা নদী মানাসলু শিখরের বিশাল জলভার বয়ে নিয়ে এসে মার্সিয়ান্দীতে মিশেছে। মার্সিয়ান্দী নদীর উপত্যকা ধরে এগিয়ে গিয়ে উঁচুতে উঠলেন এবং মানাংভোট গ্রামে পৌঁছলেন। এখান থেকে তাঁরা অন্নপূর্ণা গিরিমালার উত্তরাংশের প্রাথমিক পরীক্ষাকার্য চালিয়ে অন্নপূর্ণার ৪নং শিখরটি (২৪,৬৮৮ ফুট) আরোহণ করার জন্য বেছে নেন। তাদের সঙ্গে চারজন শেরপা ছিলেন, তার মধ্যে স্বনামখ্যাত গিয়ালজেন্ মিক্‌চেন্ (২) এবং দা নামগিয়ালও (১) ছিলেন।

৭ই জুন মানাংভোট (১১,৫০০ ফুট) ছেড়ে ১৮,০০০ ফুট উঁচুতে ১নং ক্যাম্প স্থাপিত হল। ২নং ক্যাম্প স্থাপিত হলো আরও উঁচুতে ১৩ই জুন, ৩নং ক্যাম্প ২১,০০০ ফুটে প্রধান গিরিশিরার উপর এবং ১৫ই জুন ৪নং ক্যাম্প ২২,৫০০ ফুট উঁচুতে স্থাপিত হলো। আবহাওয়া এ পর্যন্ত ভালই ছিল।

১৭ই জুন Packard ও Evans শিখর আরোহণের মানসে পর্বতারোহণ করতে সুরু করলেন। আড়াই ঘণ্টা চলে ২৪,০০০ ফুট উঁচুতে শিখরের ঠিক নীচে পৌঁছে দুর্যোগের সূচনা দেখে তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। পরদিন দ্বিতীয় দল পর্বতারোহণ সুরু করল। কিন্তু Roberts ও গিয়ালজেনের পা ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে যাওয়ায় তাঁরাও ফিরে এলেন। ১৯শে জুন তৃতীয়দল যাত্রা করল, তাঁরা শিখরের শেষাংশে চড়তে সুরুও করেছিলেন, কিন্তু নিদারুণ শ্রান্ত

অবস্থায় আর এগোতে অসমর্থ হয়ে মাত্র ৬০০ ফুট নীচে থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন।

শিখরে আরোহণ করতে অসমর্থ হলেও নীচে নামবার সময় ঐ অঞ্চলে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে তাঁরা কয়েকটি কৌতুহলোদ্দীপক আবিষ্কার করেন। মার্সিয়ান্দী নদীর উত্তরে তিব্বত সীমান্তের দিকে তাঁরা দুটি নতুন গিরিসঙ্কট আবিষ্কার করেন, এবং সেইপথে কালী-গণ্ডকী নদীর অববাহিকাতে পৌঁছান। ফিরবার সময় তাঁরা মুক্তিনাথ তীর্থের পথ ধরে ফেরেন। এই অঞ্চলে পর্বতারোহনের চেষ্টা ওই বছরই প্রথম।

সেই বছরই ঐ একই অঞ্চলে আরেকটি রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটল। ফরাসী আলপাইন ক্লাবের হিমালয়ান কমিটিরও মধ্য নেপালের এই সব অঞ্চলে যাবার অনুমতি পাবার সৌভাগ্য হলো। ফরাসীরা কালীগণ্ডকী নদীর উভয়তীরে অবস্থিত পর্বতমালা দুটি বেছে নিলেন। Tilman যে অঞ্চলের সমীক্ষা করেন, ঠিক তারই পশ্চিমে এই অঞ্চলটি অবস্থিত। এঁদের কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল, "ফ্রান্সের সম্মান রক্ষার জন্য—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।" এখানে দুটো পর্বতশৃঙ্গ ধৌলাগিরি (১) [২৬,৭৯৫ ফুট] ও অন্নপূর্ণা (১) [২৬,৪৯২ ফুট] এঁরা পছন্দ করলেন। যে কোন একটিতে আরোহণই এঁদের লক্ষ্য হলো। দুটো শৃঙ্গের উচ্চতাই ৮০০০ মিটার বা ২৫,০০০ ফুটের চেয়ে বেশী। এ পর্যন্ত কেউ এত উঁচু শিখরে আরোহণ করেনি।

Maurice Herzog-এর নেতৃত্বে নয় জন সভ্যের একটি শক্তিশালী দল এই অসম সাহসিক পথে পা বাড়ালেন। দলে ছিলেন Jean Couzy, Marcal Schatz, Louis Lachenal, Lionel Terray ও Gaston Rebuffat ; এঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন পেশাদার পর্বতারোহন শিক্ষক। ক্যামেরাম্যান ও রিপোর্টার হয়ে গিয়েছিলেন Marcel Ichac, ডাক্তার ছিলেন Jaques Oudet এবং Francis de Noyelle ছিলেন সংযোগ রক্ষাকারী ও দোভাষী। দার্জিলিং

থেকে আটজন শেরপাকেও আনানো হলো।

ভারতবর্ষে তাঁরা উড়ে এলেন, এবং নওতনওয়াতে নেপালের তরাই অঞ্চলে প্রবেশ করে বুটোয়াল পৌঁছে সেখান থেকে কালী গণ্ডকী নদীর গতিপথ ধরে এগিয়ে ২১শে এপ্রিল তুকুচে পৌঁছলেন। এখানে এই নদীটি বৃহৎ হিমালয়কে ছেদ করে এসেছে। এদিকের পথের অনেকটাই মুক্তিনাথ তীর্থের পথে চলা। এই পথটি নেপাল-তিব্বত বাণিজ্যের একটি প্রধান পথও ছিল।

দুটি পর্বতমালা ভালভাবে সমীক্ষা করার জন্য তাঁরা তিন সপ্তাহ সময় দেবেন স্থির করেছিলেন। ধৌলাগিরির সম্পূর্ণ অজানা দুর্গম পথে অমানুষিক পরিশ্রম করে অসম সাহসিকেরা ২রা মে যখন ৫২০০ মিটার উঁচু গিরি সঙ্কট অতিক্রম করলেন তখন খুবই হতাশ হলেন। দেখলেন, ধৌলাগিরি তার উত্তুঙ্গ শিখর নিয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান। এত দিন এত কষ্ট করে তাঁরা কেবল সেই শিখরের পাদদেশে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। এমন দুর্দান্ত পর্বতারোহীও সেই শিখরের দিকে তাকিয়ে কেবল মাত্র একটি কথা উচ্চারণ করতে পারলেন, সে কথাটি হ'ল—"অসম্ভব!"

তিন সপ্তাহের অর্দ্ধেক এই ভাবেই কাটল।

পরের ঘটনা আরও রোমাঞ্চকর। অভিযাত্রীদল হতাশ হয়ে নীচে নেমে তুকুচেতে এলেন এবং অন্নপূর্ণার দিকে নজর দিলেন। ৭ই থেকে ১৪ই অবধি Herzog, Ichac, ও Rebuffat টিনিগাঁও এর নিকট কালীগণ্ডকীর যে শাখা উপত্যকা আছে সেটি পরীক্ষা করলেন এবং একটি গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে মার্সিয়ান্দী এলাকার মানাংভোটে গেলেন। কিন্তু সেখানে তাঁরা দেখলেন যে, তাঁরা অন্নপূর্ণা (১) শিখর থেকে একটি পর্বতমালার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এপ্রিল মাসে যে পথ তাঁরা খুঁজে বের করেছিলেন, সেই মিরিস্তিখোলা নদী ধরেই তাঁদের যাবার পথ খুঁজে নিতে হবে। এই মিরিস্তিখোলা নদী কালীগণ্ডকীর একটি বড় উপনদী, দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল

দিয়ে বয়ে এসে এটি তুকুচে থেকে প্রায় ২০ মাইল নীচে ভাতপাণিতে কালীগণ্ডকী নদীতে মিশেছে।

অনেকটা সময় এভাবেই কেটে গেল, এখন তাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া স্থুরু করা। পর্বতারোহণ করবার সবচেয়ে ভাল সময় হল ১৫ই মে থেকে ১৫ই জুন, কিন্তু বর্ষা আগে এসে পড়লেই বিপদের সম্ভাবনা, তাই তাড়াতাড়ি সব কাজ করতে হবে।

১৮ই মে উত্তর অন্নপূর্ণা হিমবাহের শেষ প্রান্তে বেস্‌ক্যাম্প স্থাপিত হলো। পরের চারদিন অনিশ্চিত অবস্থায় কাটল। অন্নপূর্ণা গিরিমালার উত্তর পশ্চিম শাখার উপর দিয়ে গিয়ে শিখর আরোহণের চেষ্টা করা হলো প্রথমে। কিন্তু ছুটি দিন কাটবার পর বোঝা গেল, এই পথটি অতিশয় দীর্ঘ ও কষ্টকর। তখন বেস্‌ক্যাম্প আরও উঁচুতে তুলে নিয়ে এসে উত্তর অন্নপূর্ণা হিমবাহের উত্তরভাগে একটি হিম প্রপাতের নীচে স্থাপন করা হলো। এই ক্যাম্পের উপরে একটি সম্ভাব্য পথ দেখা গেল, সেটি হিমবাহের উপরাংশে তুষারের সিঁড়ির মতন হয়ে আরও উঁচুতে পর্বতের উত্তরপাশের ভগ্ন অংশে যুক্ত হয়েছে। তুষারের সিঁড়ির উপর দিকে মনে হয় একটা পথ পাওয়া যেতে পারে, সে পথ ধরে গেলে শিখরের উত্তর দিকে একটা তুষারের দেয়ালে পৌঁছায়, এই দেয়ালটিই কাস্তের আকারের চূড়ার প্রান্তদেশে অবস্থিত। এখানটা পার হতে বিশেষ কঠিন কলাকৌশলের প্রয়োজন হবে না বলে মনে হলো। তবে আসল সংশয় রয়ে গেল ১৯,৫০০ ফুট থেকে ২৩,০০০ যু অবধি অংশটুকু। এটুকু কেবলই বরফ ও তুষারের খাড়া চড়াই; স্থানে স্থানে হিমানী সম্প্রপাতের আশকা আছে মনে হয়, "কাস্তে"র সংযোগস্থলেও ঐ একই বিপদের সম্ভাবনা।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ১নং ক্যাম্প (১৬,৭৫০ ফুট) ও ২নং ক্যাম্প (১৯,৩৫০ ফুট) স্থাপন করা হলো। ৩নং ক্যাম্প (২১,৬৫০ ফুট) একটি তুষার ফাটলের মধ্যে স্থাপিত হলো। ৪নং ক্যাম্প (২৩,৫০ ফুট) স্থাপন করতে Herzog ও ছুটি শেরপা, দাওয়া থণ্ডুপ ও আং

দাওয়া মাল বয়ে নিয়ে গেলেন। ৩১শে মের মধ্যে সব ক্যাম্পগুলি স্থাপন করা হয়ে গেল। Terray, Rebuffat এবং আং শেরিং ও আইলা প্রচণ্ড খেটে ৪নং ক্যাম্প পৌঁছানোর পথ ভালভাবে তৈরী করে ৪নং এ অস্বস্তির সঙ্গে রাত কাটিয়ে ৩১শেই ২নং ক্যাম্পে নেমে এলেন। পথে Herzog এর সঙ্গে দেখা হলো, তিনি ৩নং ক্যাম্পে উঠছিলেন, সঙ্গে ছিলেন Lachenal, আং থারকে ও সার্‌কি। এত দিন ধরে আবহাওয়া ভালই চলছিল, কিন্তু সমস্ত ফরাসীরাই উচ্চতার জন্য খুব অসুস্থ বোধ করছিলেন, তাই তাঁরা ২নং ক্যাম্পে নেমে যেতে বাধ্য হলেন।

এদিকে এই সময় খবর পাওয়া গেল, কলকাতায় বর্ষা নেমে গেছে, সুতরাং এখন আর তিন চার দিন মোটে হাতে আছে, তারপর এখানেও বর্ষা নামবে। বর্ষার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শুরু হ'ল। Herzog শিখর আরোহণ করবার প্রারব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এবং সে কাজ এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই করতে হবে।

১লা জুন ৩নং ক্যাম্পে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে রাত কাটিয়ে Herzog, Lachenal, আংথারকে ও সার্‌কি তাড়াতাড়ি ৪নং ক্যাম্পে গেলেন এবং সেখানকার একটা তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে "কাস্তের" ধার পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে সেখানে ৪ (ক) ক্যাম্প স্থাপন করেন। Herzog ও Lachenal রাত্রে সেখানেই রইলেন, বাকীরা ৪নং ক্যাম্পে ফিরে এলেন। এদিকে ২নং, ৩নং ক্যাম্পের সকলে এদের সাহায্য করবার জন্য তৈরী হচ্ছেন।

পরদিন আংথার্‌কে ও সার্‌কি ৪নং ক্যাম্পের তাঁবু খুলে নিয়ে ৪(ক) ক্যাম্পের জায়গা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এলেন এবং Herzog ও Lachenal-এর সঙ্গে পাশাপাশি এগিয়ে কাস্তের উপর ২৪,৬০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত উঠলেন। সেখানে Herzog ও Lachenal-এর জন্য একটা তাঁবু [ক্যাম্প ৫] স্থাপন করে শের্‌পা দুজন নীচে নেমে গেলেন। এদিকে দলের অন্যান্য সকলে এঁদের সাহায্য করবার জন্য উপরে উঠে

এসেছেন। সে রাতে ঝড় হচ্ছিল, কিন্তু ৩রা সকালটি সুন্দর আলোকোজ্জ্বল হলেও প্রচণ্ড শীত। তার মধ্যেই তাঁরা ৬টার সময় রওনা হলেন এবং ২টার সময় শিখরে পদার্পণ করলেন।

এ পর্যন্ত সব ভালই চলছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। ফিরবার পথে দুজনে কি করে যেন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেন। Herzog তাঁর হাতের দস্তানা হারিয়ে ফেলে অনেক কষ্টে ৫নং ক্যাম্পে পৌঁছলেন, ততক্ষণে তাঁর হাতের আঙুলগুলি তুষারক্ষতে প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয়ে গেছে। এদিকে ঝড় উঠেছে, তার মধ্যে Lachenal তাঁবুর পথ হারিয়ে ফেলে তাঁবু ছাড়িয়ে ঝড়ের মধ্যে নীচে নামছেন। Tarrey ও Rebuffet সৌভাগ্যক্রমে এঁদের সাহায্য করবার জন্য ৪নং ক্যাম্প থেকে উঠে আসছিলেন, পথে Lachenal-কে দেখতে পেয়ে তারা তাঁকে ৫নং ক্যাম্পে নিয়ে এলেন।

নীচে নামাটা আরও কঠিন ও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল। সমানে তুষারপাত হচ্ছে, ফলে পথ তুষারে ঢেকে গেছে, চোখে কিছুই দেখাও যাচ্ছে না। তুষারক্ষতে আক্রান্ত অবস্থায় তাঁদের চলার গতি খুব মন্থর হয়ে গেল, এদিকে তাঁরা পথও হারিয়ে ফেললেন। রাত্রি নেমে এলো। Lachenal একটা তুষার ফাটলের ভিতর দিয়ে পড়ে গেলেন, বাকী কজনা নীচে নেমে তাঁর কাছে পৌঁছে রাতটা সেখানেই কাটালেন। তাঁদের সঙ্গে মাত্র একটা স্লিপিং ব্যাগ ছিল, তার ভিতর Terray ও Lachenal একত্র রইলেন—গরম হবার আশায় সকলে জটলা পাকিয়ে রইলেন। এর উপর সকালবেলা একটা হিমানী সম্প্রপাত থেকে তুষার এসে ফাটলের মধ্যে তাঁদের আধাআধি ঢেকে দিয়েছে। Rebuffet ও Terray তুষারের আলোতে অন্ধ হয়ে গেছেন, Lachenal ও Herzog এত বেশী করে তুষারক্ষতে আক্রান্ত হয়েছেন যে তাঁরা তাঁদের বুটজুতা পরতেই পারছেন না!

এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় Schatz তাদের আবিষ্কার করলেন, তিনি তাদের প্রথমে ৪(ক) ক্যাম্পে নিয়ে গেলেন। পরে বহু কষ্ট করে সকলে

৪নং ক্যাম্পে পৌঁছলেন। সেখান থেকে শেরপাদের সহায়তায় তাঁরা নীচে নেমে এলেন। নামবার সময় একজায়গায় Herzog, আইলা ও প্যান্‌সী হিমানীসম্প্রপাতের ধাক্কায় পাঁচশো ফুট নীচে গড়িয়ে পড়েছিলেন, কেবল দৈবসহায় ছিল, তাই ফু থার্‌কে ও আংদাওয়ার সাহায্যে সেযাত্রা বেঁচে গেলেন।

পঁচিশ হাজার ফুটের চেয়ে বেশী উঁচু শিখর আরোহণ জগতের ইতিহাসে এই প্রথম, কিন্তু এইজন্য এদের মূল্যও যথেষ্ট দিতে হলো। পরে চিকিৎসাকালে তাঁদের হাতের ও পায়ের আঙুল কেটে ফেলতে হয়েছিল।

তিন বছর পরের কথা। B. R. Gofellow ছিলেন আলপাইন ক্লাবের সেক্রেটারী। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সহযোগী F. Yatesকে সঙ্গে নিয়ে অন্নপূর্ণা হিমলের বিশদভাবে প্রাথমিক পরীক্ষাকার্য চালান।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি জার্মান দল আসেন Herr H. Steinmets এর নেতৃত্বে অন্নপূর্ণা (৪) (২৪,৬৮৮ ফুট) শিখর আরোহণ করতে। তাঁদের মধ্যে H. Biller ও J. Wellenkemp শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হন। এতদিন পর্যন্ত এটি অজেয় ছিল।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে Col. J. O. M. Roberts এর নেতৃত্বে একদল বৃটিশ পর্বতারোহী সৌন্দর্যময় মচ্ছপুছারে (২২,৯৫৮ ফুট) শিখরটি আরোহণ করতে আসেন। ঐ শিখরটি নেপালী গুরুংজাতের লোকদের নিকট পবিত্র বলে গণ্য, তাই তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়াতে তাঁরা শৃঙ্গে পদার্পণ করতে পারেন নি, পঞ্চাশ গজ নীচে থেকে নেমে আসতে বাধ্য হন। এই সৌন্দর্যময় শিখরটি আমরা পোখারা থেকে দেখেছিলাম।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই মে মধ্য নেপালের ২৬,০৪১ ফুট উঁচু অন্নপূর্ণা (২) শিখর আরোহণ করেন Col J. O. M. Roberts এর নেতৃত্বে R. G. Grant, C. G. Bonnington ও আং নিমা।

দলটি ছিল সর্বভারতীয়-নেপালী-বৃটিশ দল। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে ক্যাঃ এম্ এ সোরেস্ (ডাঃ) ও ক্যাঃ জগ্‌জিৎ সিং যোগদান করেন। দার্জিলিং এ পর্বতারোহন শিক্ষাশিবিরে থাকা কালে এই ডাঃ সোরেসের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছিল। ইনি ডাক্তার হিসাবে আমাদের সঙ্গে সিকিমের চৌরীকিয়াং গিয়েছিলেন। হিমালয় প্রেমিক ইনি, এঁর কাছ থেকে হিমালয়ের নানারকম ফুল, গাছ, পাখী চিনবার সুযোগ পেয়েছিলাম। শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি হিমালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। এঁর সাহচর্যে দিনগুলি বড় সুন্দর কেটেছিল।

ভারতীয়রাও কিন্তু চুপ করে বসে ছিলেন না। তা জানা গেল যখন বিশেষ করে অজানা পথে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করে অন্নপূর্ণা (৩) [২৪,৮৫৭ ফুট] শৃঙ্গটিতে সর্বপ্রথম আরোহণের সম্মান লাভ করেন ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এভারেষ্ট আরোহণকারী ভারতীয় দলের নেতা এম্ এস্ কোহলী, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে। নেতা সহ সোনাম্ গিয়াৎসো* এবং শেরপা সরদার সোনাম্ গির্মি এই শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। অন্নপূর্ণার শৈলমালার যে শৃঙ্গটিকে সকলে "গণেশ" [২৩,৮০৫ ফুট] বলে জানে, অবশ্য কেউ কেউ অন্নপূর্ণা সাউথও বলে, সেটির উপর আরোহণ করেন জাপানের কিয়োটো ইউনিভার্সিটির পর্বতারোহীর দল। Prof. A. Higuchi-র নেতৃত্বে নেতাসহ S. Ugeo শিখরে আরোহণ করেন। সেটা ১৩ই অক্টোবর। দু' দিন পরে আবার তাঁদের দলের অন্যান্য সকলে শিখরে আরোহণ করেন।

সেই বৎসরই অন্নপূর্ণার আরেকটি শিখর, গ্লেসিয়ার ডোমে

---

*১৯৬৫ সালে কোহলির নেতৃত্বে সোনাম গিয়াৎসো আরও ৮ জনা ভারতীয়ের সঙ্গে এভারেষ্ট শৃঙ্গে ওঠার কৃতিত্ব লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে ইতি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পর্বতারোহী বলে গণ্য হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্প কিছুদিন পরে তিনি দুরারোগ্য "সিরোসিস্" রোগে মারা যান।

[২৩,৮০৩ ফুট], আরেকটি জাপানী পর্বতারোহীর দল আরোহণ করেন। দলের নেতা ছিলেন Dr. S. Shimalo। M. Nishimura ও শের্‌পা দোর্‌জে শিখর আরোহণ করতে সমর্থ হন। ১৬ই অক্টোবর তাঁরা শিখরে পদার্পণ করেন।

পর বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি জার্মান পর্বতারোহীর দল Gunter Houser-এর নেতৃত্বে অন্নপূর্ণা (১) [২৬,৫০৪ ফুট] শিখরটি দক্ষিণ ও পূর্বদিক থেকে আরোহণ করতে আসেন। কিন্তু তাঁরা সেকাজে সফল হন নি। তাঁরা ঐ হিমলেরই অন্য একটি গঙ্গা-পূর্ণা [২৪,৩৭৫ ফুট] ৬ই মে ও ৮ই মে আরোহণ করেন। দলের আট জন সদস্য ও দু' জন শের্‌পার সকলেই শিখর আরোহণ করতে সমর্থ হন। তাঁদের কয়েকটি তাঁবু ও পিটন হারিয়ে যায়, কয়েকটি সভ্য সামান্য তুষারক্ষতে আক্রান্ত হন, তা সত্ত্বেও তাঁরা ২৯শে মে ঠিক বর্ষা নামবার আগে ঐ হিমলের অন্য দুটি শিখর, গ্লেসিয়ার ডোম (২৩৮০৩) ও টেন্ট-পিক আরোহণ করেন।

ধৌলাগিরির শিখরগুলি দুর্জয় বলে খুব কম শিখরেই মানুষের পদার্পণ ঘটেছে। কিন্তু প্রায় প্রতি বৎসরই বিভিন্ন দেশ থেকে পর্বতারোহীর দল এই শিখরগুলিতে আরোহন করবার চেষ্টা করে আসছেন।

Herzog-এর তিন বৎসর পরে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সুইস্ পর্বতারোহী Bernhard heuterburg আসেন। তিনি ধৌলাগিরি ব্যাপক-ভাবে পরীক্ষা করেন এবং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ১নং শিখরটির (২৬৮১০) উত্তরপৃষ্ঠের উত্তর হিমবাহ ধরে এগিয়ে ২৫,০০০ ফুট অবধি পৌঁছাতে সক্ষম হন। এটা সত্যই দুঃসাহসিক অভিযান। ফিরবার পথে তাঁরা আরও বিশদভাবে অঞ্চলটি সমীক্ষা করেন।

আর্জেন্টিনিয়ানরা এরপর আসেন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং দুইবারই অমানুষিক পরিশ্রম করেন শিখর আরোহণের জন্য। সেবার দলে ছিলেন শেরপা সরদার পাশাং দাওয়া লামা—ইনি দার্জিলিং-

এর লোক এবং এঁর পর্বতারোহন সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল, মনোবল ছিল প্রচণ্ড। এণ্ডিজ পর্বত থেকে পর্বতারোহীরা এসেছিলেন, সঙ্গে একজন অস্ট্রীয়ানও ছিলেন, Gerhard Watzl। তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও ধৌলাগিরি অজেয় রইল। উপরন্তু, দলের নেতা Francisco Ibanex এই অভিযানে প্রাণ হারালেন।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি জার্মান ও সুইস পর্বতারোহীর দল আসেন, নেতা ছিলেন Martin Meier। Meier তৎকালীন পর্বতারোহীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী বলে বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের ভাগ্য মন্দ ছিল। অভিযান সফল হয় নি।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে Max Eiselin-এর নেতৃত্বে একদল সুইস্ পর্বতারোহী আসেন ধৌলাগিরির ১নং শিখর আরোহন করতে। তাঁরাও সেবার বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যান। সেবার তাঁরা যে পথ খুঁজে বের করেন, তাতে তাঁদের আর সন্দেহ থাকে নি যে পর বৎসর তাঁরাই আবার চেষ্টা করলে এবং আবহাওয়া অনুকূল থাকলে শিখর আরোহর করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা এই পর্বতে আসবার অনুমতি পেলেন না, কেননা তাঁদের আগেই অষ্ট্রীয়ানদের দল নেপাল গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে ঐ শিখর আরোহন করবার অনুমতি পেয়ে গেছেন। অষ্ট্রীয়ানদের দলনেতা ছিলেন Fritz Moravec। ইনি হিমালয়ের অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ছিলেন। অভিযানের কয়েক সপ্তাহ বেশ সুষ্ঠুভাবে কাটল। একটার পর একটা ক্যাম্প স্থাপিত হয়ে গেল। একদিন দলের একজন সভ্য Heini Roiss ক্যাম্পের নিকটেই হিমবাহের মধ্যে একটি তুষার ফাটলের মধ্যে ২০ মিটার নীচে পড়ে গেলেন। ব্যাপারটা প্রথমে কেউ লক্ষ্যই করে নি। কয়েক ঘন্টা পর তাঁর বন্ধুরা তাঁর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে তাঁকে খোঁজ করে পেল, তিনি তখন ফাটলের দেয়ালে শক্তভাবে আটকে গেছেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কঠিন পরিশ্রম করে ফাটলের মুখ বড় করতে হল। একাজ করতে অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছিল। কেউ

একজন মাথা নীচে দিয়ে ঝুলে পড়ে বরফ কাটছে, আর প্রতিটি কাটা বরফের টুকরো নীচের হতভাগ্যের মাথা আঘাত করছে। এত কষ্ট করেও কিন্তু সেদিনই, ৫০০০ মিটার উঁচুতে হিমবাহে ধৌলা-হিমল তুষারশিখরের পাদদেশে তাঁর সমাধি দেওয়া হ'ল। Heini Roiss-এর মৃত্যুতে দলের মনোবল ভেঙে পড়ল। এদিকে আবহাওয়া খারাপ হতে সুরু করল। ঝড়ে তাদের অনেক দরকারী যন্ত্রপাতি হারিয়ে গেল, তাঁবু তুষারে ডুবে গেল—ফলে তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হলো। হিমানী সম্প্রপাতেও তাদের ক্যাম্প ডুবে গিয়েছিল একবার। এর উপর তাদের খাদ্যাভাব ও জ্বালানীর অভাব দেখা দিল। এত অসুবিধা সত্বেও ২৫শে ও ২৭শে মে Karl Preine ও পাশাং দাওয়া লামা ৭৮০০ মিটার অবধি উঠেছিলেন কিন্তু প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে পড়ে আর এগোতে পারলেন না। তারা অভিযান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুইস্‌রা আবার এলেন, আবার Max Eiselin এর নেতৃত্বে। হিমালয় অভিযানের ইতিহাসে এই প্রথম একটি প্লেন ব্যবহার করা হলো। এই প্লেনে করে এঁরা পোখারা থেকে লোকজন ও মালপত্র বেসক্যাম্পের নিকট ডামবুশ্‌ পাসে নামানোর ব্যবস্থা করলেন। এই প্রথম কোন প্লেন এত উঁচুতে (৫২০০ মিটার) নামল। এই প্লেনের নাম দিয়েছিলেন "ইয়েতি"। এই প্লেন ব্যবহার করে যেমন তাদের সময় সংক্ষেপ হলো, তেমনি পরিশ্রম বাঁচল। অসুবিধার মধ্যে, হঠাৎ করে একদিন অত উঁচুতে উঠে অক্সিজেনের অভাব বোধের জন্য তাঁদের অসুস্থ হবার সম্ভাবনা ছিল, সেজন্য তাঁরা যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্লেন বেস্‌ক্যাম্পের নিকট ভেঙে গেল, অবশ্য ততদিনে তাঁদের প্রায় সব মালপত্র উপরে পৌঁছে গেছে। এবার দুবছর আগেকার খুঁজে পাওয়া নতুন পথে এঁরা ধৌলাগিরির ১নং শিখরে আরোহন করতে সমর্থ হলেন। ১৩ই মে তেরজন সভ্যের দল থেকে ছয়জন সভ্য বিশ্বের

ত্রয়োদশতম উচ্চতম শৃঙ্গ আরোহণ করলেন। ১৩ই মে Ernst Torrer, Albin Schelbert, Peter Diener, Kurt Diemberger, নওয়াং দোর্‌জে ও নিমা দোর্‌জে শিখরে পদার্পণ করলেন। এর দশদিন পরে ২৩শে মে আরও দুজন, Hugo Weber ও Michel Voucher শিখর আরোহণ করেন।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে J. O. M. Roberts চারজন শের্‌পা নিয়ে ধৌলাগিরির ৪নং শিখর পশ্চিমদিক থেকে পরীক্ষা করেন। ধৌলাগিরির নিম্নাঞ্চলের বিকটাকৃতি প্রতিকূল চেহারা সত্ত্বেও তিনি প্রথম বাধা বিঘ্ন পার হয়ে একটা পথ তৈরী করে ১৯০০০ ফুটে একটি খোলা হিমবাহের ময়দানে ৩নং ক্যাম্প স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ান হিমালয়ান এসোসিয়েশন ধৌলাগিরির ২নং ও ৩নং শিখর আরোহণ করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ২২,৫০০ ফুট পর্যন্ত উঠে দুর্যোগ পূর্ণ আবহাওয়ার জন্য তাঁরা ফিরে আসেন।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে J. O. M. Roberts রয়্যাল এয়ার ফোর্সে'র দলের সঙ্গে আবার ধৌলাগিরিতে আসেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর রওনা হয়ে তাঁরা ২০,৪০০ ফুট উঁচুতে ১৬ই অক্টোবর ৩নং ক্যাম্প স্থাপন করেন। কিন্তু পথ অতীব ভয়ঙ্কর দেখে এবং হিমানী সম্প্রপাতের আশঙ্কায় তাঁরা অভিযান পরিত্যাগ করে ফিরে আসেন।

এই একই বৎসর একটি জাপানী অভিযাত্রীদল ধৌলাগিরির ২নং শিখর আরোহণের চেষ্টা করেন। দুজন শের্‌পা হিমানী সম্প্রপাতে মারা যায়। একজন শের্‌পার পিঠের হাড় ভেঙে যায়। অভিযানও পরিত্যাক্ত হয়। নেতা ছিলেন Hiroshi Sugita.

ছয়

আজ ৮ই অক্টোবর, আজও প্রত্যুষে দাদার স্নেহময় কণ্ঠের ডাকা-ডাকিতে উঠে পড়েছি। তুষারধবল ধবলগিরি বা ধৌলাগিরির উপর প্রথম আলোকসম্পাত দেখতে। কাল রাত্রে শোবার আগে চাঁদের আলো তুষার শিখরের উপর পড়ে যে মোহিনী মায়ার সৃষ্টি করেছিল, তার নেশা আজও কাটাতে পারছি না। তাই প্রত্যুষে দাদার এক ডাকেই সকলে উঠে জানালা দিয়ে নূতন সূর্য্যের আলোয় আবিরের রঙে রাঙানো ধৌলাগিরির তুষারমৌলী শিখরাবলীর অলৌকিক রূপ-রাজী আর একবার দেখে নিই।

শিখা বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। অন্যান্য গ্রামের মত এখানেও চারি-দিক ঘিরে শস্যক্ষেত ধাপে ধাপে পাহাড়ের নীচে থেকে চূড়া অবধি উঠে গেছে। চারিদিক সবুজ হয়ে আছে। ছিমছাম বাড়ীগুলি ঘিরে শব্জীক্ষেত, কুমড়ো, বীণ, শশা, টমাটো, লাউ লাগানো, ফলেছেও অজস্র। মাঝে মাঝে কোন কোন বাড়ীর একাংশে অজস্র ডালিয়া, কস্‌মস্‌, গাঁদা ফুল ফুটেছে। একটু বেলা হতে না হতেই দলে দলে ছেলেমেয়েরা ক্ষেতের কাজ করতে পথে বের হয়েছে।

শিখা ছাড়িয়ে সমতল পথে ঘাড়ে গ্রাম পার হয়ে এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ের গায়ে গায়ে পায়ে চলা সরু পথ। ঘাড়ে পার হয়ে পাথরের অসমতল সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা উঁচুতে ওঠা। এখানটা যেন একটা

ছোটখাট গিরিসঙ্কট। গিরিসঙ্কট পার হয়ে আবার তেমনি অসমতল পাথরের সিঁড়ি সোজা নীচে নেমে গেছে ঘাড়ে খোলা ও কালীগণ্ডকী নদীর সঙ্গমের দিকে। প্রায় দেড় হাজার ফিট একটানা উৎরাই চলা। নামতে তেমন কষ্ট নেই, তাই বেশ দ্রুত চলেছি। পাহাড়ের উঁচু থেকেই দেখতে পাচ্ছি। পিঁপড়ের সারির মত একদল যাত্রী ঘাড়ে খোলা নদীর উপরের পোল পার হয়ে চড়াই বেয়ে অনেক কষ্টে উঠে আসছে।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে স্তরে স্তরে সবুজ ক্ষেত, তার মধ্য দিয়ে লাল মাটির পথ চলেছে। পথের ধারে কিছুদূর অন্তর অন্তর চৌকোনা পাথরের বাঁধানো স্তূপের মত। যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য এগুলি তৈরী করা। তারই আসনের মত ধাপে বসে প্রয়োজন মত বিশ্রাম করে নিচ্ছি। কোথাও কোথাও ধস নেমে পথ নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে অতি সাবধানে দাদার পিছু পিছু পার হচ্ছি। আগাগোড়া পাহাড়টাই ক্ষেতে ভরা, মাঝে মাঝে দুটি একটি ঘর ইতস্ততঃ ছড়ানো। অনেকটা নামবার পর উপর থেকেই দেখি যেন কালীগণ্ডকীর উপরের ব্রীজটা ভাঙা, তাছাড়া যাত্রীরা যে পথে উঠে এসেছে, সে পথ আমরা ভুল করে ছেড়ে এসেছি। তাই আমাকে আসতে বলে দাদা এগিয়ে গেলেন। আমি ছায়াতে বসে বসে বিশ্রাম করছি। ডাঃ বিশ্বাস ও বন্ধুর কোন চিহ্ন নেই।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও দাদার কোন সাড়া পাচ্ছি না, তাই ওই পথ ধরেই এগোতে সুরু করে দিলাম। আজ বন্ধু পিছনে, ওঁকে সঙ্গ দিতে রয়েছে, আমি দাদার সাথে সাথে এগিয়ে চলেছি। একটু এগোতেই দেখি হাঁপাতে হাঁপাতে দাদা আসছেন, উনি পথে কোন লোকের দেখা পান নি, তাই পুরো পথটাই নেমে ব্রীজের অবস্থা দেখে আবার উঠে এসেছেন।

আরও খানিকটা নেমে একটা বাঁকের মুখে ঘাড়েখোলা ও কালী গণ্ডকীর সঙ্গম দেখা গেল। ওখানেই প্রথম নীলগিরি তুষারশৃঙ্গের

দেখা পেলাম। দুটি সবুজ শৈলমালার সংযোগস্থলে শিখরটির তুষার-ধবল রূপ দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে ধৌলাগিরি, ডাইনে অন্নপূর্ণা, এই দুটি শৈলমালার মধ্য দিয়ে কালীগণ্ডকী নদী বয়ে এসেছে আমাদের কাছ পর্যন্ত। দুটি পর্বতমালাকে যেন যোগ করে নীলাভ তুষারের ধবল রূপ নিয়ে নীলগিরিশিখর দাঁড়িয়ে—ওই শিখর, অন্নপূর্ণা গিরিমালার একটি বিখ্যাত শিখর। যে পথের স্বপ্ন এতকাল দেখেছি নিদ্রায়, জাগরণে, সেই পথ এখন আমাদের সম্মুখে প্রসারিত !

আর একটু নীচে নামতেই একটি আমেরিকান দম্পতির সঙ্গে দেখা। এসেছেন নেপালের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁরা দাদার সঙ্গে পথের ধারে পাথরের উপর বসে পড়লেন, আমি ছবি তুলে নেবো। এঁদের পিছনের পটভূমিতে রইল দুটি সবুজ উত্তুঙ্গ শৈলমালার মধ্যে তুষারমৌলী-শিখর নীলগিরি, তার ঝলমলে রূপ নিয়ে, পায়ের কাছে সঙ্গমের নীল সফেন জলধারা বয়ে চলেছে।

পর্বতারোহণের ইতিহাস থেকে জানা যায় দুর্গম নীলগিরি (২৩,৪৫৩ ফুট) বহুকাল ধরে অজেয় ছিল। ওলন্দাজ পর্বতারোহীগণ ১৯৬২ খ্রীঃ সর্বপ্রথম এই শিখরে আরোহণ করেন। বিশ্ববিখ্যাত পর্বতা-রোহী এ্যালবার্ট এগ্লারের নেতৃত্বে তিনজন ওলন্দাজ পর্বতারোহী H. Van Lookeren Campagne, Paul V.L Campagne, Peter V.L. Campagne ও বিখ্যাত ফরাসী পর্বতারোহী Lionel Tarrey ও শের্পা ওয়াংদি ১৯শে অক্টোবর এই শিখরে সর্বপ্রথম পদার্পন করেন। পর্বতারোহীদের পরম আকাঙ্ক্ষার সেই দুর্গম শিখর এখন নীলাভ উজ্জ্বলরূপে আমাদের মনে শিহরণ জাগায়।

ঘাড়েখোলা নদীর উপর দুটি গাছের মোটা গুঁড়ি পেতে বিপজ্জনক পোল তৈরী করা। একটু নীচেই নদীটি কালীগণ্ডকীতে আত্মসমর্পন করেছে। আমরা দুজনে অভ্যস্ত পদক্ষেপ করে পার হয়ে এসেছি। তবু দাদা তার অকুণ্ঠ সাহায্য দান করতে এগিয়ে আসেন। সঙ্গমের

উপর নদীর এপারে একটি মন্দির, অন্য তীরে তাতোপানি গ্রামের প্রথম ঘর।

মাত্র সোয়া ন'টা বেজেছে, কিন্তু ভীমবাহাদুরের নির্দেশমত আজ এখানেই দুপুরে খাওয়া সেরে দানার পথে যাত্রা করতে হবে। মাঝপথে থাকবার মত সুবিধাজনক ঘরের অভাব হতে পারে। আমরা আরও কিছুদূর এগোতে রাজী ছিলাম কেবল অসুবিধার ভয়ে সাহস পেলাম না। তা ছাড়া এই সঙ্গমটির সৌন্দর্য্য আমাদের বারবার আকর্ষণ করছিল। পাহাড়ী বন্য স্রোতস্বিনীর সহজাত উদ্দামরূপ নিয়ে ঘাড়ে খোলা নদী এসেছে—উচ্ছল হয়ে উঠেছে তার জলধারা, অসংখ্য প্রস্তরের বাধা ডিঙোতে গিয়ে। একটু দূরেই এই উদ্দাম-ধারা শান্ত হয়েছে বৃহতের কাছে বিলীন হতে পেরে।

এতদিন পর আমরা পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যময় পথে প্রবেশ করছি। রূপসী কালী গণ্ডকীর দর্শনও আজ এই প্রথম। ঘন সবুজ বনের সমারোহ দুটি পর্বতমালার গায়ে, তারই মাঝখান দিয়ে বিশাল চওড়া শুভ্র পথ তৈরী করে বয়ে এসেছে চঞ্চলা নীলাম্বরী কালী গণ্ডকী। তার রূপেরও সীমা নেই যেন! শত সহস্র ছোট বড় উপল খণ্ড ডিঙিয়ে তার পথ, তাই উচ্ছলরূপে তার প্রকাশ। আমরা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি।

দুজন জার্মাণ ভ্রমণকারী যুবক নেপাল ভ্রমণ সেরে ফিরে চলেছেন। দুপুরের জন্য আশ্রয় নিয়েছেন তাতপানির ওই ঘরখানিতে। একজনা ইঞ্জিনিয়ার অন্য জনা W.H.O.র ডাক্তার। এঁদেরও মুক্তিনাথ যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মুক্তিনাথের সাত মাইল আগে ঝুমসুম্বার পর আর যাবার অনুমতি পান নি, তাই সেখান থেকেই ফিরতে হয়েছে। এখন কাঠমাণ্ডুতে ফিরে চলেছেন। আমরা মুক্তিনাথ যাচ্ছি শুনে যেচে এসে আলাপ করলেন। আমাদের দেখে, বিশেষতঃ এই দুর্গম পথে একজন ভারতীয় মেয়েকে দেখে বারবার আনন্দ প্রকাশ করলেন। এঁরা কলকাতায় যাবেন, সেখানে গিয়ে

আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন বললেন। কিন্তু আজও তাঁদের কোন খবর পাইনি।

দাদার উদ্যোগে এখানে রান্না খাওয়ার পাট সকাল সকাল শেষ হলো। আজ ক'দিন পর ঘাড়েখোলা নদীর তুহিন শীতল স্রোতে প্রাণভরে স্নান করা গেল। ছোট হলেও নদীটির রূপের অবধি নেই। সুশীতল জলস্পর্শে আমাদের ক্লান্ত, ব্যথাজর্জরিত দেহ শান্ত হলো। ডাঃ বিশ্বাস নদীর জল ছেড়ে তো উঠতেই চান না। ঘরের দাওয়ায়, গাছের ছায়ায়, নির্মেঘ খোলা আকাশের নীচে শুয়ে বিশ্রামলাভ, আজ যেন পরম স্বর্গ-সুখ প্রাপ্তি।

বেলা একটার একটু পর আবার রওনা হওয়া গেল। একটু এগিয়েই কালীগণ্ডকী নদীর উপর একটা ঝোলান ব্রীজ। ব্রীজ পার হলেই তাতপানি গ্রামের অন্যান্য ঘরবাড়ী সুরু হয়েছে। এই গ্রামেই একটা উষ্ণ জলের কুণ্ড আছে, তাই এখানকার নাম তাতপানি। নেপালী ভাষাতে তাতপানির অর্থ তপ্তজল। এখন যাবার সময় তাড়াতাড়িতে কুণ্ডটি খুঁজে দেখবার সময় হলো না। ফিরবার পথে বন্ধু অনেক খুঁজে কুণ্ডটি বের করে দেখিয়েছিল।

সৌন্দর্যপূর্ণ পথ, তাই এখনকার চলাতে আর আমাদের কষ্টবোধ যেন নেই। এখন পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন চড়াই বা উৎরাই নেই, নদীর তীর ধরে ধরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পথ চলেছে। কোথাও ক্ষেত, কোথাও ময়দানের মধ্য দিয়ে—কেবল দু'এক জায়গায় পাহাড় ধসে পড়েছে, সেখানে নতুন তৈরী পায়ে চলা পথে উঁচুতে উঠে আবার নীচে আসতে হচ্ছে। তবে তেমন পথ খুব কম। চলতে চলতে মুক্তিনাথ ফেরৎ যাত্রীদলের সঙ্গে দেখা হলো।

"কি ধর যাতা, মুক্তিনাথ ?"

"হাঁ জী—"

"আপ্ তো কঠিন রাস্তা চলা আয়া, আব্ তো ময়দান কা মাফিক রাস্তা, সেরেফ্ মুক্তিনাথ কা নজ্‌দিগ্ থোরা চড়াই হোগা।"

আমরা কঠিন পথ পার হয়ে এসেছি, এখনকার পথ ময়দানের মত। শুনে মনে ভরসা পাচ্ছি। আমাদের শুকনো মুখ দেখে একজন যাত্রী একটা মস্ত কাঁকুর দিল খেতে, তেষ্টা দূর হবে।

কালীগণ্ডকীর তীর ধরে বড় বড় চৌকো পাথর বাঁধানো পথে চলা, বেশীর ভাগই ঘনসবুজ শস্যপূর্ণ ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। দুই তীরে উত্তুঙ্গ গিরিমালা চলেছে, তাদের চূড়ায় রূপালী তুষার কিরীট, মাঝে মাঝে উঁকি মারছে। পূর্বদিকে তুষারমৌলী অন্নপূর্ণা পর্বতমালা, পশ্চিমে শুভ্র-ধবল ধৌলাগিরি শৈলমালা। আমরা চলেছি উত্তরে, কালী নদীর উপত্যকা ধরে ছায়া ঘেরা পথে। সৌন্দর্য্যের নেশায় বুঁদ হয়ে কেবল হেঁটেই চলেছি। আজ সকলের মন আনন্দে পরিপূর্ণ।

কি একটা গ্রাম এগিয়ে এলো। পথের পাশে পাথরের তৈরী একটা দালানে বন্ধু বসে অপেক্ষা করছে।

"কি হোল? থেমে কেন? চলো!" তাকে উদ্দেশ্য করে বলি

"আমরা এসে গেছি যে, এইটেই দানা।" বন্ধু হেসে বলে, "আজ বুঝি চলতে ভারি ভালো লাগছে, না?" যোগ দেয় সঙ্গে সঙ্গে। "ভারি সুন্দর পথ না? দাঁড়ান, চায়ের কথা বলে আসি। ছোটমামার জন্য দুধও দেবে বলেছে। দিদি! দিদি!"

বন্ধুর ডাকে একটি তরুণী চায়ের কাপ হাতে বেরিয়ে এল নেপালী ঢঙে ঘাঘ্‌রা পরা, গায়ে লম্বা হাতা গাঢ়রঙের জামা, মাথায় চাদর ঢাকা। দাদার জন্য আরেক কাপ চায়ের কথা বলে দিল বন্ধু. আর তার ছোটমামার জন্য দুধ, দাদা আর উনি এসে গেছেন। আমরা ভীম বাহাদুরের জন্য অপেক্ষা করছি। সে এলে সে-ই ঘর ঠিক করবে। ওর চেনা লোক আছে এখানে। আমরা চা খেতে খেতে গল্প জুড়ে দিলাম। এই বাড়ীটির মালিক একজন ইণ্ডিয়ান আর্মির লোক। এসে বসে হিন্দিতে গল্প করছেন।

ভীমবাহাদুর এসেই না থেমে এগিয়ে গেল ঘর ঠিক করতে। আমরা ওকে অনুসরণ করে অগ্রসর হই। কিছুদূর আঁকা বাঁকা পথে

চলে দেখি, একটা ছোট ঝরণা বাঁদিক থেকে এসে কালীনদীতে মিশেছে। তারই বুকের উপর ছড়ানো পাথরে পা ফেলে ফেলে হেঁটে পার হওয়া। পাহাড়ী নদী, তার উচ্ছল জলস্রোত—ওদের মত লাফ দিয়ে পার হই সাধ্য কি ? একটু থমকে যাই। পথ চলতি একজন পাহাড়ী ছেলে সাহায্য করতে ছুটে এসেছে। কোন কথা না বলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বড় বড় পাথর ঠেলে ঠেলে নিয়ে এসে নদীর জলের উপর পা রাখবার মত স্থান ঠিক করে দেওয়াতে সহজেই পার হলাম। অকুণ্ঠ চিত্তে তাকে ধন্যবাদ দিলাম। নেপালে এইরকম অযাচিত সাহায্য কিন্তু দুর্লভ। অতীতে, থাকবার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে, খাবার কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে, এসব মামুলি প্রশ্নের সত্য উত্তর পাওয়া কঠিন হয়েছে। অসহযোগীতা যেন এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্য। ছেলেটি বুঝলাম এর ব্যতিক্রম।

আজ রাত্রে থাকবার জন্য ছোট্ট একটা একতলা বাড়ীর একখানা ঘর পেলাম। পাশে একটা বেশ বড় নতুন দোতলা বাড়ী আছে। পঞ্চায়েতের বাড়ী, তালাবন্ধ, সেখানে স্থান মিলল না। এটি ছোট্ট ঘর, একপাশে বেড়া দেওয়া, সেখানে আমাদের মালপত্র নিয়ে কুলিরা রইল। ঘরের অন্যপাশে দুটি অতিথি ও সন্তানসহ গৃহকর্ত্রী রাত্রে রইলেন। ঘরের এককোনে আমরা আমাদের বিছানা ক'টি পেতে নিয়েছি। আমাদের পায়ের কাছে উনুন জ্বলছে। তবে গৃহকর্ত্রী তাঁর অকুণ্ঠ সেবা দিয়ে তাঁর দৈন্য ঢেকে দেন।

ফিরবার পথেও রাত্রে এখানেই থেকেছিলাম। সে রাত্রে কি মুষল ধারে বৃষ্টি! আমরা ভয়ে আঁতকে উঠে দেখি, উপর থেকে ফুটো ছাত দিয়ে টপ্ টপ করে জল পড়ছে, বন্ধুর বিছানা তো ভিজেই গেল, আমরাও কেউ শুকনো রইলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে মই বেয়ে ছাতে উঠে কয়েকটা প্লাষ্টিকের চাদর পেতে জল আটকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হলো। তখন জল ঐ চাদরে জমে গড়িয়ে এসে নীচে পড়তে সুরু করেছে। সারারাত প্রায় এমনি করে বিছানা নিয়ে টানাটানি চললো।

সৌন্দর্য্যময় পথে চলে আজ সকলেই খুশী। গাঁয়ে পৌঁছেই এখানকার একটি মেয়ের কাছ থেকে নানারকম শব্জী সংগ্রহ করে নিয়েছি। সেগুলি রাঁধবার কাজে লেগে যাই। কয়েকটা টুকটুকে লাল টমাটোও পেয়েছি, তার চাটনী হবে, বন্ধুর হুকুম। দাদা সকলের জন্যে খাঁটি ভয়সা দুধের কফি তৈরী করেছেন, অপূর্ব লাগছে খেতে।

বন্ধুর আনন্দের আজ কি আর শেষ আছে? এক সময় চুপি চুপি আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, "মামীমা, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।" "কি ব্যাপার।" "আস্তে! এদিকে আসুন, চুপিচুপি শুনুন, নইলে ছোটমামা শুনতে পাবেন।" ইঙ্গিতে পাড়ের উঁচুর ধাপে একটা ক্ষেতের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি সুদর্শনা সুসজ্জিতা তরুণীকে দেখিয়ে বলে, 'বেশী করে যেন তাকাবেন না, বুঝে ফেলবে আবার! ওই মেয়েটি আমাকে বারবার ডাকছিল, আপনারা তখনো এসে পৌঁছন নি। অশ্লীল কুৎসিৎ ইঙ্গিত করে সামনে ঘরটা দেখিয়ে সেখানে যাবার কথা বোঝাচ্ছিল। আমি বুঝি না বুঝি না করে চুপ করে আছি। কি কাণ্ড বলুন তো?'

প্রায় সমবয়সী ভাগ্নে, তাই ঠাট্টা করে বলি—"ভালই তো ওর সঙ্গে চলে গেলেই তো পারতে! সঙ্গে তোমার ছোট মামাকেও না হয় নিয়ে যেতে! আহা, পোখারার অমরহোটেলের সুযোগটা বেচারার এমন করে নষ্ট হল, কি আফ্‌শোষ!" বন্ধু ভীষণ চটে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

ঘটনাটি ছোট্ট, কিন্তু আমাদের ভারি অবাক লেগেছে একটি নেপালী মেয়ের এমনি ব্যবহারে।

সাত

ভোর সাড়ে ছয়টা বাজবার আগেই বেরিয়ে পড়ি। পথ চলতেই বোঝা গেল, দানা মস্ত গ্রাম, যেন এর শেষ নেই। অনেকগুলি বিরাট বিরাট পাথরের তৈরী বাড়ী আছে, কিন্তু বাড়ীগুলি সব তালাবন্ধ, লোকজন কেউ নেই এখন। শুনলাম, এইসব বাড়ী এই অঞ্চলের বড় লোকদের, তাঁরা এখন তুকুচে বা আরও উঁচুতে অন্য গ্রামে আছেন। এগুলি তাঁদের শীতাবাস। এরই মধ্যে একখানা বড় বাড়ী ঠাকুর প্রসাদজীর, এ অঞ্চলের বড় ব্যবসায়ী। তুকুচে গিয়ে আমরা তাঁর বাড়ীতেই উঠেছিলাম। দানায় অনেকগুলি ফলের বাগিচাও আছে, নানারকম ফলের গাছ আছে সেখানে। কমলালেবু গাছ ভরা কমলালেবু, এখনো সবুজ।

আজকের পথও কালকের মতই সুন্দর, তেমনি অন্নপূর্ণা ধৌলাগিরির তুষার কিরীট শোভিত পর্বতমালার মধ্য দিয়ে কালী গণ্ডকীর শুভ্র বেলাভূমির ধার ঘেঁসে ঘেঁসে। মাঝে মাঝে কুয়াশা এসে হাল্কা আবরণে পাহাড়ের চূড়ার তুষারসজ্জা ঢেকে দিচ্ছে। একটু এগোতেই দেখি দুইদিকের দুটি গিরিমালা তাদের তুষার সম্পদ সম্পূর্ণ অনাবৃত করে দাঁড়িয়ে, আর কোথাও কোন আবরণ নেই।

"ও মনি, ভক্তি! একটু থামো, থেমে একবার দেখে নাও।" দাদার আহ্বানে বার বার থেমে সেই অপরূপ রূপসজ্জা দেখা নিই।

চলার ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম করতে বসে আবার আশা মিটিয়ে প্রাণ-ভরে দেখি। পথে মাঝে মাঝে দু'একটা জায়গায় ধস নেমে পথকে দুর্গম করে তুলেছে, কিন্তু পথের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। আজ সেদিনের কথা মনে হলে মনে হয় কত ভাগ্যবতী আমি, তাই এই পথে যেতে পেরেছিলাম।

কালীগণ্ডকী নদীর তীর ধরে ধরে এই যে সমতল উপত্যকাভূমি, এখান থেকে সুরু হয়ে উত্তরে প্রায় বাইশ মাইল অবধি প্রসারিত হয়েছে।

দানা ছেড়ে একটু এগোতেই রূপ্‌সী গাঁও পথে পড়লো। রূপ্‌সী গ্রামের শেষেই রূপ্‌সী ঝরণা। রূপ্‌সী ঝরণা সত্যই রূপ্‌সী। খুব উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে তার রূপ্‌সী ধারা অঝোরে ঝরে পড়ছে, মধ্যে মধ্যে সবুজ বনভূমি তার অঙ্গের কিয়দংশ ঢেকেছে তাতে মনে হয় সুন্দরী রূপ্‌সীর রূপ আরও উথলে উঠেছে। উঁচুতে একটি সরু ধারা নামতে নামতে অনেক চওড়া হয়ে কয়েকটি ধারাতে বিভক্ত হয়ে গেছে। রূপ্‌সী রূপ্‌সী আমাদের মন কেড়ে নিয়ে আমাদের চলার পথ ভাসিয়ে দিয়ে নীচে কালী নদীতে আত্মসমর্পণ করতে ছুটে চলেছে। আমাদের পথ চলা শেষ করে দিতে চায় যেন রূপ্‌সী। রূপের গরবে গরবিনী নৃত্যছন্দে নেচেই চলেছে। তার থামা নেই, ছেদ নেই, একই তালে দ্রুতলয়ে তার চলা। আমরা সব ভুলে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি।

বন্ধু তাড়া লাগায়। 'চলুন এবার! অনেকটা যে হাঁটতে হবে। আবার তো বলবেন, পা ব্যথা করছে—পারছি না।' বন্ধুর তাড়া খেয়ে আবার চলা সুরু করি।

রূপ্‌সী পার হয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঁচুতে ওঠা। ক্রমাগত উঠে উঠে একটা খাড়া পাহাড়ের ধার ঘেঁসে কঠিন পাথরের গায়ে খাঁজকাটা পথে চলা, বেশ সঙ্কীর্ণ পথ। কেবলই সিঁড়ির ধাপ দিয়ে তৈরী, হয় নামা, না হয় ওঠা। অল্প কিছুদূর যাবার পর আমরা কাপ্রে

গ্রামে পৌঁছলাম। বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, ঘর বাড়ীগুলি দেখলেই বোঝা যায়। ঘর বাড়ীগুলি ঘিরে অনেক ক্ষেত খামার, নীচে একেবারে নদীর তীর অবধি নেমে গেছে। প্রচুর শব্জী ফলে আছে বাড়ীর আনাচে কানাচে। একটি পাহাড়ী মেয়ে ক্ষেতে কাজ করছিল, তার কাছ থেকে কচি লাউডগা চেয়ে আঁচলে বেঁধে নিয়ে চলেছি, ঘাসায় রান্না করে খাব। দেখে বন্ধু হাসে, বলে, 'ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' মনোরম পথ, চলেও আনন্দ।

ধীরে ধীরে চড়াই ওঠা, কঠিন পথ কোথাও নেই। কেবল বন্ধু যদি একটু ধীরে চলতো তো বেশ হ'ত। ও একটু চোখের আড়াল হলেই মনে হয় নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। কিন্তু ওকে কিচ্ছু বলার উপায় নেই। 'কষ্ট হচ্ছে' বললেই বলবে—'ইস্, পাহাড় চড়ার সখ আছে, আর কষ্টও করবেন না! তবে পাহাড়ে আসা কেন?' কেন যে এলাম সেকথা ওকে বোঝাই কি করে?

আর একটু এগোনোর পর দেখি পথ খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে, খাড়া পাহাড়ের দেয়াল কেটে কেটে তৈরী করা পাথরের সিঁড়ি কেবল। এক জায়গায় দুটি পাহাড়ের ঢেউ-এর মধ্যেকার খাঁজ যোগ করে কালো পাথরের গায়ে লাল টুকটুকে একটা লোহার ব্রীজ, যেন আলগা হয়ে লেগে আছে। তার পরই দুটো মস্ত সুরঙ্গ, পাহাড় ফুটো করে তৈরী করা। এই সঙ্কীর্ণ পথে আসবার সময় ডাঃ বিশ্বাস ও দাদা একদল ঘোড়ার দেখা পেয়েছিলেন, তাঁরা বললেন, তাঁরা পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলিকে পার হতে দেন। এই সঙ্কীর্ণ বিপজ্জনক পথে তাছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

এখানে কালীগণ্ডকীর বুকও সঙ্কীর্ণ হয়েছে, আর তার রূপই বা কি! রূপসীর রূপে যেন হিংসার জ্বলে মরছে, তাই নিজেও রূপসী সেজেছে। নদীর সঙ্কীর্ণ চলার পথে মস্ত মস্ত পাথর পড়ে আছে। তাছাড়া নদীর ঢালও এখানে বেশী, তাই নীল সফেন জলধারা উঁচু হতে লাফিয়ে নামতে নামতে পাথরে পাথরে বাধা পেয়ে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

রূপালী ঢেউ ভেঙে ভেঙে জলকণা ধোঁয়া হয়ে উড়ছে,—ওপরের ঘন-সবুজ বনভূমির চিত্রপটখানি সেই ধোঁয়াতে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। সৌন্দর্য্য প্রাণময়ী হয়ে উঠছে। ওপারের বনভূমি দূরে নয়, সেখানে দেখি কয়েকটা বাঁদর গাছের ডালে ডালে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে, এপারে কিন্তু একটিও নেই।

পাহাড়ের গায়ে শস্যভরা ক্ষেত তারই মধ্য দিয়ে চলার পথ। কোথাও কোথাও পথের উপর দিয়েই ঝরণার ধারা চলেছে, দুপাশে আবার বিছুটির জঙ্গল। জুতো শুকনো রেখে বিছুটি বাঁচিয়ে চলাই মুস্কিল,' তবু আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরা পরমানন্দে চলেছি। পথের অসীম সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে আজও আমরা চলেছি।

ঘাসায় পৌঁছতে এগারোটাও বাজেনি। আমরা বিশ্রামের ফাঁকে একবার চা খেয়ে নেবার প্রত্যাশায় পথের ধারে একটা চালাঘরের দোরগোড়ায় বসে পড়েছি। ভাষার অসুবিধা সর্বত্র, কিন্তু ক্ষুধার ইঙ্গিত সবদেশেই এক। ইসারায় জানালাম, আমরা ক্ষুধার্ত, চা ও ভুট্টাভাজা চাই। ভীমবাহাদুরের কাছে গুটিকয়েক বাঁধাবুলি শিখেছি, তাই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ব্যবহার করছি, কিন্তু ঘরের অধিবাসীদের কথা একবর্ণও বুঝছি না।

পথের অন্যধারে চারপাঁচটি ছেলেমেয়ে খেলা করছে। গৃহকর্তার সন্তান এরা। সবচেয়ে বড়টির বয়স দশের বেশী হবে না। একপাশে স্তূপাকার ভুট্টা জমা করা রয়েছে, তারই পাশে খেলা করছে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর বাচ্চাগুলি। তাদের মায়ের আহ্বানে সবচেয়ে বড় মেয়েটি ঘরের ভিতর গিয়ে আমাদের জন্য একখানা বড় থালাতে ভুট্টাভাজা নিয়ে এল। অন্যান্য বাচ্চাগুলি এক এক করে ধাপ ধাপ করা পাহাড়ের না বেয়ে নামতে লাগল। সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটির বয়স বছর খানেক। সেটি নিজে নামতে পারে না, আবার তাকে নামানোও মুস্কিল। বাচ্চাগুলি এক একজনা এক একটা ধাপে দাঁড়িয়ে গেল, আর ছোট বাচ্চাটিকে এদেরই একজন বুকে ধরে ঝুলিয়ে

নীচের ধাপের ছেলেটির কাছে দিয়ে দিলো, সে তার পরেরটির কাছে ঠিক তেমনি ভাবে দিলো—যেন রিলে রেস্! আমরা মাটীতে তৃণ-শয্যায় শুয়ে ওদের কাণ্ড দেখছি। অদ্ভুত বুদ্ধি ওদের!

দাদা আর ডাঃ বিশ্বাস এসে পৌঁছতেই তাঁদের পিছু পিছু ভীমবাহাদুরও এসে হাজির। আমরা তার পিছু পিছু এগিয়ে চলেছি। পথের ধারে তিন চারটি কল বসানো, তার নীচের বাঁধানো চত্বরে মেয়েরা কাপড় কাচ্ছে, বাসন মাজছে। আরও খানিকটা এগিয়ে একখানা ঘরের পাশে ঢাকা বারান্দায় থাকবার স্থান ঠিক হলো, পথের অন্যধারে নালা দিয়ে তীব্রবেগে জল ছুটে চলেছে। এটি এখানকার ইরিগেশন কেনাল। পাহাড়ী ঝরণাকে বেঁধে চাষের কাজে লাগানো হয়েছে। আমরা কেনালের জলে স্নান করে খেয়ে নিয়ে আবার রওনা হয়ে পড়ি।

বেলা দুটো বেজেছে, কিন্তু আগেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। আমরা দ্বিধা করছিলাম, রওনা হবো কি না! কিন্তু থামতে দাদার প্রচণ্ড অনিচ্ছা। এই ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে অনায়াসে পথ চলা যায়। তাছাড়া এখন থামলে ভবিষ্যতে কি করবো আমরা? হিমালয়ের আবহাওয়া তো সর্বত্র এমনিই হয়। সুতরাং চলাই স্থির হলো। আমি আর দাদা এগোলাম। বন্ধু বর্ষাতি বের করে রাখেনি, তার ছোটমামার বকুনি খেয়ে অবশেষে কুলিদের দাঁড় করিয়ে তাদের কাছ থেকে বর্ষাতি বের করে নিয়ে চলা সুরু করল।

লেতের পথ সহজ সরল, বেশি চড়াই বা উৎরাই কোথাও নেই। কোথাও ঘন বনের মধ্য দিয়ে পথ চলছে এঁকেবেঁকে। কোথাও বনের মধ্য থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে ঝরণা এসে পথ ভাসিয়ে দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে, তারই উপরের পাথরে পা রেখে অতি সাবধানে পার হওয়া। চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। বৃষ্টি সমানে পড়ে চলেছে। বাতাস সন্ সন্ শব্দে গাছের পাতা কাঁপিয়ে দিচ্ছে। চোখে চশমার কাঁচে জল পড়ে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এত বৃষ্টিতেও দেখি

পথের পাশে একটা ছোট্ট ঝোপে এক ঝাঁক ছোট্ট ছোট্ট মিনিভেট পাখী, যেন বৃষ্টি পেয়ে মহানন্দে খেলা জুড়েছে। গাঢ় লাল রঙের পাখী, মাথা ও লেজের দিকটা কেবল কুচকুচে কালো। সবুজ ঝোপের মধ্যে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে গাছের মধ্যে জীবন্ত লাল ফুল। দলে একটা হলদে কালোয় মেশানো পাখীও রয়েছে, সেটি ঐ জাতেরই মেয়ে পাখী।

বনের মধ্যে গাছের তলায় প্রবল বৃষ্টির ধারা থেকে আত্মরক্ষা করতে মাঝে মাঝে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। আজ সকলে একত্র চলেছি। গ্রামের ক্ষেতখামার ঘড়বাড়ী পেরিয়ে আবার বনভূমির শুরু। বিশাল গাছতলায় মস্ত একটা সমতল পাথর দেখিয়ে দাদা বলেন—"মণি, তোমার শোবার জায়গা।" উনি করুণস্বরে বলেন, "আহা-হা ভিজে গেছে। নইলে বেশ শোয়া যেত!"

লেতে মাইল ছয়েক দূরে, অবশ্য পাহাড়ী মতে। কিন্তু দেখছি সে পথ কেবল লতিয়ে লতিয়ে চলেছে, যেন তার আর শেষ নেই! বন্ধু বলে, "এইজন্যই এর নাম লেতে!" বনভূমির শেষে নীচে নেমে নদীর উপর একটা ব্রীজ পার হলেই কয়েকখানা ঘর। তারই পাশ দিয়ে চড়াই পথ সুরু হয়েছে। শেষ দুই ফার্লং চড়াই, বেশ কষ্ট হয়। এখনো চারিদিকে মেঘে ঢাকা, ঝম্‌ঝমে বৃষ্টি মাথায় করে পথ চলা। ফিরবার পথে এইখান থেকেই ধৌলাগিরিমালার অপূর্ব তুষার সৌন্দর্য্য দেখতে পেয়েছিলাম। ক'দিনের বৃষ্টিতে তখন আরও নতুন তুষারে চারিদিকের সবুজ পাহাড়ের চূড়াগুলি পর্যন্ত ঢেকে গেছে। ধৌলা-গিরির সবচেয়ে উঁচু শিখরটি সম্পূর্ণরূপে শুভ্র হয়ে সূর্য্যালোকে হীরকের মত জ্বলজ্বল করছে, তার ঠিক পাশেই তেমনি শুভ্র একটি হিমপ্রপাত, যেন নীলাকাশের গা বেয়ে নীচে ঝরণার মত নেমে এসেছে। স্তরে স্তরে সবুজ পাহাড়ের পিছনে এমনি তুষারের শিখরাবলী, বেশি দূরেও নয়, অপূর্ব দেখাচ্ছিল।

লেতের শেষে চড়াইটুকু উঠতে বেশ কষ্ট হলো, বিশেষ করে বৃষ্টি

মাথায় করে। দুই ফার্লং উঠে পাহাড়ের মাথায় মালভূমিতে পৌঁছলাম, একটু এগিয়েই লেতের ক্ষেত-খামার সুরু হলো। বেলা সাড়ে পাঁচটায় একেবারে কাক ভিজে হয়ে লেতেতে পৌঁছলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘর পাওয়া গেল, মস্ত একটা ঘর, ছিমছাম পরিচ্ছন্ন, তারই এক কোণে থাকবার জায়গা। আগুন আর চা-ও মিললো। তখন শীতে সবাই ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছি। লেতে বেশ ঠাণ্ডা জায়গা, তার মধ্যে জানালা দিয়ে হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে, বৃষ্টি তো আছেই। শীতে জবুথবু অবস্থা। জানালা দরজা সব বন্ধ করে দিয়েছি। মোটা মোটা উলের তৈরী ভোটিয়া গালিচা পেতে দিয়েছেন গৃহকর্ত্রী, তারই উপর স্লিপিং ব্যাগগুলি খুলে ভেতরে ঢুকে তবে শীত নিবারণ করা গেল। বন্ধু যেখানে শুয়েছে, তার ঠিক মাথার উপরেই 'শিকার' ঝুলানো, কিন্তু উনুন থেকে অনেক দূরে। উঠে চলাফেরা করতে গেলেই ওই-শিকারে তার মাথা ঠুকে যাচ্ছে। সন্ধ্যের আগেই এক-দল তিব্বতী ব্যবসায়ী ভিজে ভিজে ওখানে আস্তানা নিল। তাদের সঙ্গে নানারকম ধূপ, জারিবুটি, তিব্বতী চমরীর লোম ইত্যাদি রয়েছে।

আট

১০ই অক্টোবর—সকালে রওনা হতে হতে প্রায় পৌণে সাতটা। কাল সারারাত ঘরের মধ্যে একটি বাচ্চা এবং দুজন বড় পুরুষ মানুষ হুপিং কাশি কেশেছে। ডাঃ বিশ্বাস ভয় করছেন, আমারা হয়তো ঐ কাশিতে আক্রান্ত হবো যাত্রা শেষে কলকাতায় ফিরলে। কাল রাত্রে ঘর ভর্তি লোক শুয়েছিল।

লেতে ছেড়ে বেরুতেই এখানকার মস্ত সাদা ইস্কুলবাড়ী, সেটা পার হয়েই দেখি ধৌলাগিরির আধখানা মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে। এই আধখানারই বা কী অপরূপ শোভা! আর একটু এগিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি অন্নপূর্ণার তুষারশুভ্ররূপ। অপরূপ রূপ!

"ও ভক্তি, একটু থেমে পিছনে তাকিয়ে দেখ, কেবল সামনেই দেখছ।" দাদা বারবার ডাকছেন, তাই বারবার থেমে থেমে দেখছি।

লেতে গ্রামটি একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। লেতের পরেই আপার লেতে—তার খানিক পরেই কালাপানি গ্রাম, সবটাই ধীরে ধীরে উৎরাই পথ। ক্রমে ক্রমে আমরা আবার কালী নদীর ধারে পৌঁছে গেলাম। আবার নদীর তীর ধরে ধরে পথ। কোথাও কোথাও তার বিশাল বালুকাময় পাথর ছড়ানো বুকের উপর পায়ের ছাপ দেখে দেখে এগিয়ে চলা। নির্মেঘ নীলকাশ, উজ্জ্বল তপন শোভা পাচ্ছে।

চারিদিকের বনভূমি বৃষ্টিতে ধুয়ে উজ্জ্বলতর হয়েছে। লেতে থেকে মাইল দুই পরে পথ পূর্বদিকে বেঁকে গেছে। আমরা এখন ধৌলগিরি শৈলমালাকে পিছনে রেখে কালী নদীর উপত্যকা ধরে এগিয়ে চলেছি। আর নবতর সুন্দর রাজ্য এগিয়ে আসছে। দুই তীরে যতদূর দৃষ্টি চলে ঘন সবুজ বনময় শৈলমালার ঢেউ এগিয়ে চলেছে, মাঝখান দিয়ে চলেছে নদীর বিরাট চওড়া শুভ্র বেলাভূমি, তার শুভ্র বালুকারাশি সূর্য্য কিরণে জ্বল জ্বল করছে। স্বচ্ছতোয়া সবুজ রঙা কালী কয়েকটি ধারাতে বিভক্ত হয়ে তীব্রবেগে বয়ে চলেছে। পিছনে ধৌলাগিরি তার শুভ্র নির্মল তুষার সম্পদ নিয়ে গর্বিত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে, ডানদিকে নীলগিরি শিখর নীলাভ শুভ্র উজ্জ্বল মূর্তিতে বিরাজমান।

বাঁকে ঘুরবার আগে একটা ফুলভরা প্রকাণ্ড মাঠ পার হয়ে এলাম। ডাঃ বিশ্বাস বলছেন, এখানে তাঁবু পেতে বেশ আনন্দে থাকা যায়। বাঁকের মুখে বেলা দশটা নাগাদ দুটি আমেরিকান কিশোরীর সঙ্গে দেখা। তারা পিস্‌কোরের নির্দেশে এখানে এসেছে। টিনিগাঁও পর্যন্ত গিয়ে সেখানে একজন অসুস্থ হয়ে পড়াতে ফিরে চলেছে। অসুস্থতা সত্বেও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা মেয়ে দুটি। সৌন্দর্যময় পথ পেয়ে যেন উড়ে উড়ে চলেছে। আমাদের প্রশ্নের জবাবে বলে, তুকুচে এখনো তিন ঘণ্টার পথ!

নদীতীর ঘেঁযে উত্তরদিকের পর্বতমালার গায়ে গায়ে এখানকার পথ, কোথাও কোথাও নদীর বুকে নেমে যাচ্ছি। বিরাট চওড়া শুভ্র বুক, তারই মাঝখান দিয়ে চলে চলে যে পথের দাগ পড়ছে, তাই অনুসরণ করে চলা।

বাঁক ঘুরবার পর থেকে, অর্থাৎ বেলা ১০টার পর থেকেই প্রচণ্ড হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই হলো কালীগণ্ডকীর উপত্যকাজাত বিখ্যাত ঝড়ো হাওয়া। এই হাওয়া নাকি সারা বৎসরই চলে। শীতল হাওয়া জামার ভিতর ঢুকে যেন হাড় অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছে,

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে প্রচণ্ড ঠেলা দিচ্ছে, স্থির হয়ে দাঁড়ানোও চলে না। পর্বতমালার ঢেউ যেমন বেঁকে গেছে, নদীর গতিপথও সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে গেছে। হাওয়ার বেগ কিন্তু সমানই আছে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা নদীর শুকনো বুকের উপর দিয়ে চলে দেবীথান গাঁও পেলাম। পর পর তিনখানা গ্রাম নিয়ে দেবীথান গাঁও। আরও দেড়মাইল পর তুকুচে গ্রাম, কিন্তু এখান থেকেই সেটা দেখা গেল। গ্রামের কাছে একটা ছোট ঝরণা বয়ে এসেছে উত্তর দিকের পাহাড় থেকে, তার উপরকার কাঠের ব্রীজ পার হলেই তুকুচে গ্রামের ঘর বাড়ীগুলি সুরু হলো।

তুকুচে গ্রামটি ছবির মত সুন্দর। নদীর বুকের উপরই গড়ে উঠেছে। দক্ষিণে নদীর স্ফটিকস্বচ্ছ জলধারা তীব্রবেগে বয়ে চলেছে, তার পরই সবুজ বনসমাচ্ছন্ন পর্বতের শুরু। পিছনে নীলাভ পর্বতের তুষারমৌলী শিখর—নীলগিরি শিখর। পশ্চিমে নদীর বেলাভূমির শেষেও সেই একই সুন্দর দৃশ্য, সেই সবুজ পর্বতমালার ঢেউ, পিছনে নীলাভ শিখর তারও পিছনে বিশাল ধৌলাগিরি শৈলমালার শুভ্ররূপ। উত্তরে গ্রামের লাগোয়া অল্পস্বল্প ক্ষেতের পরই ঘন সবুজ বনসমাচ্ছন্ন পর্বতের সুরু, তার শিখরটি তুষারচ্ছন্ন, নাম তুকুচে পিক (২২, ৬৪৭ ফুট)। একটু উঠে গেলেই যেন তুকুচে পিকটি ছোঁয়া যাবে, এত কাছে মনে হচ্ছে। তুকুচের সৌন্দর্য্যের যেন আর সীমা নেই।

তুকুচে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, অনেক বড় বড় ঘর বাড়ী আছে। কাঠের ও পাথরের কয়েকটি দোতলাও আছে। পোষ্টঅফিস, স্কুল, হাসপাতাল, দোকান বাজার মোটামুটি সবই আছে। পোখারা ছাড়বার পর এত বড় গ্রাম আর চোখে পড়েনি। পথে কাপ্রেতে দাদার সঙ্গে মুক্তিনাথের প্রধান পুজারীর দেখা হয়েছিল। তিনি কয়েকটি নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে একটি হলো এখানে বিখ্যাত ব্যবসায়ী ঠাকুরপ্রসাদজীর সঙ্গে দেখা করা। তাই দাদা আমাদের অপেক্ষা করতে বলে ঠাকুরপ্রসাদজীর খোঁজে গেলেন। বন্ধু এরই মধ্যে এক 'দিদি' জুটিয়ে ফেলে চায়ের

ব্যবস্থা করে নিয়েছে। পথের ধারে রকে বসে আমরা চা খেতে খেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু বাদে একজন দর্জিকে দিয়ে দাদা আমাদের ডেকে পাঠালেন। দর্জিটি পথ দেখাচ্ছিল। তার পিছু পিছু গ্রামের মধ্যে সরু গলিপথে ফার্লং খানেক গিয়েই ঠাকুর প্রসাদজীর পাথরের তৈরী দোতলা প্রাসাদোপম অট্টালিকা। মস্ত উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়ী। সামনের দিকের দেয়ালে অগুনতি বৌদ্ধ ধর্মচক্র সাজানো। দুই কোণে নহবৎখানা। মস্ত ভারি কাঠের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই ছোট আধ অন্ধকার উঠান। উঠান থেকেই কাঠের সিঁড়ি সোজা দোতলার বারান্দ অবধি উঠে গেছে। কর্তা তাঁর বন্ধু শেরসিংজীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে পাশের গ্রামে তাঁর আত্মীয়ের বিবাহের উৎসবে যোগ দেবার জন্য বেরুবেন বলে তৈরী হচ্ছিলেন। আমাদের পরম সমাদর করে বসালেন। ওঁরই বাড়ীতে একখানা ঘর ছেড়ে দিলেন থাকবার জন্য। ওঁদের বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে চা পানে আপ্যায়িত করলেন। ঠাকুরপ্রসাদজী বললেন, আপনারা তাড়াহুড়া না করে আজ দিনটা এখানে বিশ্রাম নিয়ে কাল ঝুমসুম্বা যান, পরশু বিকালের মধ্যে মুক্তিনাথ পৌঁছে যাবেন। তাই ঠিক হলো।

অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন ঠাকুরপ্রসাদজীর গৃহিনী। বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, মস্ত বাড়ী, বিশাল ভাঁড়ার। আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখালেন, বার্লির টিন, দুধের কৌটো, সবকিছু কাঠমাণ্ডু থেকে আনানো, নানারকম শস্যবোঝাই বড় বড় পাত্র। বাড়ীর সীমানার বাইরে নদীর দিকে একটুখানি জমিতে নানারকম শাকশব্জীও ফলিয়েছেন। অনেকগুলি চাকরবাকর খাটছে, তবে গৃহিনী রান্নাবান্না স্বহস্তেই করেন। মস্ত রান্না ঘরে তিনটে উনুন একসঙ্গে জ্বালিয়ে রান্না বসালেন। অতবেলাতেও ক্ষেত থেকে বাঁধাকপি এনে ঝোল রেঁধে দিলেন। খাঁটি ঘি দিয়ে রান্না-পরিপাটী করে মস্ত মস্ত থালাতে করে খেতে দেওয়া। কোথাও যত্নের কোন ত্রুটি নেই। যে ঘরখানা

আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন, সেটি সুসজ্জিত, তাঁদের এক ছেলের ঘর। ছেলেটি কাঠমণ্ডুতে লেখাপড়া করছে। একখানা ছোট চৌকীতে বিছানা পাতা, ঘর জোড়া মেজেতে কার্পেট বিছানো। এক কোণে ছোট একটা টেবিল ও গুটি দুই চেয়ার, মস্ত একখানা আরসী দেয়ালে ঝুলছে। দেয়ালের গায়ের সেল্‌ফে কয়েকখানা ইংরাজী বই। জানালা খুলতেই এক ঝলক রোদ এসে ঘরের মেজেতে ছড়িয়ে পড়লো। বাইরে তাকিয়ে দেখি সামনে নদী বয়ে চলেছে, তার পিছনে নীলগিরি শিখরের ঝলমলে রূপ, যেন একখানা আঁকা ছবি। চেয়ার টেবিল সরিয়ে আমরা মেজেতেই আমাদের বিছানা কটি পেতে ফেলি, ডাঃ বিশ্বাস আগেই খাটের বিছানা দখল করেছেন।

কৌতূহলী হয়ে দাদা নেড়ে চেড়ে দেখেন বইগুলি। একটা মস্ত বই বের হ'ল, Maurice Herzog এর Annapurna! অন্নপূর্ণা (১) [২৬,৫০৪ ফুট] শিখর আরোহণের গৌরবময় কাহিনী আবার আমাদের মনে জেগে ওঠে। কত সুন্দর সুন্দর ছবিতে ভরা বইখানি। এই তুকুচে গ্রামও চতুর্দিকের কয়েকখানি সুন্দর ছবিও আছে।

এঁরা বৌদ্ধ। সেইমত এদের বসবার ঘরের উঁচু বেদির উপর বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। সামনে পাশের দিকে বসবার জন্য নীচু বেঞ্চি, তার উপর মোটা পুরু গালিচা লম্বা করে বিছানো, বুদ্ধমূর্ত্তির সামনে দীপাধার সাজানো। সন্ধ্যাবেলা গৃহিনী অনেকগুলি তেলের প্রদীপ জ্বেলে মূর্ত্তির সামনে সাজিয়ে দিলেন। একটি বছর দশেকের মেয়ে, তার আমাদের সাথে খুব ভাব হয়ে গেল। সে আমাদের আর ছাড়তেই চায় না।

বাজারে দাদা ঠাকুরপ্রসাদজীর খোঁজ করতেই একজন দরজী পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল। আমাদের সাহায্য করতে উৎসুক দেখে ডাঃ বিশ্বাস তাকে আমাদের জন্য খানিকটা দুধ বা দই সংগ্রহ করতে বলে দিয়েছিলেন। সে দুধ নিয়ে আসতেই ঠাকুরপ্রসাদ গিন্নি মহা চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। সে যে নীচ জাত। তার ছোঁয়া জলও তো

ঘরে নেওয়া চলবে না। অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে শান্ত করা হলো। ভিন্ন ঘরে ভিন্ন উনুনে ভীমবাহাদুর সেই দুধ জ্বাল দিল। আমরা অবাক! এদেশে দেখি বৌদ্ধরাও জাতিভেদ মানে!

নয়

আজ ১১ই অক্টোবর, আজ আমাদের যাত্রার সপ্তম দিন। ঠাকুর-প্রসাদজীর পরামর্শ মত আমরা যথাসাধ্য ভোরে রওনা হবার চেষ্টা করি। তুকুচের উচ্চতা আট হাজার ফিট, তাই এখানে প্রচণ্ড শীত। কাল বৃষ্টি পড়ে শীত আরও বেড়েছে। এত শীতে প্রত্যুষে ওঠা অসম্ভব, তবু তাড়াতাড়ি করতেই হয়। ঠাকুরপ্রসাদজী সাবধান করে দিয়েছেন, বেলা ন'টা দশটা থেকে কালকের মত ঝোড়ো হওয়া চলবে কালী গণ্ডকীর উপত্যকায়, সারাদিন সেই হাওয়া বইবে, সন্ধ্যা হলে তবে থামবে, সুতরাং ভোরেই যতটা পথ এগিয়ে চলা যায় ততই সুবিধা।

তুকুচে যেন প্রকৃতির দুইরূপের সীমারেখাতে অবস্থান করছে। এতদিন যে সবুজ পাইন, ফার গাছ ভরা বনভূমি, সবুজ পাহাড়, শ্যামল ক্ষেতের মধ্য দিয়ে এসেছি, তেমন দৃশ্য ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। সম্মুখে তিব্বতের দিকে যতই এগিয়ে চলেছি, পাহাড়ের রঙ ক্রমশ বদলাচ্ছে। ছোট ছোট রুক্ষ ঝোপ, শুকনো ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ঢেউ কেবল এখন, তাও ক্রমশঃ মিলিয়ে সম্পূর্ণ শুদ্ধ মেটে পাহাড়ে রূপান্তরিত হতে চলেছে। কাল রাত্রে বেশ বৃষ্টি পড়েছে। দুই পাশে তুকুচে পিক ও নীলগিরি শিখর ও পিছনের ধৌলাগিরি শৈলমালার উপর নতুন করে তুষার পড়ে আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

কালী গণ্ডকীর দুই তীরের সবুজ পর্বতমালা ক্রমশঃ ধূসর হবার দিকে। পাহাড়ী নদী কালী কেবল একভাবে শুভ্র বেলাভূমির মধ্য দিয়ে নীল রেখায় এঁকেবেঁকে চলেছে। কোথাও কোথাও নদী তীরের ক্রম-বিলীয়মান ঝোপের ছোট ছোট সরু ডালে নানারঙের অজস্র ছোট ছোট পাখী নেচে নেচে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

আজও কালী নদীর বুকের উপর দিয়ে পায়ে চলা পথ। তুকুচে পিককে আজ যেন খুব কাছের বলে মনে হচ্ছে। ডাঃ বিশ্বাস দাদাকে বাইনোকুলারের মধ্য দিয়ে দেখাচ্ছেন, শিখরে ওঠবার গিরিশিরা ধরে যেন দুটি কালো বিন্দু এগিয়ে চলেছে। বিন্দু দুটি যে নড়ছে, তা যেন আমরাও খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি। সেই আমেরিকান পর্বতারোহীও তার সঙ্গী শের্‌পাটি নয়তো? না, কেবলই চোখের ভুল? বারবার করে দেখেও সকলে একই মত প্রকাশ করলাম। সবাই দুটি বিন্দুকে স্পষ্ট নড়তে দেখছি।

এখানকার পথ মোটমুটি সমতল। কেবল যখন কোন পাহাড়ের গায়ে কাটা পথে চলতে হচ্ছে, তখনই কেবল সামান্য চড়াই বা উৎরাই। নদীর বুক ধীরে ধীরে উঁচু হলেও আমাদের চলবার সময় তা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। খানিকটা এগিয়ে ডান দিকে দেখি একটা ব্রীজ দিয়ে পরিখা পার হয়ে যেন লালমাটীর তৈরী করা অনেকটা দুর্গের মত একটা গ্রাম। আমরা নাম শুনেছি, তাই ভাবি ওই মার্কা গ্রাম। আরও এগিয়ে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা, হেসে হেসে যেন নাচতে নাচতে চলেছে, পিঠে একটা করে টুকরি, তারা কোথায় যাচ্ছে কে জানে! ওদের ভাষাতো জানা নেই যে জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু ভাঙা হিন্দিতে বললো, ওটা মার্কা নয়। মার্কা আরও দূরে অন্য পাহাড়ে। একটু এগোনোর পর তাও দেখা গেল। সবগুলি গ্রামই শুকনো ধূসর পাহাড়ের গায়ে, গ্রামের ঘর-বাড়ীগুলি ধুলোয় ঢাকা।

মার্কার কাছে আসতেই দেখি একদল সুন্দরী সুসজ্জিতা তরুণী

ঝরণার ধারে আগুন জ্বালিয়ে কাপড় সিদ্ধ করে ঝরণার জলে কাপড় কাচছে। এদের চেহারা ও পোষাকের অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ল। যেন নেপালী পোষাকে খানিকটা তিব্বতী ধরণ এসে মিশেছে। ঘাঘরা ছেড়ে তারা মোটা আলখাল্লার মত পোষাক পরেছে। আর একটু এগিয়ে দেখি একদল ছেলেমেয়ে দল বেঁধে ইস্কুলে পড়তে যাচ্ছে, সঙ্গে তাদের শিক্ষক রয়েছেন। গ্রামের কাছে পথের ধারে দেয়ালে গাঁথা সারি সারি ধর্মচক্র সাজানো রয়েছে, প্রত্যেকটির গায়ে লেখা—ওঁ মনি পদ্মে হুঁ। একটু ঘুরিয়ে দিলেই টুনটুন্ করে মিষ্টি আওয়াজ করে বাজতে থাকে। তুকুচেতে ঠাকুরপ্রসাদজীর বিরাট দালানের চারিদিক ঘিরে যে দেওয়াল আছে, তার পুরোটিতেই এমনি ধর্মচক্র সাজানো। কোথাও আছে পাথরের তৈরী উঁচু উঁচু তোরণ, তারই নীচ দিয়ে চলবার সদর রাস্তা। তোরণের ভিতরের চৌকোনা ছাদে বুদ্ধদেবের জীবনী আঁকা রঙ্গিন ছবি। অপূর্ব সুন্দর ছবিগুলি, কত-কালের পুরণো কে জানে। রঙ কিন্তু একটুও নষ্ট হয় নি। বৌদ্ধ ছাঁচে ঢালাই করা সব গ্রামগুলি।

দুটি ঘোড়াচড়া মূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের পরণে ফেদার জ্যাকেট, ফেদার প্যাণ্ট, বুট জুতো, মাথায় পালক আঁটা টুপি, হাতে চামড়ার দস্তানা। এরা খাম্‌পা জাতের লোক। বলিষ্ঠ, বেপরোয়া চেহারা, দেখলেই ভয় হয়। ঘাসাতেও এমনি একজন খাম্‌পাকে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। গ্রামের বাচ্চারাই পরিচয় দিল, বলল, ওরা খাম্‌পা।

মার্কা একটি মস্ত গ্রাম, অন্ততঃ দু'শো আড়াইশো বাড়ী আছে। পাকা পাথরের তৈরী দালান, বারান্দাওলা বাড়ী অনেক আছে। গ্রামের চলবার রাস্তাগুলি সরু সরু, অনেকটা কাশীর গলির সঙ্গে মিল আছে। এখানে একটা রেষ্টুরেণ্টও আছে, নাম নীলগিরি রেষ্টুরেণ্ট। ইংরাজীতে নাম লেখা। ফিরবার পথে সেখানে আমরা চা খেয়েছিলাম। তখন দেখলাম সেটি একটি দোকানঘরও বটে। নানারকম

ঘরে তৈরী পশমের কার্পেট বিক্রির জন্য রাখা আছে। দাম অসম্ভব।

অল্প স্বল্প উঁচু নীচু এবং কিছুটা নদীর উপর দিয়ে পার হলে আরও মাইল দেড়েক দূরে সিয়াং গ্রাম। সিয়াং গ্রামটিও মস্ত বড়। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে শুরু হয়ে নীচের নদীর বুক অবধি ছড়ানো। সিয়াং-এর পর পাহাড়ের বাঁদিকে পথ ঘুরে গেছে। বাঁকের মুখে একটিই ঘর, ঘরের গৃহিনীর কাছে বন্ধু আবার চায়ের দাবী করে বসলো। গৃহিনীর একটি হাত বাঁকা, জন্মগত খুঁত। বাঁক ঘুরে আরও দুই মাইল গিয়ে ঝুমসুম্বা গ্রাম দেখা গেল। ঝুমসুম্বা পৌঁছানোর একটু আগে অনেকটা সমতল ময়দানের মত জায়গা, প্লেনের চাকার দাগ দেখে বুঝলাম এয়ারষ্ট্রীপ।

বেলা দশটা বাজবার আগেই ঝোড়ো হাওয়া সুরু হয়েছে। নদীর বাঁক ঘুরতেই হাওয়ারও দিক পরিবর্তন হলো। পিছন থেকে যেন ঠেলে ফেলে দিতে চায়। কি জোর হাওয়ার! সঙ্গে সঙ্গে শুকনো পথ থেকে ধূলো উড়ে এসে চোখে মুখে ঢুকছে। ঝোড়ো হাওয়া শোঁ শোঁ শব্দে একটানা বয়েই চলেছে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে চলা!

ঝুম্‌সুম্বাকে লোকে ঝুম্‌সুম্ বা ঝুম্‌সা বলে। ঝুম্‌সা পৌঁছানোর একটু আগে একটা ছোট ঝরণার উপর কয়েকটা কাঠের গুঁড়ি ফেলা, তার উপর দিয়ে পার হয়ে অল্প উঠেই নেপালী চেক্‌পোষ্ট। এখানে ইণ্ডিয়ান আর্মির লোকও আছে সাহায্য করবার জন্য। আমাদের থামিয়ে আমাদের পারমিট পরীক্ষা করে দেখতে চাইল। ইণ্ডিয়ানদের বড় একটা বাধা দেয় না, কিন্তু কোন ইউরোপীয় বা আমেরিকানদের বেলায় খুব কড়াকড়ি।

নদীর ওপর একটা কাঠের তৈরী ব্রীজ পার হয়ে গ্রামে ঢোকা গেল। বন্ধু সর্বাগ্রে এগিয়ে গেছে। ঝুম্‌সুম্বা পৌঁছে দেখি সে হাওয়া বাঁচিয়ে একটা দেয়ালের ধারে পিঠ দিয়ে বসে তার চিরাচরিত প্রথানু-যায়ী চায়ের চেষ্টা করছে। তবে এখনো কোন দিদির দারস্থ হতে পারে নি। আমরা পৌঁছাতেই সে চেষ্টা-ছেড়ে দিয়ে সে উঠে সকলের

সঙ্গে এগিয়ে চললো। শক্স্‌বাহাত্বরজীর বাড়ী বের করে সেখানে গেলাম। ঠাকুরপ্রসাদজী এর নামে চিঠি দিয়েছেন। ইনি এখানকার বড় ব্যবসায়ী। ঐ চিঠির জোরে সহজেই এখানে বাসস্থান পাওয়া গেল।

ঝুমসাতে আরও বেশী শীত, উচ্চতাও বেশী, নয় হাজার ফুট। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে কন্‌কনে ঠাণ্ডা মিশে অসহ্য শীত বোধ হচ্ছে, রোদ্দুর থেকেও কোন লাভ হচ্ছে না। আমরা ক্লান্ত, তার উপর এই প্রচণ্ড শীত, তাই স্নানের আশা পরিত্যাগ করে বন্ধ ঘরের ভিতর স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে শুয়ে পড়েছি। আমাদের আর নড়বারও শক্তি নাই।

শক্স্‌বাহাত্বরজী ও তাঁর গৃহিনী পরম যত্নে রাখলেন। প্রথমেই চা ও শুভ্র ভুট্টার খই এলো। ত্বপুরে ডাল, ভাত, তরকারী, চাটনী, ঘোল—মস্ত থালাতে বাটি বাটি বসিয়ে সাজানো খাবার এলো। যেন মস্ত নিমন্ত্রণ খেতে বসেছি। এমন ত্বর্গম ও শুষ্ক জায়গাতে এত সব খাদ্য সংগ্রহ করাও তো মুস্কিল। সন্ধ্যায় সময় চেক্‌পোষ্ট থেকে ইণ্ডিয়ান আর্মির কর্তা শ্রীইন্দ্রদেও সিং ও তাঁর সহকর্মী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোকের বাড়ী শোনপুরে। আমাদের সকলের খোঁজ খবর লিখে নিলেন। আমাদের ত্বটি উপকারের ভারও নিলেন। পোষ্টাপিসের অভাবে বহুদিন কলকাতাতে চিঠি দেওয়া হয়নি, তাই তিনি ওয়ারলেসে কাঠমাণ্ডুর ইণ্ডিয়ান এম্‌ব্যাসির সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়ীতে খবর দেবেন—All well at Muktinath. আর, ঝুম্‌সা বা তুকুচে গ্রাম থেকে ফিরবার জন্য ত্বটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। ফেরৎ পথে তিনটি কঠিন চড়াই পার হতে হবে, একটা শিখাতে, একটা ঘোরেপাণিতে, আরেকটা চন্দ্রকোটে। ওই বিশ্রী চড়াইগুলি আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।

নেপালে আসবার জন্য নেপালের তরফ থেকে কোন পারমিটের দরকার নেই, অবশ্য কেবল ভারতীয়দের জন্য। ইউরোপীয়দের অবশ্য

পাশপোর্ট নিতে হয়। তবে ভারতীয়দের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বা কলকাতায় পুলিশের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে হয়। নেপালে ঢুকবার সময় বিশেষ কোন চেক্ হয় না। কিন্তু ফিরবার সময় কড়াকড়ি বোঝা যায়। তাই সমস্ত মূল্যবান জিনিষ, বিশেষ করে ক্যামেরা, ঘড়ি ইত্যাদি "ডিক্লেয়ার" করে নিয়ে আসাই উচিত, নইলে ফিরবার সময় অসুবিধাতে পড়তে হয়। নেপালে সব ইউরোপীয় দেশের জিনিষ আমদানী ও বিক্রি হয়, তাই ভারতে ঢুকতে এত কড়াকড়ি।

তিনটি সুইস্ যুবক এসেছে পর্বতারোহণ করতে। তাদের একজন জণ্ডিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হয়ে লেতেতে পড়ে আছে। বাকী দুজন এখানে এসেছে। এখানকার এয়ারষ্ট্রীপটা সুইস্ রেড-ক্রশের তৈরী। প্রয়োজনানুসারে প্লেন যাতায়াত করে। ওরা চেষ্টা করছে কাঠমাণ্ডুতে খবর দিয়ে যদি প্লেন আনানো যায়, তবে তাতে করে অসুস্থ ছেলেটি ফিরে যাবে। তারা কিন্তু এ কাজ করতে সক্ষম হয়নি। পোখারা ফিরবার পথে ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল হুন্জা গ্রামে। আমরা মুক্তিনাথ থেকে ফিরবার আগেই ওরা ঝুম্সা ছেড়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল।

ঝুম্সা গ্রামটি ছোট হলেও বেশ স্বচ্ছল বলে মনে হলো। কালী গণ্ডকীর উপত্যকাজাত হাওয়ার প্রচণ্ড আক্রমণের হাত থেকে পরি-ত্রাণ পাবার জন্যে ঝুম্সার পাথরের তৈরী বাড়ীগুলি এমনভাবে দেয়াল দিয়ে ঘেরা যেন বাতাস সহজে চলাচল করতে না পারে। বাড়ীগুলির ভিতরের দিকে উঠান আছে, তারও চারিদিক উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। উঠোনে ভেড়া ও গরুর গোবর জমিয়ে শুকনো করা আছে, তাতে নাকি বাড়ী গরম থাকে। এগুলি শীতকালে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করাও চলে। এখানে কোন গাছপালা নেই, তাই জ্বালানীর অভাব হওয়াই স্বাভাবিক। ঘরগুলির জানালাও ছোট ছোট ও এক-মুখী, ফলে কিঞ্চিৎ অন্ধকার। এরা গরু, ভেড়া, হাঁস, মুর্গি পোষে। ফসলের ক্ষেত কোথাও দেখি নি। এখানকার গরুকে এরা বলে "লুলু

গাই"। ইয়াক্ ও দিশী গাই-এর সংমিশ্রণ।

টুন্-টুন্-টুন্-টুন্ শব্দে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি একদল ইয়াক মাল বয়ে নিয়ে চলেছে। একটি তিব্বতী তাদের নিয়ে চলেছে। ঘণ্টা বাঁধা ইয়াকগুলির গলায়, চলার সঙ্গে টুন্-টুন্ করে মিষ্টি মিষ্টি বাজছে। তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসাই এই অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা ছিল, এখন তিব্বত চীনের অধীনে চলে যাওয়াতে সেই ব্যবসা অনেক কমে গেছে। তবু কিছু কিছু ব্যবসা এখনো চলে। পশম ও পশমজাত দ্রব্য, পাথুরে লবণ, পনীর ইত্যাদি আসত। লবণের চাহিদা সবচেয়ে বেশী ছিল. নেপালের সর্বত্র এই লবণ চলত। এখান থেকে ধান, গম প্রভৃতি শস্য ও কাপড়-চোপড় ও সৌখীন দ্রব্যাদি রপ্তানী হত।

কালী গণ্ডকী নদীর উপত্যকা ধরে উত্তরে এগিয়ে গেলে শেষ নেপালী সহর মুস্তাং। অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইয়াকের ক্যারা-ভ্যানের সাহায্য নিয়ে এই উপত্যকা ধরে মুস্তাং-এর পথে তিব্বতের সঙ্গে নেপালের অবাধ বাণিজ্য চলতো।

শক্সবাহাদুরজী আমাদের সঙ্গে অনেক আলাপ করলেন। এত-দূরে বাস করেও এঁরা বহির্জগত থেকে সম্পর্কহীন নন। এঁর ছেলেরা রীতিমত লেখাপড়া শিখেছে, বিদেশে থেকেছে। নেপালের মহারাণীর সঙ্গে তোলা এদের সকলের ছবি দেখালেন।

দশ

পরদিন প্রত্যুষে উঠে আমরা রওনা হয়ে পড়লাম। আমাদের থাকবার ঘরখানার পিছনে নীলাভ পাহাড়ের নীলগিরি শিখরে প্রথম সূর্যালোক পড়েছে। পড়েছে পাশে তুকুচে পিকে, ধৌলাগিরির চূড়ায়। লাল হয়ে উঠেছে শিখরগুলি। গ্রাম পার হবার আগেই একটা বিরাট মাঠ, তারপরই কালী গণ্ডকীর বিস্তীর্ণ বালুকারাশির মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ চলে গেছে। নীলাম্বরী কালী সাদা বালুচরের মধ্যে পথ কেটে দ্রুত গতিতে বয়ে চলেছে। আজ যাত্রার শেষ দিন, মনের মধ্যে চঞ্চলতা অনুভব করছি, আজ দুপুরের পরই মুক্তিনাথ পৌঁছাতে পারব।

শক্সবাহাদুরজী জানালেন, মুক্তিনাথে যাত্রীনিবাস আছে। সেবাসমিতির এই যাত্রীনিবাসে বিনামূল্যে খাবারও পাওয়া যায়। কিন্তু এখন যাত্রার সময় পার হয়ে গেছে, তাই সে সব এখন অনিশ্চিত। তাঁর পরামর্শ মত সঙ্গে করে দু'দিনের মত চাল, আলু, ঘি, তেল, বিস্কুট চা, দুধ ইত্যাদি নিয়ে চলেছি, যেন কোন খাবার না পাওয়া গেলেও কোন অসুবিধা না হয়। সঙ্গে আনা তাঁবু দুটো রেখে গেলাম। অজানা পথে যদি কখনো প্রয়োজন হয়, তাই সে দুটো সঙ্গে এনেছিলাম। আরও বাড়তি কিছু মাল যতটা সম্ভব গুছিয়ে রেখে গেলাম শক্স বাহাদুরজীর জিম্মাতে।

সবুজ পাহাড়ের রাজ্য আগেই শেষ হয়েছে। এখন কেবল ধূসর ও বাদামী পাহাড়ের ঢেউ চলেছে—দুই পাশে, সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর অবধি। পাহাড়গুলির ঢঙেরও পরিবর্তন হয়েছে, সেগুলি তেমন যেন সূঁচালো নেই আর, কেমন ভোঁতা ভোঁতা দেখতে লাগছে। সামনে তুষারশৃঙ্গও সেই, পিছনে দূরে অবশ্য তুকুচে পিক, নীলগিরি শিখর ও ধৌলাগিরির শৃঙ্গাবলী উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে।

যত এগিয়ে চলেছি, পথের রিক্ততা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। যেন গেরুয়া বসনাঞ্চল উড়িয়ে চলেছেন কোন অজানা সন্ন্যাসী পর্বতের পথে পথে, সর্বহারার রূপ তাই সর্বদিকে সর্বঅবয়রে প্রকট। ভোঁতা পাহাড়গুলির গায়ে ঝোড়ো হাওয়া লেগে কেটে কেটে কেমন সরু সরু লালমাটির ফালি ঝুলছে, সেও তেমনি রুক্ষ। পথের ধূলার রঙও বাদামী।

কালী নদীর বিস্তীর্ণ বালুকাময় বুকের উপর দিয়ে মাইল দেড়েক সোজাসুজি গিয়ে পথ বেঁকে গেছে ডানদিকের গেরুয়া পাহাড়ের চড়াই পথে। আমরা এইখানে মুক্তিনাথের পথ ধরলাম। যদি সোজা কালী নদীর উপর দিয়ে আরও দেড়মাইল এগিয়ে যেতাম, তবে পৌঁছতাম কাগবেণীতে। কাগবেণী নাকি নেপালীদের শ্রাদ্ধের প্রকৃষ্ট স্থান, এদের গয়া। সুতরাং এটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু এখান থেকে মুক্তিনাথ যেতে কঠিন চড়াই-উঠতে হয়, তাই ফিরবার পথে কাগবেণী গিয়েছিলাম। কারণ তখন কঠিন উৎরাই পথে নামা ততটা খারাপ লাগবে না।

দুটি পথের এই সংযোগ স্থলে একটি নেপালী পরিবার ডালপালা, পাথর দিয়ে একখানা কুটির তৈরী করে বাস করেন। বন্ধু সেখানে বসে গেছে চা খেতে। তার নেপালী "দিদি" ঘরে ঢুকেছেন। চা তৈরী করতে। আমরাও একটু অপেক্ষা করে চা খেয়ে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ি।

এখনকার পথ ধীরে ধীরে চড়াই উঠেছে। আমরা সেই গেরুয়া

রঙের পাথরের পথে ক্রমাগত উঠে চলেছি। ঝুম্‌সুম্বার উচ্চতা ন'
হাজার ফুট, আর মুক্তিনাথের উচ্চতা তের হাজার পাঁচশো ফুট।
সুতরাং অনেকটা চড়াই উঠতে হবে এখোনো। বেশ কিছুদূর এগিয়ে
রুক্ষ বড় বড় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে পথ এঁকে বেঁকে গেছে। তারপরেব
অনেকটা জমি খোলা ময়দানের মত, ময়দানটি ছোটঘাস ও রুক্ষ
কাঁটাঝোপে পূর্ণ। এগুলি সব বুনো গোলাপ ও জুনিপার গাছ।
জুনিপার গাছ জ্বালালে কাঁচাও জ্বলে। আমরা ময়দান পথে তখনো
উঠেই চলেছি। অনেক নীচে সাদা বালুচরের মধ্যে কালীনদীর নীল-
ধারাগুলি এখন অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। আমরা ডাইনে বেঁকে
চলেছি, সেদিক থেকে মুক্তিনাথের নদী নেমে এসেছে। অত উঁচু
থেকেও নদীর সঙ্গম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যেন তুগাছি রূপালী সুতো একত্র
মিলেছে। তার পাশেই কাগবেণী গ্রামটি। তুরের ধূসর ও মেটে
পাহাড় ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। দাদা দেখান, ওই দেখ, নদীর
ওপারের পাহাড়ের গায়ে গুহার মত দেখা যাচ্ছে, আর ওই যে,
পাহাড়ের গায়ে পায়ে চলা পথের মত দেখতে পাচ্ছ, ওই গুহার মধ্যে
ঘরবাড়ী আছে। কৈলাশ-মানসসরোবরে যাবার পথে আমরা ওই
রকম গ্রাম দেখেছিলাম। এটি তিব্বতের বৈশিষ্ট্য।

ভীমবাহাতুর চড়াই উঠবার সময় বলেছিল, একঘণ্টা পর জলের
ধারা পাওয়া যাবে। কিন্তু বেলা বারোটা বেজে গেল, তবু অনেক খুঁজেও
পথের কোথাও জলের কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না। থাকবেই বা
কোত্থেকে—সবই যে শুকনো রুক্ষ পাহাড়! অগত্যা বুনো গোলাপের
ঝাড়ের ছায়াতে মাথাটা কোনক্রমে রোদ থেকে বাঁচিয়ে ঝুম্‌সুম্বা থেকে
আনা রুটি, আচার ও চা খেয়ে আবার পথ চলা সুরু করলাম। দলে
দলে ঝব্‌বু ও চমরী চড়ে বেড়াচ্ছে পথের ধারের ময়দানে। এই শুকনো
পর্বতগাত্রে ওরা কি খায় কে জানে!

পথ চলতে চলতে তুটি ঘোড়ায় চড়ামূর্ত্তি আমাদের ছাড়িয়ে নীচে
নেমে গেল। প্রশ্ন করে জানলাম, তারা মুক্তিনাথ থেকে নামছে।

মাইল তিনেক আরও চলবার পর আমরা পাহাড়ের বাঁকের মুখে মুক্তিনাথ গ্রামখানিকে দূর থেকে একটুখানি দেখতে পেলাম।

এখনকার পথে আর তত চড়াই নেই, ধীরে ধীরে উঠেছে পথ। শেষের দুই মাইল যেতে আবার চড়াই পেয়েছিলাম। কালকের মত আজকেও বেলা বাড়তেই প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া সুরু হয়েছে, পিছন থেকে বইছে এই যা রক্ষা। আমরা জামাকাপড় সামলাতে সামলাতে অতি কষ্টে এগিয়ে চলেছি। আমার সাড়ীর আঁচল পতাকার মত পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। এদিকে প্রচণ্ড রোদ্দুরে চোখ চাওয়া যায় না।

আরও এগিয়ে চলে, একটা পাহাড়ের বাঁক থেকে তিন চারটা গ্রাম দেখা গেল, তার সবশেষটা মুক্তিনাথ। বন্ধু বললে, আর মাইল দুই হবে, কার্যত অনেক বেশী। পাহাড়ের দেশে দূরত্ব বোঝা কঠিন। তাই ক্রমাগত হেঁটে চলেছি, গ্রামের ঘরবাড়ী বড় হচ্ছে, স্পষ্ট হচ্ছে, কিন্তু গ্রামগুলি আর কাছে আসে না। পথ কিন্তু বেশ ভাল। শেষ পর্যন্ত গ্রামের দেখা পেলাম। প্রচুর শস্যক্ষেত আছে গ্রামের চারধারে, একেবারে যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচ অবধি। তাই আবার পাহাড়ের উপত্যকার নীচ অবধি শ্যামল দেখাচ্ছে। সম্মুখের উপত্যকা মুক্তিনাথেই শেষ হয়ে গেছে। তার তিন দিক ঘিরে তুষার শৃঙ্গাবলী, পিছনে তাকালেও দূরে দুটি একটি উজ্জ্বল শিখর চোখে পড়ছে।

মুক্তিনাথের দুইমাইল আগের গ্রামখানির নাম ঝারকোট। ঝারকোটে একটা প্রকাণ্ড পুরণো বাড়ী আছে, ধসে পড়েছে, অনেকটা দুর্গের মত। খোঁজ করতেই জানা গেল, ঠিকই, ওটি ঝারকোটের প্রাক্তন রাজার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ঝারকোট খুবই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। প্রচুর চাষের ক্ষেত, বড় বড় ঘরবাড়ী আছে। স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা মাঠে-চাষের কাজ করছে, কুলায় করে শস্য ঝাড়ছে, ছেলেরা উদুখলে মশলা গুড়ো করছে। এই ধূসর পাহাড়ে দৃশ্যত: অনুর্বর জমিতে কতো রকমারি ফসল ফলেছে। বড় বড় পিপ্পল গাছের ছায়াঢাকা পথ এগিয়ে চলেছে।

সূর্য্যকুণ্ড (গোঁসাইকুণ্ড)

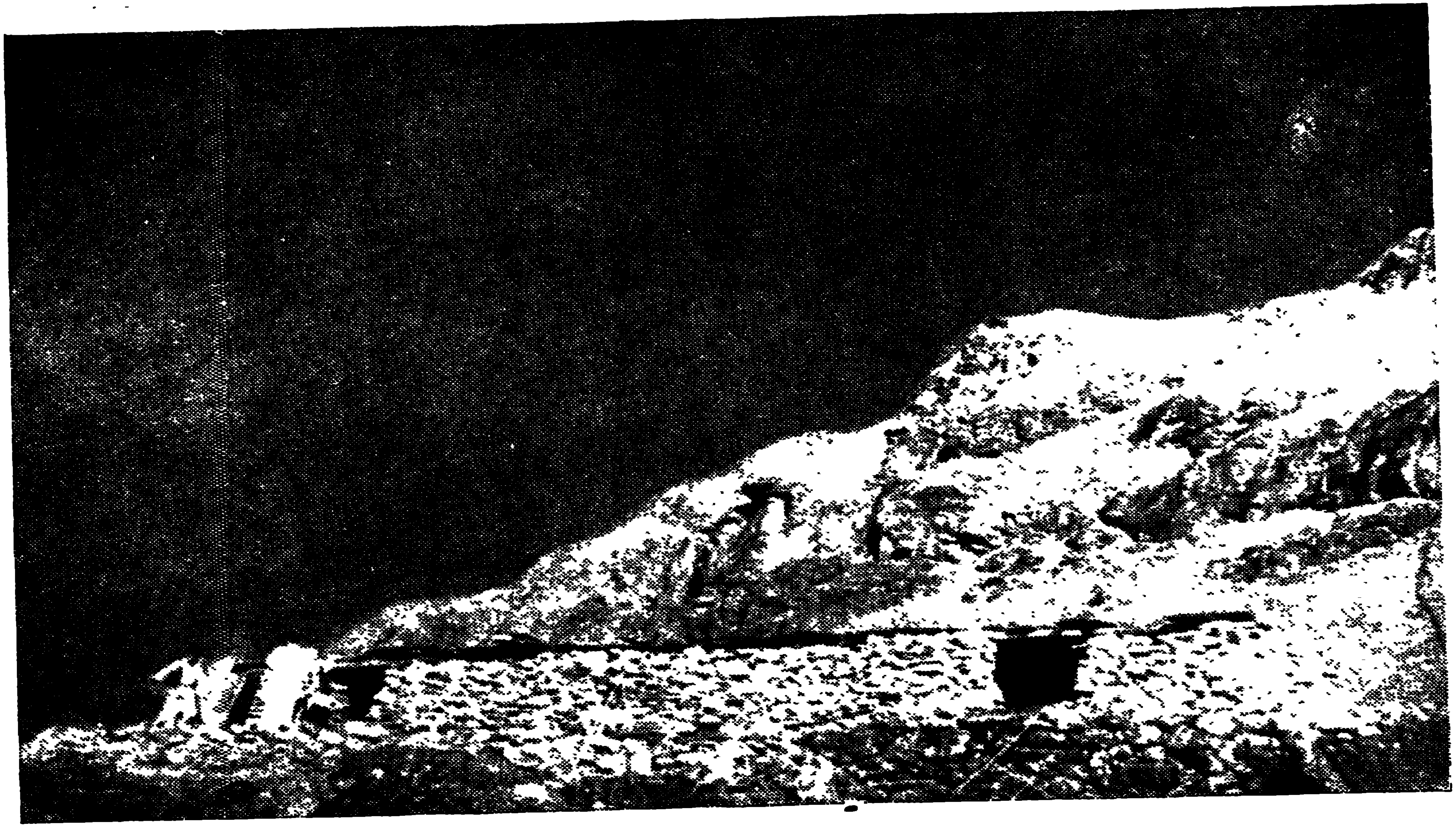

গোসাইকুণ্ডের একাংশ

পথের পাশের নালা দিয়ে তীব্রবেগে ঝরণার জল বয়ে চলেছে। এটি ইরিগেশন কেনাল। ঝারকোট পার হবার পর আবার বেশ খাড়া চড়াই পথ বয়ে উপরে উঠে গেলে দেখতে পাওয়া গেল মুক্তিনাথের সাদা সাদা ঘরবাড়ী—এখান থেকে স্পষ্ট দেখা গেলেও এখানো দুই মাইল দূরে। ওইতো ধর্মশালা, মন্দির, যাত্রী নিবাস, সব এক এক করে চোখে পড়ছে। ওখানেও চারিদিকে অজস্র পিপ্পল গাছ ছায়া বিস্তার করে রয়েছে ঘরগুলি ঘিরে।

আরও কিছুদূর এগিয়ে ওখানকার ইস্কুল। অনেকগুলি বাচ্চা পড়াশুনা করছে। তারা দল বেঁধে এসে ডাঃ বিশ্বাসের কাছ থেকে ইস্কুলের জন্য চাঁদা চেয়ে নিয়ে গেল।

মুক্তিনাথ পৌঁছাতে আমাদের পৌণে তিনটা বেজে গেল। প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বন্ধু মিনিট পনের আগে এসে পৌঁছেছে, উনি দাদার সঙ্গে আরও আধ ঘণ্টা পরে এলেন। আমাদের থাকবার জন্য যাত্রী-নিবাসের দরজা খোলা হলো। কোন লোকজন কোথাও নেই, অকথ্য রকম নোংরা পড়ে আছে। বন্ধু খুঁজে খুঁজে একজন লোক ধরে নিয়ে এসে ঘর সাফ্ করবার কাজে লাগাল। আমি বাইরে রোদ্দুরে পাথরে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। আঃ কি নিশ্চিন্তি!

দাদা আর ডাঃ বিশ্বাস এলেন সোয়া তিনটাতে। পথে সহকারী পূজারীর দেখা পেয়ে ধরে নিয়ে এসেছেন। সে নীচের গ্রামে যাচ্ছিল চিনি আনতে। আমাদের কাছে চিনি পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে উঠে এসেছে। সে-ও নিতান্ত অনিচ্ছাতে। আমাদের ধারনা, আমাদের দেখেই কাজের ভয়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু দাদা বড় কঠিন ঠাঁই, তাকে ধরে সাথে করে নিয়ে এসেছেন। তার সাহায্যে যাত্রী-নিবাস সাফ্ করে, বিছানা চৌকীর ব্যবস্থা করে আগুন জ্বালাবার জন্য কাঠ আনতে পাঠানো হলো।

যাত্রী-নিবাসের অবস্থা অতি শোচনীয়। স্যাঁতসেঁতে মেজে, টিনের ছাতে ধোঁয়া যাবার জন্য গোল করে মস্ত ছেঁদা করা, তার ভিতর দিয়ে

নীলাকাশ দেখা যাচ্ছে। জানালাগুলি বন্ধ করলেও ফাঁক থেকে যাচ্ছে, আর হুহু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। ভীম বাহাদুর ভিতরের উঠানের পাশে একটা ঢাকা বারান্দাতে রান্নার জায়গা করে নিয়েছে। ওরই একপাশে আগুনের ধারে তারা রাত্রে শোবে। ড্রাম চেয়ে নিয়ে তাতে ঝরণার জল ভরছে। শোবার ঘর গরম করবার জন্য আগুন জ্বালানো হলে আমরা তারই পাশে বসে আরাম করে গরম স্যুপ, বিস্কুট, আলুসেদ্ধ ও দাদার তৈরী খাঁটি দুধের কফি খাচ্ছি।

মুক্তিনাথ থেকে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। প্রায় চারিদিক গোলাকার করে ঘিরে অন্নপূর্ণা গিরিমালার উজ্জ্বল তুষার মৌলী শৃঙ্গরাজি শোভা পাচ্ছে। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে পিপ্পলগাছের ছায়া ঢাকা পথে মুক্তিনাথের ঝরণাটি কলগুঞ্জন করে নেচে নেচে বয়ে চলেছে। মুক্তিনাথের একটু উপরেই তার উৎস, পাহাড়ের মধ্য থেকে জলধারা নিঃসৃত হয়ে আসছে। কাগবেণীতে ওই ঝরণাটিকেই আমরা কালীগণ্ডকীতে মিশতে দেখেছি। এখানে আসবার সময় গ্রামের কাছে পথের পাশে দেয়ালের মত গাঁথনী করে তাতে অনেকগুলি ধর্মচক্র সারি সারি সাজানো দেখেছি—যেমনটি পথের প্রায় সর্বত্রই দেখেছি। প্রত্যেকটির গায়ে লেখা "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ"। ঘুরিয়ে দিলে বহুক্ষণ ধরে মিষ্টি আওয়াজ করে ঘুরতে থাকে। এখানে স্থায়ী বাসিন্দা খুব কম, বিশেষ করে শীত পড়া স্বরু হতে এবং দুর্গাপূজার মেলা শেষ হতেই সকলে নীচে নেমে গেছে। এদিকের সবচেয়ে বড় তীর্থ মুক্তিনাথ, তাই মেলায় ও উৎসবে অনেক জনসমাগম হয়। ভারতের ও নেপালের বহু দূর দূর দেশ থেকে লোক আসে তীর্থ পূজা করে পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়। কেবল তাই নয়, সুদূর তিব্বত থেকেও অনেক যাত্রী আসেন বলে শুনেছি।

মুক্তিনাথের মন্দিরের পূজার জন্য দুইজন পূজারী আছেন। একজন হিন্দু অন্য জন বৌদ্ধ, এমনটি অন্য কোথাও দেখিনি। নেপাল হিন্দু রাজ্য হলেও সর্বত্র বৌদ্ধ প্রভাব দেখা যায়, বিশেষ করে এই অঞ্চলটি

তিব্বতের কাছে বলে বৌদ্ধ প্রধান।

মুক্তিনাথের মন্দিরে নারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, অবিকাশ যেন বুদ্ধমূর্তি। কেবল চতুর্ভুজ। সোনা বা পিতলের তৈরী মূর্ত্তির উপর সোনার জল দেওয়া। পিছনে আছেন নাগরাজ বাসুকি, সহস্র ফণা বিস্তার করে। বামে লক্ষ্মী দেবী, ডাইনে আছেন নারায়ণের বোন। সাদা রঙ করা চৌকোণা মন্দিরটিতে কারু-কার্য্য বিশেষ নেই। সোনার চূড়া দূর থেকে কেবল জ্বলজ্বল করে মন্দিরের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। মন্দিরটি ঘিরে একশ আটটি ধারায় জল পড়ছে সর্বক্ষণ। ধারাগুলি মনুষ্যনির্মিত। মুক্তিনাথের ঝরণাটি থেকে নালাকেটে জল এনে ঐ একশ আটটি নলের মুখে বইয়ে দেওয়া হয়েছে। নলের মুখগুলি পিতলের তৈরী, কোনটি হাতির মুখ, কোনটি ঘোড়ার মুখ, কোনটি উটের বা ড্রাগনের মুখ। চারিদিকের বনে পিপ্পল গাছ ছাড়া বুনো গোলাপের গাছ অজস্র, তাতে ছোট ছোট লাল ফল ফলেছে। ফল ভরা গাছগুলি দেখতে বেশ, ফলগুলি খেতেও বেশ টকমিষ্টি।

বেলা পড়ে আসছে, শীতও বাড়ছে ক্রমশঃ। আমরা মুক্তিনাথে একটি দিন থাকবো, সুতরাং পূজারীর সহায়তায় চাল, আটা, শব্জী ও দুধের ব্যবস্থা করা হলো। কাঠতো আগেই আনানো হয়েছে। প্রচণ্ড শীত, আগুনের ধার থেকে নড়া যাচ্ছে না। বিছানাপত্রে মনে হচ্ছে কে যেন জল ঢেলে রেখেছে। এয়ার ম্যাট্রেসের উপর স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢুকেও শীতে হি হি করে কাঁপছি।

রাত্রে বাইরে বেরিয়ে খোলা আকাশের রূপ দেখে স্তব্ধ হয়ে থাকি। এ যে অলৌকিক, দেখে দেখে আশা যে আর মেটে না। গভীর নিকষ কালো আকাশে অগণ্য তারা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। সেগুলি যেন অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। মধ্যাকাশে কাল পুরুষ শোভা পাচ্ছে, উত্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবতারা। প্রতিটি নক্ষত্র যেন আলাদা করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে

যেন। চারিদিক ঘিরে নিকষ কালো পাহাড়ের শ্রেণী। শুভ্র তুষার শিখর গুলিকেও এখন কালো দেখাচ্ছে। মাথার উপর উজ্জ্বল নক্ষত্র শোভিত চন্দ্রাতপ। অদ্ভুত এক বিচিত্র দৃশ্য, এমনটি পাহাড়ের উঁচুতে ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি, ঘরে ঢুকবার কথা মনেও হয় না। তাছাড়া ওই-তো-ঘরের শ্রী! কিন্তু প্রচণ্ড শীতের জ্বালায় বাইরে বেশীক্ষণ থাকবার উপারই বা কই!

এগার

প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও মুক্তিনাথের প্রথম রাত্রিটি আমাদের ভালোই কাটলো। কেবল ডাঃ বিশ্বাস বলছেন, তাঁর নাকি শীতে ভাল ঘুম হয়নি। সকালে সূর্য্যালোক আসবার পরেও সেই হাড় কাঁপানো শীত কমতে চায় না। চারিদিকের ছোট ছোট ঝোপের পাতায় এবং ঘাসের ডগায় শিশির তুষার হয়ে জমে সাদা হয়ে আছে। কাল আসবার পথে একবার ঝারকোটের কাছে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল, কিন্তু সে বৃষ্টিতে জল পড়েনি, তুষারপাত হচ্ছিল। কিন্তু বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজ বাড়াতেই ঘাস ও গাছের পাতার তুষার গলে জল হয়ে মাটিতে মিশে গেছে। আবার বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝোড়ো হাওয়া সুরু হয়েছে। এত শীতে বড়ই পীড়াদায়ক। আজও আমরা এখানে রাত কাটাবো। বাইরে খোলা মাঠে পাথরে বসে বসে দেখি তুষার মৌলী অন্নপূর্ণা তার অপরূপ রূপরাজি নিয়ে গোলাকারে ঘিরে আছে। প্রভাত সূর্য্যালোকে শিখরগুলি আবার যেন হাসছে। দূরে দূরে নীচে পাহাড়ের গায়ে গ্রামগুলি ছবির মত দেখাচ্ছে। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে নীল ঝরণা বয়ে চলেছে, অপরূপ দৃশ্য।

স্নান সেরে নারায়ণের পুজো দিতে যাবার আগে রান্না সেরে নিলাম। আজ বিশ্রামের দিন, তাই একটু বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব

হলো। তাছাড়া আগুনের তাপে বসে থাকতেও মজা। সকলে মিলে ঝরণাতে স্নান, প্রচণ্ড শীত হলেও বেশ তৃপ্তি পাওয়া গেল। পূজারী পূজার সব আয়োজন করেই রেখেছেন। আমাদের সঙ্গে শুকনো ফল ও মিছরী ছিল, তাই দিয়ে পূজো দেওয়া হলো। সারাদিন বাইরে রোদ্দুরে বসে-শুয়েই বিশ্রাম করা। ঘুরে ঘুরে বেড়ানো, দিনটা মন্দ কাটলো না। বুড়ো শিশুর দল যেন আনন্দে আজ মশ্‌গুল।

দাদা বলছেন, সমস্ত পথটা দেখলে তো! পাহাড়ের সবটাই প্রায় ক্ষেতভরা। মনে হয় এই অঞ্চল খুব উর্বর তাই ফসল ফলে। নদী-বহুল পার্বত্যাঞ্চল জলদান করে সারা বৎসর নেপালকে উর্বর করে রাখে, তাই পর্বতমালার নাম অন্নপূর্ণা—অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা।

এই অঞ্চলে আছে মস্ত মস্ত কয়েকটি নদী, কালীগণ্ডকী, শ্বেত-গণ্ডকী, মিরিষ্টিখোলা, মার্সিয়ান্দী প্রভৃতি, আর আছে অগণ্য উপ-নদী। এই অঞ্চল তাই এত সমৃদ্ধ হয়েছে। সার্থক অন্নপূর্ণা নাম-করণ!

বিকালে সকলে মিলে পাতালগঙ্গা ও জওলাদেবীর মন্দির দেখতে গেলাম। মুক্তিনারায়ণের মন্দিরের অনতিদূরে জওলা মায়ের মন্দির। মধ্য পথে একটি ঝরণা, অন্তঃসলিলা বয়ে চলেছে। পাহাড়ের বুকের ভিতর দিয়ে ঝরণার জল বয়ে যাবার শব্দ কান পেতে শোনা যায়। ওরা বলে পাপীরা শুনতে পায় না সে শব্দ। আমরা কেউ পাপী নই তাহলে! ঐ ঝরণার পূতবারি নেবার জন্য কেবল একটি স্থানে গর্ত করা আছে। এই ধারার নাম পাতালগঙ্গা। আমরা পাতালগঙ্গার পবিত্রজল বোতল পুরে নিয়ে নিলাম, বাড়ী নিয়ে যাবো।

জ্বওলা দেবীর মন্দির বলে পরিচিত, কিন্তু আসলে এটি একটি বৌদ্ধ মনাষ্টারী। মন্দিরের ভিতর পাথরের মস্ত বেদীর উপর বুদ্ধ-দেবের বিশাল একটি স্বর্ণময় মূর্তি স্থাপিত। পূজারী তিব্বতী বৌদ্ধ। মন্দিরে নানারকম ছবি, পট আছে। দেয়ালে ফ্রেস্‌কো পেন্টিং। ঠিক যেমনটি যে কোন বৌদ্ধ মনাষ্টারীতে দেখা যায়। মূর্তির সামনে

শত শত প্রদীপ জ্বলছে। মন্দিরের মেজেতে মূর্তির বেদীর নীচে তিনটি ছোট্ট গুহার মত গর্ত আছে—সেখান দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ গ্যাস বের হচ্ছে, তাই সেখানে জ্বলছে। ঠিক যেমনটি আছে জ্বালামুখীর মন্দিরের ভিতর। তাই জ্বওলামায়ী নাম। আগুনের পিছনে একটি লুকায়িত ঝরণার ধারা বয়ে চলেছে। হাত দিয়ে দেখলাম, তার জল তুহিন শীতল। আগুনের তাপে একটুও গরম হয় নি। প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা।

মুক্তিনাথ পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রাম, এই উপত্যকারও এখানে শেষ। পাহাড়ের উপর আরো কয়েক শ' ফুট উঠলেই যেন চূড়াতে পৌছানো যাবে। ধসা পাহাড় নেমে এসেছে মন্দিরের পিছন অবধি। পাহাড়টির গায়ে ডানদিকের পথ ধরে এগিয়ে পাহাড়টিকে ডিঙোলে একটি গ্লেসয়াল হ্রদ পাওয়া যাবে। তার নাম দামোদর কুণ্ড। এটি কালীগণ্ডকীর একটি উৎপত্তি-স্থল বলে পরিচিত। কিন্তু এখান থেকে দামোদর কুণ্ডর দূরত্ব কেউ সঠিক বলতে পারছে না। দামোদর কুণ্ডে অজস্র শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। এগুলি শিলীভূত সামুদ্রিক প্রাণী বা ফসিল। কোটী কোটী বছর আগে হিমালয়ের অস্তিত্ব ছিল না। তারপর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে সমুদ্র থেকে হিমালয় মাথা তুলে ওঠে। এত উঁচুতে এই ফসিলের অস্তিত্ব দেখে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের খুব ইচ্ছা ছিল এই দামোদর কুণ্ডে যাবো কিন্তু ওপথে যাবার কুলি সংগ্রহ করা গেল না। এই পথে তিব্বতী বা ভোটিয়া কুলি ছাড়া কেউ যেতে চায় না। তাছাড়া এখনকার অনিশ্চিত অবস্থা, প্রায়ই ডাকাতি বা রাহাজানি হয়, তাই ওপথে যেতে কোন নেপালী কুলিও রাজী হলোনা। আরও একটা কারণ, আমাদের আসতে দেরী হয়ে গেছে, বেশঠাণ্ডা পড়ে গেছে ইতিমধ্যে, শীঘ্রই তুষারপাত হবার সম্ভাবনা। তাই এবারকার মত আমরা দামোদর কুণ্ডের আশা ত্যাগ করলাম। এপ্রিল মে মাসে যাওয়া অসম্ভব নয় বলে সকলে জানালেন। অগত্যা এখানে

কয়েকজন ভোটিয়ার কাছ থেকে সংগৃহিত শালগ্রাম শিলা কিনে নিলাম।

একটি দিন পরমানন্দে কাটিয়ে পরদিন ফিরবার তোড়জোড় সুরু করেছি সকাল হতেই। ফিরবার পথের যাত্রী হলেও আর দুঃখ বা আফশোষ নেই। আজও চারিদিকের শ্যামল মুক্তিনাথ তার অপার সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের বাইরে আবাহন করে। নির্মেঘ নীলাকাশের চন্দ্রাতপতলে উজ্জ্বল হয়ে চারিদিক ঘিরে আজও তেমনি অন্নপূর্ণার তুষারশুভ্র শৃঙ্গাবলী শোভা পাচ্ছে, তার রূপের যেন সীমা নেই। নীরব নিস্তব্ধতা হরণ করে ঝরণা কুলুকুলু শব্দে বয়ে যায়, বাতাসে মর্মর ধ্বনি শোনা যায়। 'মুক্তিনাথ জী কি জয়'' ! ধ্বনি দিয়ে আমরা চলা সুরু করলাম। সবাই বেশ তৃপ্তিভরা মন নিয়ে চলেছি। ফিরবার পথে আজ আমরা কাগবেণী হয়ে ফিরবো। আসবার সময় পথে সেখানে একদল ঘোড়সোয়ারের দেখা পেয়েছিলাম। সেই ময়দানের পরই নীচের দিকে খাড়া উৎরাই পথ নেমে গেছে, সেই পথেই চলেছি। অত উঁচু থেকেই চারিদিকের শস্যক্ষেত ঘেরা গ্রামখানি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গ্রামটির দুদিকে দুটি নদী, কালীগণ্ডকী ও মুক্তিনাথের ঝরণা। আরও দূরে নদীর শুভ্র বেলাভূমিরও ওপারে স্তরে স্তরে রুক্ষপর্বতমালার সারি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেন ধোঁয়াটে হতে হতে আকাশের সাথে একাকার হয়ে মিশে গেছে। পাহাড়গুলির চূড়াও কেমন ভোঁতা ভোঁতা।

আজও বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া সুরু হয়েছে। আজ সম্মুখ থেকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে। চলবার পথের আজ মস্ত বাধা! প্রায় হাজার খানেক ফুট একটানা কঠিন উৎরাই বেয়ে নেমে আমরা ঝরণার ধারে পৌঁছলাম। উৎরাই শেষ হতে হতেই শস্য ক্ষেতের সুরু, গোলাপী রঙের ফুলে রঙিন হয়ে আছে ক্ষেতগুলি। তারই মাঝখান দিয়ে সরু আলপথে চলে ঝরণার তীরে পৌঁছলাম। বন্ধু এগিয়ে গেছে! দূর থেকে দেখছি নদীর সঙ্গমে বহু লোক জড়

হয়ে কি যেন করছে। বন্ধু এগিয়ে তাই দেখতে গেছে। আমি ঝরণার তীরে ওর জন্য অপেক্ষা করি। ও ফিরলে কাগবেণীতে ঢুকবো।

ফিরে এসে বন্ধু বলে—"যা ব্যপার দেখলাম, সে ভীষণ কেবল নয় বীভৎস! একটি ছোট ছেলে মারা গেছে, তার সৎকার হচ্ছে ওখানে, ওই নদীর সঙ্গমে। ছেলেটির মৃতদেহের গলায় একটুকুরো রশি বেঁধে সেই রশির প্রান্ত ধরে একটু দূরে দুজন লোক বসে আছে, সম্ভবতঃ তারাই তার নিকটতম আত্মীয়। আর মৃত দেহটিকে শত শত শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কয়েকটা শকুন মাথার উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। দেহের প্রায় সবটাই খাওয়া হয়ে গেছে। বীভৎস দৃশ্য! সে চোখে দেখা যায় না। আমি তো পালিয়ে এসেছি। আপনারা যাবেন না যেন ওখানে।"

কাগবেণী গ্রামটি খুব ছোট নয়। দেখতে অনেকটা পাথরের তৈরী দুর্গের মত। ঝরণার উপর পাতা দুখানি গাছের মোটা গুঁড়িতে পা রেখে পার হয়েই গ্রামের রাজপথ পাওয়া গেল। দুজন ঘোড়-সোয়ার পাশাপাশি চলতে পারে এমন চওড়া। একজন গ্রামবাসীর নির্দ্দেশে আমরা সেই পথে এগিয়ে চলেছি। পথ নয়, সে যেন সুড়ঙ্গ—দুপাশে পাথরের দেয়াল। মাথার উপর পাথরের ছাদ। দুদিকের ঘর বাড়ী সদর রাস্তার মাথার উপর মিশে গেছে। সদর পথের উপরের ছাদে লোকজনের চলা ফেরার আওয়াজ পাচ্ছি। মনে মনে ভাবি, বই-এ বাগদাদ সহরের যেমন বর্ণনা পড়ি, সে বুঝি এমনি! পথে একটু এগোতেই গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেলাম, যেন রাত্রির মধ্যযাম। ঐ অন্ধকার গলিপথে বীরদর্পে বন্ধু এগিয়ে চলেছে, আর তার পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে আমাকে চলতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও কেবল মোড়ের মাথায় উপরকার ছাদে ছোট্ট ছেঁদা করা। সূর্য্যের আলো অতি কৃপণের মত সেই পথে প্রবেশ করছে। সেই স্বল্পালোকিত পথে, কোথাও ঘন অন্ধকারে কেবল পদশব্দ লক্ষ্য করে অত্যন্ত ভয়ে

ভয়ে চলা। মাঝে মাঝে তা-ও যখন হারিয়ে ফেলছি, ভয়ে বুকের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে। গলির পাশের দরজা খুলে যদি কেউ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে এসে পড়ে, আমার যে চেঁচাবারও সাহস থাকবে না। প্রাণের দায়ে এমতাবস্থায় থেমে প্রাণপণে "বন্ধু", "বন্ধু" বলে চেঁচাচ্ছি। বাপরে কি দেশ!

বন্ধুর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। কার নির্দ্দেশে জানি না সে ওই অন্ধকারে ক্রমাগত এগিয়েই চলেছে, আর মাঝে মাঝে "এইযে! আসুন!" বলে সাড়া দিয়ে তার অবস্থিতি ঘোষণা করছে। কিন্তু থামবার কোন লক্ষণ নেই তার। ভয়ে ভয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি! কোথায়? ডাঃ বিশ্বাস আর দাদার কোন পাত্তাই নেই!

প্রায় মিনিট দশ পনের হেঁটেছি, মনে হোলো যেন কত যুগ যুগান্তর বুঝি কেটে গেছে। এমনি গলি পথে চলে শেষে একটা উন্মুক্ত উঠানে পৌঁছানো গেল। এটি গ্রামের শেষ প্রান্ত, সুড়ঙ্গেরও শেষ। উঠান ঘিরে দেয়াল, তারপর শস্যক্ষেত, শস্যক্ষেতের পর নীলাঙ্গ কালীগণ্ডকীর শুভ্রবেলা ভূমি।

বন্ধু কোন্ অদৃশ্য মানবের নির্দ্দেশে এতক্ষণ চলেছিল জানি না, কিন্তু এতক্ষণে এই ভুতুড়ে রাজ্যে কয়েকজন জলজ্যান্ত লোকের দেখা পাওয়া গেল। তাদের ভাষা বুঝি না, দেখতে তারা নেপালীদের মতও নয়। মনে হয় তিব্বতী বা ভোটিয়া। বন্ধু এতক্ষণ আমাকে গ্রাহ্য না করে চলেছে, কিন্তু এখন কয়েকটি মেয়ের সামনে এসে পড়ে আমাকে সামনে এগিয়ে দেয় কথা বলার জন্য।

"মামীমা! যান না, বলুন না, আমাদের জন্য ভাত রেঁধে দিতে পারবে কিনা।"

এবার আমি এগিয়ে আসি। অনেক কষ্টে হাত মুখ নেড়ে ইসারা ইঙ্গিতে তাদের বুঝিয়ে দিলাম, আমরা ক্ষুধার্ত, খাবার চাই।

কয়েকটি সুশ্রী বলিষ্ঠ তরুণী খাবার তৈরী করে দিতে রাজী হোলো। তারা ইঙ্গিতে তাদের ঘরে এসে বসতে বলল। কাঠের মই-এর মত

চার পাঁচটি সিঁড়ি দিয়ে উঠে পাথরের ও কাঠের তৈরী ঘরে ঢুকলাম। নেপালী বা তিব্বতী ঢঙে ঘরের চারিদিকে লম্বা করে সরু গালিচা বিছানো। এই লম্বা টানা আসনের সামনে অনেকগুলি ছোট ছোট জলচৌকী পাতা, তারই উপর থালা রেখে খাওয়ার ব্যবস্থা। সম্মুখে, ঘরের মাঝখানে উনানে আগুন জ্বলছে, তার পাশে বড় উঁচু আসন। অন্য ধারে কাঠের তৈরী তাকের উপর বাসনপত্র, খাদ্যদ্রব্য সাজানো। ঘরের ঠিক মাঝখানে ছাদ থেকে ঝোলানো দড়ির দোলনাতে একটি ছোট বাচ্চা ঘুমাচ্ছে।

মেয়েদের মধ্যে একজন রান্নার ভার নিয়ে বাসনপত্র সাফ্ করতে লাগল, তাকে সাহায্য করতে গেল আর একটি যুবতী। ভাণ্ডারে কি খাদ্য আছে জানি না, অনেক কষ্টে আলুভাতে ভাত ও ঘরে তৈরী মাখন জ্বালিয়ে ঘি ও কিছু দুধ সংগ্রহ করা গেল।

একজন নেপালী এসে ঘরে বসে হিন্দিতে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। সে ব্যবসা করে, সেই উপলক্ষ্যে কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, বেনারস ইত্যাদি দেখেছে। মেয়েদের একজন একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ি থেকে কি একরকম ঘোলাটে পানীয় এনে তাকে খেতে দিলে, একটু পরে তার গন্ধে বুঝলাম, সেটা মদ।

আরও কয়েকটি লোক ঘরে ঢুকলো, আসনে বসে পড়ে তারা মেয়েদের দেওয়া মদ খেতে লাগলো। আমার তো চক্ষু চড়কগাছ! এ কোথায় নিয়ে এসেছে বন্ধু?

খানিক পরে দুটি মেয়ে এলো, প্রত্যেকের পিঠ বোঝাই কাঠ, কোথা থেকে কেটে এনেছে। ঘরের মধ্যেই মই লাগানো, মই বেয়ে একজন ঘরের ছাদে উঠে গেল, কাঠগুলি রোদে শুকাতে দেবে।

শুড়িখানায় বসে আমার আর অস্বস্তির সীমা নেই। এমন জায়গায় এসে পড়বো স্বপ্নেও ভাবি নি। তবে ওরা কিন্তু আমাদের সঙ্গে বেশ সদ্ব্যবহার করেছে। অতি যত্নসহকারে আমাদের খেতে দিল। কিন্তু খাওয়া হয়ে যাবার পর ডাঃ বিশ্বাস যখন ওখানেই শোবার

উদ্যোগ করছেন, তখন আমি অত্যন্ত সহজ বাংলাতে ওঁকে কড়াভাবে বলি—"এখানে আর নয়! অনেক হয়েছে! এবার রাস্তায় গিয়ে নদীর ধারে পাথরে শুয়ে বিশ্রাম করবে চলো।"

তাড়া দিয়ে পয়সা মিটিয়ে সবাইকে ঘরের বের করে তাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমরা আবার সুড়ঙ্গ পথে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।

গ্রামের সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে নদী পার হতেই একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। সেই যে যেখানে আমরা কালীগণ্ডকীর ধার ছেড়ে মুক্তিনাথের চড়াই পথ ধরেছিলাম, সে সেইখানকার কুটিরের গৃহিনী। আমাদের দেখেই তিনি চিনেছেন, সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। ওর ঘর এখান থেকে দেড় মাইল দূরে।

গ্রামের বাইরে চলতে চলতে নদীর বুকে বালুর উপর কয়েকজন লোককে গুটিগুটি মেরে বসে থাকতে দেখা গেল। এগিয়ে দেখি, তারা আমাদেরই ভীমবাহাদুরের দলবল। চুপ করে আমাদের অপেক্ষাতে বসে আছে।

আমাদের দেখে ওরা বলে, কাগবেণী তিব্বতী গাঁও, তাই আমরা সেখানে ঢুকিনি। ওখানে মস্ত মস্ত ভোটিয়া কুকুর আছে, আমাদের দেখলে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। একথা কিন্তু আমাদের আগে জানায় নি।

দেড় মাইল দূরের ঘরের গৃহিনীর সাথে তার ঘরে গিয়ে চা খাওয়া, দুপুরের বিশ্রাম, দুটোই হলো। আবার পুরাতন পথে ফিরে চলা।

আবার ঝুম্‌ঝুম্‌বা। ওই পথেই হেঁটে ছয়দিন পর আমরা পোখারা ফিরে এলাম। দানার পর অন্য একপথে 'বাদলুঙ্‌' হয়ে আসা সম্ভব ছিল, এই পথ সরল হলেও দূরত্ব বেশী বলে আমরা আর চেষ্টা করলাম না। ওপথে এলে রিডিতে একটা বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার দেখা হতো, সেটিও নেপালের একটি বিখ্যাত তীর্থ। কুলিরাও আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করছে না, ভীম তাদের সামলাতে পারছে না কিছুতেই, এটাই অবশ্য প্রধান কারণ।

পোখারাতেই হলো এবারকার মত আমাদের হাঁটা পথের শেষ।

এখান থেকেই আমরা কাঠমাণ্ডু গেলাম। কাঠমাণ্ডু উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম, তবু মুক্তিনাথের দুর্গম পথের দেড়শো মাইল হেঁটে যে আনন্দ পেয়েছি তা কখনো ভুলবার নয়। বিরাট তুষার মৌলী দুটি শৈলমালা অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা ও সার্থকনামা ধোলা-গিরি বা ধবলগিরির মধ্য দিয়ে বিরাট চওড়া কালীগণ্ডকীর অন্তহীন রূপ দেখতে দেখতে চলে পথের যে অলৌকিক সৌন্দর্য্যের স্বাদ পেয়েছি, সে স্বাদ এখনো ভুলতে পারছি কই?

গোসাঁইকুণ্ড

এক

পুরাকালে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তুলে আনলেন দেবতা ও দানবেরা একত্র হয়ে। মন্থনের দণ্ড হলো মন্দার পর্বত ও মন্থন-রজ্জু হ'ল বাসুকি নাগ। সহস্র বৎসর ধরে ক্রমান্বয় মন্থনের ফলে বাসুকির মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে কালকূট নির্গত হলো। বিষের প্রভাবে সৃষ্টি যায় যায়। দেবতারা বিপদাপন্ন হয়ে দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হলেন। দেবাদিদেব মহাদেব সেই বিষ গ্রহণ করে কণ্ঠে ধারণ করে "নীলকণ্ঠ" হলেন। কিন্তু কালকূটের প্রভাবে তাঁর দেহে যে প্রচণ্ড গাত্রদাহ হলো, সেই জ্বালা প্রশমিত করবার জন্য মহাদেব তাঁর হস্তস্থিত ত্রিশূল দিয়ে হিমালয়ের বিশাল প্রস্তরবক্ষ বিদীর্ণ করে জল আনয়ন করলেন। জল জমে এক বিশাল কুণ্ডের সৃষ্টি হলো। সেই কুণ্ডের শীতল জলে প্রশমিত হলো দেবাদিদেবের গাত্রদাহ। কুণ্ডের নাম হলো তাই "গোসাঁইকুণ্ড"। নেপালীদের মতে গোসাঁইকুণ্ডের সৃষ্টির রহস্য হলো এই। এরা একে "নীলকণ্ঠ হ্রদ"ও বলে। সেই গোসাঁইকুণ্ড দেখতে দেখতে চলেছি।

নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর উত্তরে বিশাল পর্বতমালা ল্যাংট্যাং হিমল। তারই কিছু দক্ষিণে হিমালয়ের সুউচ্চ প্রদেশের তুষারাঞ্চলের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আছে গোসাঁইকুণ্ড, গোসাঁইথান শিখরের পাদদেশে। এই গোসাঁইথান নেপালের অন্তর্গত হিমালয়ের একটি

শিখর। পৃথিবীখ্যাত গোসাঁইথান (উচ্চতা ২৬,২৯১ ফুট) আরও উত্তরে তিব্বতের অন্তর্গত। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশীয় পর্বতারোহী Hsu Ching এই দুর্গম শিখরটিতে আরোহন করতে সমর্থ হন।

নেপালীরা বলে, গোসাঁইকুণ্ড এলাকাতে একশ আটটি কুণ্ড আছে। সমস্ত এলাকাটি ঘুরে দেখিনি। সর্ববৃহৎ হ্রদটিতে যাতায়াতের পথে আমরা দশটি কুণ্ড দেখতে পেয়েছিলাম। সবগুলি কুণ্ডই ১৬৫০০ হাজার—১৭০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত, হিমবাহ সৃষ্ট বিভিন্ন আকারের স্বাভাবিক হ্রদ।

আমরা ট্রেনে কলকাতা থেকে পাটনা হয়ে সেখান থেকে এরোপ্লেনে কাঠমাণ্ডু গেলাম। কাঠমাণ্ডুর ট্যুরিষ্ট অফিসে খোঁজ করে খবর সংগ্রহ করতে হলো। পথের নিশানা, দূরত্ব, মালবাহক কুলি, সবেরই ব্যবস্থা ওখানেই করতে হবে।

ট্যুরিষ্ট অফিসে ঢুকেই মিঃ জগদীশ মানসিং-এর সাথে আবার দেখা। উনি এখন এখানকার একজন ট্যুরিষ্ট অফিসার। এঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় পোখারাতে গত বৎসরে মুক্তিনাথের পথে। ইনি তখন পোখারার ট্যুরিষ্ট অফিসার। তাদের সঙ্গে খানিকটা সখ্যতাও হয়ে গিয়েছিল। তাই মিঃ মানসিংকে দেখে আমরা সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। তিনি বললেন, বহুকাল আগে তিনি একবার গোসাঁ-কুণ্ডে গিয়েছিলেন, তাঁর সব কথা স্মরণে নেই। তবে খাতাপত্র দেখে আমাদের পথের মোটামুটি একটা ম্যাপ এঁকে দিলেন এবং যথাসম্ভব বর্ণনাও দিলেন।

প্রস্তুতিপর্ব বলতে অতি সংক্ষিপ্ত। মোট দশ বারোদিনের হাঁটা পথ। পথে খাদ্য বা থাকবার কোনরকম সুবিধা কিছুই পাওয়া যাবে না। সুতরাং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সব জিনিষ সংগ্রহ করে মাল বাহকের পিঠে চাপিয়ে নিতে হবে। পথে দুই তিনটি দিন কেবল গ্রাম পাওয়া যাবে, সেখানে থাকবার স্থান মিলবে, কিন্তু বাকি ক'দিনের পথে গ্রাম নেই, অর্থাৎ বারো হাজার, সাড়ে বারো হাজার ফুটের

উপর লোকালয় নেই, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু সেখানেও কোথাও কোথাও ভেড়া চরাবার কালে পাহাড়ের উপরে রাত কাটাবার জন্য তৈরী কুটির বা খুপড়ী আছে। সেইসব খুপড়ীতে মাথা গোঁজবার আস্তানা মিলবে। এইসব খুপড়ীগুলি সাধারণতঃ জলের ধারেই তৈরী করা হয়, তাই ঘর পেলে জলের সমস্যাও মিটবে। কোথাও কোথাও রাত্রিবাস করবার যোগ্য পাহাড়ের গুহাও পাওয়া যাবে, তবে তাঁবু সঙ্গে থাকলে সবচেয়ে ভাল।

আরও একটি সুসংবাদ দিলেন, সম্প্রতি ওদিকের জঙ্গলে একটা নরখাদক নেকড়ে বাঘ বেরিয়েছে। ইতিমধ্যে সাতজন লোকের প্রাণ হানির সংবাদ পাওয়া গেছে। আমরা যেন সর্বদা সাবধানে চলাফেরা করি।

কাঠমাণ্ডু থেকে গোসাঁইকুণ্ড যাবার দুটি হাঁটা পথ আছে। প্রথমটি কাঠমাণ্ডুর পূর্বে সুন্দরীজল হয়ে, অন্যটি কাঠমাণ্ডুর উত্তরে ত্রিশূলী বাজারের পথে। ত্রিশূলী বাজারের উচ্চতা ২,৫০০ ফুট প্রায়, এবং সুন্দরী জলের উচ্চতা ৬০০০ ফুট। তবু ত্রিশূলী বাজারের পথ সর্বসম্মতভাবে সহজ, যদিও এপথে অনেক বেশী চড়াই উঠতে হবে। আমরা স্থির করলাম, সুন্দরীজল হয়ে যাবো এবং ত্রিশূলী বাজারের পথে ফিরবো। তাহলে দুটো পথই আমাদের দেখা হবে।

কুলির হদিশ মিঃ মানসিং দিতে পারলেন না। বললেন, হিমালয়ান সোসাইটি কুলির বন্দোবস্ত করে দিতে পারে। হিমালয়ান সোসাইটিও এখন ভালভাবে সক্রিয় নয়। তবু সেখানে যে লোকটিকে পাওয়া গেল, সে-ই কুলির ব্যবস্থা করে দিল।

কাঠমাণ্ডু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, বোধনাথে যে লামা থাকেন, "চিনিয়া লামা", তিনি এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। চিনিয়ালামা গোঁসাইকুণ্ডের নিকটস্থ অঞ্চল হেলম্বুর অধিবাসী, সেখানকার রাজা বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ অঞ্চলে তাঁর প্রতাপ প্রচণ্ড। তিনি ভাল কুলি সাথে দিতে পারবেন। কিন্তু হিমালয়ান

সোসাইটি থেকে লোক আগেই পেয়ে গেলাম, তাই আর চিনিয়ালামার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হলো না।

মিঃ মানসিং আরও বললেন, এখন গোঁসাইকুণ্ডে তীর্থ যাত্রার সময় নয়। যাত্রার সময় হলো রাখী পূর্ণিমার দিন, ঐদিন গোঁসাইকুণ্ডের সকল যাত্রীর হাতে মন্ত্রপূত হলদে রাখী বেঁধে দেন পুরোহিত। জুলাই—আগস্ট মাস তখন, বৃষ্টি থাকলেও বরফ পরে না, পথে কোথাও বরফ পাওয়াও যায় না। একটু শীত পড়তে সুরু করলেই বরফ পড়াও সুরু হয়। যাত্রার সময় বহু লোকজন যায়, সাময়িক দোকানপাঠও বসে। তাছাড়া গবর্ণমেণ্ট থেকে কিছু কিছু অস্থায়ী ঘরও তৈরী করে দেওয়া হয়। এখন সেসব সুবিধা পাওয়া যাবে না। তাঁবু সঙ্গে থাকলে কোন কথাই নেই। আমরা কলকাতা থেকে মোটামুটি সব জিনিষপত্র সংগ্রহ করেই নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বোধে এবার তাঁবু আনিনি। কাঠমাণ্ডুতে সংগ্রহ করাও সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া এখন দেরী করতেও মন সরছে না। তাই জগদীশবাবুর পরামর্শমত গুহা ও কাউশেডের (cowshed) ভরসাতেই রওনা হয়ে পড়া গেল।

দুই

১১ই অক্টোবর ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ : প্রত্যুষে হোটেল ছেড়ে একটা জীপে যাবতীয় মাল চাপিয়ে নিয়ে আমরা তিনজন যাত্রী, আমার স্বামী ডাঃ বিশ্বাস, ভাগ্নে "বন্ধু" ও আমি, এবং চারজন মালবাহক যাত্রা করলাম। জীপ চললো পূর্বের দিকে নেপালের বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ বোধনাথ হয়ে গোকর্ন, তারপর সোজা উত্তরে সুন্দরীজলের দিকে। গোকর্নতে গোকর্নেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে, প্যাগোডা ধরণের মন্দির। কাঠমাণ্ডু থেকে আটমাইল দূরে সুন্দরীজল। এ পর্যন্ত চমৎকার বাঁধানো চওড়া রাজপথ। কাঠমাণ্ডুর পর্বতঘেরা শ্যামল উপত্যকার মধ্যে আঁকাবাঁকা লালরঙের পথে গাড়ী চললো। এটি মহারাজার সংরক্ষিত বন (Royal game sanctuary)। সম্মুখে এগিয়ে আসছে পার্বত্যাঞ্চলের বন্ধুর প্রদেশ। সুন্দরীজল থেকে হাঁটা পথের সুরু। এখানে বিরাট বিরাট কয়েকখানা সুদৃশ্য দালানের সম্মুখে জীপ আমাদের নামিয়ে দিল। এই ঘরবাড়ীগুলি সুন্দরীজল ওয়াটার ওয়ার্কস্-এর। এটি ভারত গবর্নমেণ্ট তৈরী করে দিয়েছেন, নেপালের সঙ্গে বন্ধুত্বের নমুনা হিসাবে। মাত্র কয়েকদিন আগেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এটির উদ্বোধন করেছেন। বাগমতী নদীতে বাঁধ বেঁধে তৈরী করা হয়েছে জলাধার। সেই জল পরিশ্রুত করে মোটা পাইপ দিয়ে নীচে এনে কাঠমাণ্ডুর সর্বত্র সরবরাহ করা হচ্ছে।

ভোরে যাত্রার আয়োজনের তাড়াহুড়াতে আমাদের প্রাতরাশ করা হয়নি। বিশেষ করে কুলিরা জমায়েত হতে দেরী করাতে আমাদের রওনা হতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। তাই এখন খানিকটা চড়াইপথে উঠে সুন্দরীজল গ্রামে পৌঁছে পথের ধারে একখানা পরিচ্ছন্ন দোকানে বসে পড়েছি সবাই। চা, দুধ, নিমকি ও প্যাঁড়া দিয়ে জলযোগ করে নিয়ে এবার হাঁটাপথে যাত্রা সুরু করা গেল।

এখনকার পথ কেবল পাথরে বাঁধানো চওড়া সিঁড়ি। সেই সিড়ি যেন অন্তহীনভাবে উঠেই চলেছে। সিঁড়ির ডানদিকে একটানা নেবে গেছে মস্ত মোটা কালোরঙের জলের পাইপ, কাঠমাণ্ডু সহরের জন্য জল বহন করে। তারপাশেই বাগমতী নদী উচ্ছলরূপে বয়ে চলেছে।

খানিকটা উঠে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, দূরে সুন্দরীজলের ঘর-বাড়ীগুলি গাছপালার মধ্য দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। আরও দূরে কাঠমাণ্ডু উপত্যকা, বাগমতী নদী সেই উপত্যকার বুক চিরে বয়ে চলেছে, যেন সরু রুপালী ক্ষীণধারা। দিগন্তরেখাতে ধূসর পর্বতমালার সারি প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে কাঠমাণ্ডুর চতুর্দ্দিক ঘিরে যেন পাহারা দিচ্ছে।

আরও কিছুটা উঠতেই সুন্দর একটা ঝরণা পাওয়া গেল, ঘাটখোলা নদী। পথের বাঁদিকে উঁচু থেকে নেমে এসে বাগমতীর জলের ধারার সঙ্গে মিশেছে। বাগমতীর রূপও এখানে অতি অপরূপ, উচ্ছলা ঝরণার ধারা কলস্বরে বয়ে চলেছে। দুটির মিলন ক্ষেত্র আরও অপরূপ।

সিঁড়ি—সিঁড়ি—সিঁড়ি। একটানা সিঁড়ি উঠেই চলেছি। পথের ধারে বনের মধ্যে গাছের আড়াল থেকে একখানা সুন্দর ঝক্‌ঝকে বাড়ী উঁকি দিচ্ছে। ওয়াটার ওয়ার্কসের আরেকটি অফিস। আর একটু এগিয়ে দেখি বিশাল চৌবাচ্চার মত অর্দ্ধবৃত্তাকার জলাধারে জল সঞ্চয় করা। জলাধারের পাশে একটা সরু পোল পার হয়ে আবার চড়াই পথ উঁচুতে উঠে গেছে। এখন আর সিঁড়ি তেমন নেই, তবে তেমনি খাড়া চড়াই, পাহাড়ে ধাপকাটা আছে কোথাও, কোথাও তাও নেই। সেখানে পায়ে হাঁটাও বেশ কঠিন, তাই হাতে সাহায্যও নিতে হচ্ছে।

একে চড়াই পথ, তার উপর আজই প্রথম হাঁটতে সুরু করেছি, তাই একেবারে দম পাচ্ছি না, অল্পেতেই হাঁপিয়ে পড়েছি।

ধীরে ধীরে চলে পৌণে বারটায় আমরা এপথের প্রথম গ্রাম মূলখড়্ক পৌঁছলাম। গ্রামের মাঝামাঝি, পথের পাশে একখানা ঘরের বারান্দার সামনে ছোট একটুখানি উঠান, তারই একপাশে ধারা থেকে ক্রমাগত জল পড়ছে সেই ধারাতেই স্নানের ব্যবস্থা। রান্নার জন্য ঘরের ভিতর উনুন জ্বেলে নিয়েছে "লামা"। লামা আমাদের দলের কুলিদের "নায়েক" বা দলপতি। তারই নির্দ্দেশে সকলের চলা ও থামা। অন্য সকলের সাহায্যে সে রান্নাও করবে। পথ নির্দ্দেশ করবার ভারও তারই উপর। এপথে দু'বার এসেছে, সুতরাং পথঘাট সব কিছু জানে বলে দাবী করে সে। অল্পবয়সী ফুট ফুটে ছেলে, গোলাপী রঙের গাল ফুটে লাল আভা বেরুচ্ছে। প্রথম দিন পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে যখন দেখা করতে এসেছিল, তখন বিশ্বাস করতে মন চায়নি যে, এই কোমল তরুণ ছেলেটি এমন কঠিন পথে মালবহন করে চলতে পারবে। দলে আরও একটি ছোট ছেলে আছে, কৃষ্ণবাহাদুর। সে অবশ্য লামার চেয়েও কম বয়সী। সেও সকলের সঙ্গে সমান ওজনের মাল বয়ে নিয়ে চলেছে।

খাওয়া সেরে মুলখড়্ক ছেড়ে বেরুতে সোয়া একটা বেজে গেল, চলেছি পাতিভঞ্জনের দিকে। এখনো কেবলই চড়াইপথে চলা। উঠতে উঠতে মনে হ'ল উঁচুতে চড়াই শেষ হয়ে গেছে। মনে আশার সঞ্চার হয়, এবার হয় সামান্য উৎরাই, কিম্বা সমান পথ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। অনেক কষ্টে হাঁচড়ে পাঁচড়ে চড়াইর মাথায় উঠে দেখি "মাথার" উপর আরেকটা "মাথা", অবিকল আগেরটির মতন! নতুন উদ্যম নিয়ে আবার ওঠা সুরু করি, এবার? এবার নিশ্চয় শেষ চড়াই। হায় ভগবান্! সেটার শেষে আরও একটা মাথা দেখা গেল যে! এমনি ভাবে হিমালয় তার সহস্র "মাথা" নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে। এর যেন আর শেষ নেই!

ঘণ্টা দুই পর ঘনবনের সুরু। চড়াইও যেন অনেকটা কম, তাই চলতে ভাল লাগছে, বনের সৌন্দর্য্যের অবধি নেই, সব গাছে ফুল নেই বটে কিন্তু ঝোপের মত গাছগুলিই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে, এগিয়ে চলতে সাহায্য করে। অজস্র ফুলহীন রডোডেনড্রন গাছ ছড়িয়ে আছে। এখন তার ফুল ফোটার সময় নয়, এপ্রিল-মে মাসে সে পর্ব শেষ হয়ে গেছে। পথ কিন্তু সর্বত্র সহজ নয়। কোথাও কোথাও ধসে গেছে। কোথাও বনের মধ্যে গাছপালার ডাল সরিয়ে চলা। কোথাও পথ ফেটে চৌচির হয়ে মস্ত হাঁ হয়ে আছে, হয়তো বর্ষার জলে মাটি ধুয়ে গেছে, তাই পাহাড়ের ফাটল বেরিয়ে পড়েছে, সেখানে চার হাতপায়ের সাহায্য নিয়ে ওঠা।

নেপালী মেয়ে পুরুষেরা দল বেঁধে মুলখড়্কের দিকে চলেছে। কারুর পিঠে একরাশ নেপালী টুকরি বিক্রির জন্য রয়েছে। কেউ বন থেকে ঘাস কেটে টুকরি বোঝাই করে নিয়ে চলেছে, কেউ বা অন্য নানারকম মালপত্র নিয়ে চলেছে। মেয়েরা ছেলেদের সাথে সাথে সমান তালে তাদের সমান মাল পিঠে নিয়ে চলেছে। চৌকো লম্বা বাঁশের টুকরিগুলি, দড়ি দিয়ে আটকে কপাল থেকে একটা মোটা ফিতে দিয়ে পিঠের উপর ঝোলানো। ওদের ভাষা না জানলেও মাঝে মাঝে হিন্দি-নেপালী মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করি—"পাতিভঞ্জন কতি বাট ছে?"—পাতিভঞ্জন কতদূরে? একবার একটি বর্ষিয়সী মহিলা এগিয়ে এলেন। লাল রঙের সাড়ী ঘাঘরার মত করে পরা, গাঢ় নীল রঙের লম্বা হাতা মোটা ব্লাউজ, কোমরে একখানা মস্ত লম্বা সাদা কাপড় জড়ানো, গলায় একরাশ রঙ্গীন পুঁতির মালা, কানে কানপাশা নাকে বেসর। বলেন—

"দুর ছই—পুঁকছু না।"

বুঝলাম, অনেক দূর,—আজ বেলা হয়ে গেছে, আজ আর পাতি-ভঞ্জন পৌঁছবার আশা নেই। অন্যান্য মেয়ে-পুরুষেরা আমাদের দিকে ফিরে ফিরে গুন্ গুন্ করে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে। দুটো

একটা কথা কেবল কানে আসে। "বাঙালী হুই—বাঙালী হুই।"

বেলা তিনটার পর বনভূমি পার হয়ে একখানা ছোট্ট গ্রাম পেলাম, মোটে দুটি ঘর এখানে। এখানে আমরা থামবো না। ঘরের মালিকের কাছ থেকে জল চেয়ে নিয়ে আকণ্ঠ পান করলাম। প্রশ্ন করে বোঝা গেল, পরের গ্রাম বনলুংভঞ্জন আর দূরে নেই। রাস্তার ধারে পাথরে বসে বিশ্রাম করে আবার চলা সুরু। গ্রামের ক্ষেত শেষ হতে হতেই আবার গভীর বনের সুরু, পথও চড়াই। এই পথে প্রায় ঘণ্টাখানেক চলে বন হালকা হয়ে এলো। অচিরেই আমরা বনলুংভঞ্জন গ্রামে পৌঁছে গেলাম।

ছোট্ট গ্রাম, মোটে পাঁচ ছয়টি ঘর। বনের শেষপ্রান্তে যেখানে গ্রামের সুরু সেখানে ক্ষেতেরও সুরু। শস্য ভরা সবুজ ক্ষেত চারিদিকে, মাঝখানে গ্রামের ঘর ক'টি তৈরী। নায়েক লামা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, ঘর ঠিক করতে হবে। তার পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে তাই এদিক সেদিক ছুটে বেড়ায়। কেউই ঘরে থাকতে দিতে চায় না। অনেক বলে কয়ে, ঘর ভাড়া বাবদ চার টাকা কবুল করে অনেক কষ্টে রাত কাটাবার যোগ্য ছোট্ট একখানা কামরা পাওয়া গেল। পাথরের ঘর। মাটি দিয়ে নিকানো ঘরের মাঝখানের খানিকটা জায়গা গর্ত করে পাথর দিয়ে বাঁধানো। সেখানে আগুন জ্বলছে। তার ঠিক উপরে উঁচু বাঁশের মাচাতে একরাশ জ্বালানী কাঠ বোঝাই করা। ক্কালো ঝুলে কাঠগুলি কালো হয়ে গেছে। ঘরের অন্যপাশে আমরা আমাদের বিছানা তিনটি পেতে নিলাম। ঘরের মালিক সস্ত্রীক দুটি কন্যা নিয়ে ঘরের ছাদের নীচেকার মাচাতে রাত কাটাবেন। লামা তাঁর দলবল নিয়ে বারান্দায় রইল।

বারান্দার একপাশে বাঁশের তৈরী বেঞ্চির আকারের মাচা। তার উপর বসে বসে দেখি, মেঘের ফাঁক দিয়ে গণেশ হিমলের উজ্জ্বল চূড়া একটু একটু ঝিক্‌মিক্ করে উঠেছে। সন্ধ্যার মুখে আমাদের ভাগ্যে বন্ধুর ডাকাডাকিতে আবার বাইরে বেরিয়ে আসি। এবার এক অপূর্ব

দৃশ্য চোখে পড়ে। গ্রামের সবুজ ক্ষেতের শেষ প্রান্ত বনের গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেছে, আরও পরে বনটাও ধোঁয়াটে পাহাড়ের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। তারই পরে আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে তুষার শৃঙ্গাবলী, পড়ন্ত সূর্য্যালোকে টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে। যেন আকাশে কয়েক টুকরো উজ্জ্বল লাল রঙের মেঘ ভেসে আছে।

সূর্য্য ডুবতেই প্রচণ্ড শীত নেমে এল। চলার পরিশ্রমে ইতিমধ্যে আমাদের জামা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। এখন থেমে থাকাতে আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগছে। আমাদের আশ্রায়দাতা গৃহ-কর্তার দুটি ছোট মেয়ে তাদের মায়ের আদেশে উনুনের ধারে বসে বসে ফুঁ দিয়ে আগুন উস্‌কে দিল। সেই আগুনের উত্তাপে আমাদের ক্লান্ত শীতার্ত শরীর তাজা করে নিই। আগুনের ধার ছেড়ে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।

এখানটা সেওপুরী পর্বতমালার উচ্চতম প্রান্ত, উচ্চতা ৮০০০ ফুট।

তিন

কোঁকর—কোঁ—, গঁ—অ—অ—অ, কোঁকর্—কোঁ, গঁ—অ—অ—অ—অ, মুর্গির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের এক কোণে ঝুড়ি ঢাকা কয়েকটা মুর্গি। কিন্তু বাইরে এখনো অন্ধকার। একটু আলো হতেই ডাঃ বিশ্বাসের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বাইরে বেরিয়ে হেট্ হেট্ করে কি তাড়াচ্ছেন। বন্ধু বললো, দু'টো ভালুকের মত মস্ত মস্ত কুকুর ছোটমামার পিছু নিয়েছে। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি। বন্ধু আশ্বাস দেয়, না ভয়ের কিছু নেই, ছোটমামার তাড়াতে ওরা ফিরে এসেছে।

কিছুপরে ডাঃ বিশ্বাস ফিরে এসে বলেন, "কি সাংঘাতিক অবস্থা! আমি প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বনের দিকে যাচ্ছি, ওই ভোটিয়া কুকুর দুটি আমার পিছু নিয়েছে, ছাড়ে না কিছুতেই। অনেক কষ্টে তাড়াতে সক্ষম হলাম মনে হ'ল, কিন্তু আমারই ভুল, আমি উঠে আসবার আগেই দেখি তাদের প্রত্যূষের ভোজন শেষ!"

আজ পথে আর চড়াই নেই। আমাদের সান্ত্বনা দিতেই যেন এবার উৎরাই পথ এগিয়ে এসেছে। বনের মধ্য দিয়ে চলার পথ, তবে একটানা ঘনবন কোথাও নেই। তুষার মৌলী গিরিশ্রেণী আজ আমাদের অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। মেঘমুক্ত আকাশের গায়ে গণেশ হিমল (২৪,২৯৯ ফুট), হিমলচুলী ২৫,৮০১ ফুট), ল্যাংট্যাং

(২৩,৭৭১ ফুট) শৃঙ্গগুলির কি অপরূপ রূপ। গাছের ফাঁক দিয়ে চূড়াগুলি উঁকি দিচ্ছে। আজ আর আমাদের খুশীর অবধি নেই। একে উৎরাই পথ, চলতে কষ্ট নেই, তার উপর অসীম সৌন্দর্য্যভরা পথ, তাই পরমানন্দে চলেছি। মাইল দুই এগিয়ে এসে বনের প্রান্তে একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল। এখন আর ডালপালার আবরণও নেই। আকাশের গায়ে তুষারমৌলী শৃঙ্গরাজি পরিপূর্ণ উজ্জ্বল রূপ নিয়ে সম্মুখে প্রসারিত।

আজও পথে নেপালী দলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তাদের সকলেই নতুন ঝুড়ির বোঝা বয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চলেছে। সম্ভবতঃ কাঠমাণ্ডুর দিকে। পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ফর্সা মুখগুলি লাল হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন না করেও বোঝা গেল, এখনো সামনে উৎরাই পথ। আমরা এদেরই একটা দলকে ধরে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু হিম শৃঙ্গগুলির গুলির নাম এরা কেউ জানে না। এসব নিয়ে এরা মোটেই মাথা ঘামায় না।

"কিধর যানু পর্‌ছ ?" উল্টে আমাদের ওরা জিজ্ঞাসা করে।

উত্তর দিই—"গোসাঁই কুণ্ড।"

দল ছেড়ে একটি বর্ষিয়সী মহিলা এগিয়ে আসেন। "উঁহু, পুক্‌ছু না, হিম পড়্‌সা, শক্‌ছ্‌ না।" অর্থাৎ এখন সেখানে তুষারপাত, এখন পৌঁছতে পারবে না।

আমরা নায়ককে ধরে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করি : আমরা নাকি পৌঁছাতে পারব না ? কি বলে ওরা ? তবে তুমি জেনে শুনে এখন আমাদের নিয়ে এলে কেন ?

নায়ক চট্‌পট্‌ উত্তর দেয়, কেন যেতে পারবো না ? ওই যে দেখছেন পরপর চারটি পাহাড়ের সারি, ওরই শেষ চূড়াটার ফাঁকে একটু নেমে গেলেই গোসাঁইকুণ্ড। দেখুন না, ওখানে কি বরফ আছে ? এখন তো বরফ পড়া সুরুই হয়নি, খু-উ-উব যেতে পারব। পথ খারাপ, সে তো আগেই বলেছি। তবে যাওয়া অসম্ভব হবে না।

আমরাও মনে মনে তাই বিশ্বাস করি। নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে। একদিনের পথ না হয় দুদিনেই যাবো, তাতে কি? ধীরে ধীরে চলবো, কেন যেতে পারবো না? তাছাড়া তুষারের মধ্যে তো আমরা আগেও হেঁটেছি, কিছু একটা অজানা অভিজ্ঞতার কথা নয়।

শেষের এক মাইল থাকতেই দূর থেকে আমরা পাতিভঞ্জন গাঁও দেখতে পেলাম। গিরিশিরার একটা অংশ যেন প্রকাণ্ড ময়দানে পরিণত হয়েছে, তারই মাঝখান দিয়ে সরু সিঁথির মত লাল রঙের পথ, এত উঁচু থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাঠের শেষ প্রান্তে পথটি উপত্যকার নীচে খাতে নেমে গেছে একেবারে পাতিভঞ্জন গাঁ পর্যন্ত। একটা ছোট মালভূমির উপর অবস্থিত গ্রামটিকে ছবির মত সুন্দর দেখাচ্ছে। নামা দেখায়, "হুই পাতিভঞ্জন"।

বেশী দেরী হয় না। একেবারে খাড়া নীচু বিপজ্জনক পথ হলেও বেলা ন'টা বাজতে বাজতেই আমরা পাতিভঞ্জন পৌঁছে গেলাম। নায়েক আমাদের সাথে সাথেই এসেছে। পৌঁছেই আমাদের জন্য ভালো দেখে একখানা ঘর ঠিক করে রেখেছে। মাদুর চেয়ে এনে বিছিয়ে দিয়েছে বিশ্রাম করবার জন্য। বাইরের বারান্দার কোনে রান্না হবে।

গ্রামের মাঝখানে একটা উঠানে একটা মস্ত পাথরের বেদী, তার উপর বড় বড় বাঁশ পোঁতা—তাতে বৌদ্ধ ঢঙে পাতাকা টাঙানো। বেদী ঘিরে চারিদিকে দোতলা বাড়ী, একতলায় দোকান ঘর। আমাদের দেখে গ্রামবাসীরা ভিড় করে এলো। এখানে পুলিশ চেক্ পোষ্ট আছে, আমাদের নাম ধাম গতিবিধি লিখে নিলো। পারমিট চাইল, নেপালের জন্য দেওয়া ভারতীয় পারমিট দেখালেও খুশী হয় না। বলে, এপথে আসবার পারমিট কই? কিন্তু সে তো নেই। দরকার নেই, ট্যুরিষ্ট অফিসার মিঃ মানসিং বলেছিলেন। পুলিশটি নাম ঠিকানা লিখতে লিখতে আমার স্বামী ডাক্তার শুনে খুশী, তার অসুস্থা স্ত্রীকে নিয়ে এলো দেখাতে। স্ত্রীর পেটের গোলমাল হয়, জ্বর

হয়—পুরণো রোগ। ডাঃ বিশ্বাস সাময়িক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে সঙ্গের বাক্স থেকে দু'চারটে ট্যাবলেট বের করে দিলেন।

পাশের বাড়ীতে একটা দোকান আছে। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, কুমড়ো ছাড়াও অত্যাবশক জিনিষপত্র সবই পাওয়া যায়। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সবই সঙ্গে এনেছি। তবু লামার পরামর্শে কয়েকটা স্কোয়াশ ও একটা ছোট ফর্সি অর্থাৎ কুমড়ো কেনা হলো।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর আবার চলা। পাতিভঞ্জন পেরিয়ে খানিকটা সমতল পথ পাহাড়ের গায়ে গায়ে চলেছে। পথের পাশে কত রকমারি ফুল ফুটে আছে। জায়গায় জায়গায় মনে হয় যেন সবুজ পাহাড়ের গায়ে খানিকটা খানিকটা করে গোলাপী রং কার হাত ফস্‌কে পড়ে গেছে। অপরূপ দেখতে সেই রঙিন ঝোপগুলি।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। একটু এগিয়েই চড়াই পথের সুরু। নীচে থেকেই দেখছিলাম সামনের পাহাড়ের চূড়া অবধি খাড়া চড়াই পথ সিধা উঠে গেছে। কোথাও বাঁকাচোরা নেই। যে চূড়াটা দেখা যাচ্ছে তারপরও আরও চূড়া আছে কিনা কে জানে। কোন গাছপালার বালাই নেই যে তার নীচে দুদণ্ড বসে বিশ্রাম করা যাবে, ঠাঁটাপোড়া রোদ্দুরে একটানা চড়াই ওঠা। ভীষণ কষ্টকর।

একদল নেপালী নেমে আসছে, পথে দেখা। পিঠে তাদের টুকরি বোঝাই মাল।

"চিপ্‌লিঙ্‌ কি ধর?" প্রশ্ন করি।

"দুই মাথি পর। ঘর দেখাই যাতা না? ওই উধর।"

চিপলিঙ্‌ গাঁও আমাদের গন্তব্য স্থল। সামনের পাহাড়টা যেখানে আকাশের মাঝখানটা ফুঁড়ে বেরিয়েছে, সেইখানে। সেই উঁচুতে "মাথিপর" দুটি ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়ে ঘরও দেখতে পেলাম। চোখে দেখা গেলেও, এখনো উঠতে অনেক সময় লাগবে।

মাঝপথে গাছপালা ঘেরা ছোট্ট একখানি কুটির। হাঁপাতে হাঁপাতে

ধীরে ধীরে উঠে কুটিরের সামনের ছায়া ঢাকা ছোট্ট উঠানটিতে বসে পড়লাম। কুটিরের গৃহিনী জল দিলেন, খেয়ে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবারণ করি। গাছে কয়েকটা কাঁকুর ফলে আছে, আমাদের কাছে বিক্রি করতে রাজী হ'ন। গাছের ছায়াতে ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে কাঁকুর চিবোতে চিবোতে আমরা দুজন খানিক বিশ্রাম করে নিই। বন্ধু এগিয়ে গেছে।

গ্রামের নাম চিপলিঙ্‌। আমাদের মনে হয় "শিবলিঙ" এর অপভ্রংশ। চিপলিঙ্‌ পৌঁছাতে আমাদের বেলা আড়াইটা বাজলো। গ্রামবাসীরা বলল, এর পরের গ্রামে পৌঁছাতে আমাদের তিন কি সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগবে। সুতরাং আমরা এখানে আজ রাত্রের মত থেমে থাকাই স্থির করলাম। পথের ধারে একখানা মস্ত বড় ঘর, তার পাশেই একখানি নতুন ঘরের ছাদ পেটাচ্ছে কয়েকটি মজুর। আশে পাশে সিঁড়ির ধাপের মত ক্ষেতে শস্য ভরে আছে, বাড়ীর লাগোয়া উঠানের ধারে ধারে নানারকম শব্জী।

একটু এগিয়ে আরও কয়েকটা ঘর পেলাম। অধিকাংশ ঘরের গৃহকর্তা মাঠে কাজ করতে গেছে, ফেরেনি এখনো। কর্ত্রীরা ঘরে থাকতে দিতে চায় না কেউ। নায়ক লামা ছুটাছুটি করতে লাগলো। কিছুতেই ঘর পাওয়া যাচ্ছে না কি বিপদ!

আমাদের হাঁক ডাকে এক বুড়ো উঁচু পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। উপরে উঠেই তাঁর ঘর। স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলো। গ্রামের শেষ ঘরখানি তার। মস্ত ঘর, কিন্তু অধিকাংশ জায়গাই ভুট্টা ও অন্যান্য শস্যে বোঝাই। তবু মাথা গোঁজবার মত একটা স্থান পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

সন্ধ্যের আগেই বুড়োর দুই জোয়ান ছেলে ও স্ত্রী এলো মাঠের কাজ সেরে। তাদের জন্য নুন মরিচ দিয়ে কাঁকড়ি মেখে দিল, আর দিলো মদের সঙ্গে ভুট্টার ছাতু গুলে। ঐসব খাদ্য তারা প্রচুর পরিমানে খেল। ঐ ঘরেরই একপাশে আমাদের বিছানা ক'টি পাতা হলো। ঘরের মাঝখানে

উনুন, সেখানেই রান্নাকরা। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঁচুতে মাচার উপর ওঠা যায়, সেখানে ছেলেরা উঠে গেল শোবার জন্য। যাবার আগে ভুট্টার ছাতুর কাই দিয়ে বুড়োর রাঁধা তরকারীর ঝোল খেয়ে নিল আরেক দফা।

"উঃ", বন্ধু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

"কি হল ?" প্রশ্ন করি।

"কি আবার ? মাথাটা ছাতের কড়ি কাঠে ঠুকে গেল ! এই বেঁঠে ব্যাটারা এমন ঘর তৈরী করে যে সোজা হয়ে দাঁড়ানো পর্য্যন্ত চলে না।"

পরিষ্কার তারা ভরা আকাশ, কিন্তু শীতও প্রচণ্ড। তাই বাইরে বসে থেকে উপভোগ করা যায় না। ঘরের ভিতর উনানের পাশে বুড়ো ক্রমাগত কেশে চলেছে। সারারাত তার কাশি থামলো না। তারই ফাঁকে ফাঁকে তার হুঁকাটি বার করে হুড়ুৎ হুড়ুৎ করে তামাক টানছে।

চার

সকালে উঠে চা খেয়ে আবার চলা সুরু। রওনা হবার আগে বুড়োর দাম মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু দামের বহর শুনে চক্ষু চড়ক গাছ! রাত্রের ও সকালের উনানের কাঠের জন্য ২৲ এবং রাত্রিবাসের জন্য জনপ্রতি ১৲ করে।

চিপলিঙ্‌এর আগে থেকেই যে চড়াই পথের সুরু হয়েছে, সেইপথ এখনো এগিয়ে চলেছে। খানিকপর অবশ্য উৎরাইও কিছুটা আছে। ধীরে ধীরে বনের মধ্যে কখন যেন প্রবেশ করেছি। এখানে পাইন, ফার গাছের প্রাধান্যই চোখে পড়ে। এখন অনেকটা সমতল পথ, দৃশ্যও মনোরম।

"উঃ বাবা!"

"কি হল?"

ডাঃ বিশ্বাস পা মচকে পড়ে গেছেন। পচা পাইন পাতাতে পা হড়কে গেছে তার। আমাদের সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কুলিদের থামিয়ে ওষুধের ব্যাগ খুলে ষ্টিকিং প্লাষ্টার বের করে আঁট করে বেঁধে নিলেন নিজেই। টিপে টুপে বলছেন, নাঃ হাড়গোড় ভাঙেনি। তবু সাবধানের মার নেই।

সামান্য চড়াই উৎরাই পথে চলে আমরা যখন গোলভঞ্জন (৮০০০ ফুট) গ্রামে পৌঁছলাম, ঠিক তিনটি ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। গোল-ভঞ্জনকে কেউ কেউ "গোলবু" বলেও উল্লেখ করছে। আজও

সমস্ত পথটাতেই তুষার শৃঙ্গগুলির উজ্জ্বলরূপ দেখা যাচ্ছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বারবার সূর্য্য উঁকি দিচ্ছে—যুগলহিমল শৃঙ্গ সবচেয়ে কাছ থেকে সুন্দর ও স্পষ্ট দেখা গেল।

গোলবুতে একটা দোকান ঘরের বারান্দায় ঠাঁই পেলাম। এই পাথরের দেশে ঘরের কোনে রসালো আখ দেখে আর লোভ সংবরণ করা গেল না। কিনে নিয়ে চিবোতে সুরু করলাম, বেশ মিষ্টি।

এখানে দুপুরের খাওয়া ও বিশ্রাম সেরে বেলা থাকতে থাকতেই আবার চড়াই ওঠা সুরু করে দিলাম। গোলবুতে জলাভাব, স্নান করা গেল না। কিন্তু মাত্র আধঘণ্টা চড়াই উঠেই একটা বেশ বড় ময়দান পাওয়া গেল। তার মাঝখান দিয়ে টলটলে জলভরা নীলরঙের একটা ঝরণা বয়ে চলেছে। আমরা সকালে আর আধঘণ্টা হাঁটলেই এখানে পৌঁছাতে পারতাম। গোলবুর থেকে অনেক ভাল জায়গা, স্নানও করা যেত। নায়েক এপথে দুবার এসেছে বটে, কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু জানা নেই তার।

ময়দান পার হয়ে এখনো চড়াই উঠে চলেছি ঘন গাছপালা ঢাকা পথ, কোথাও চড়াই, কোথাও সমতল—উৎরাই আর নেই বললেই চলে। তবে মোটামুটি ভাল রাস্তা। বিকাল গড়িয়ে এসেছে, কিন্তু গ্রামতো চোখে পড়ছে না। একটা গিরিশিরার উপর দিয়ে এখনকার চলবার পথ। ডানদিকে দূরে ইন্দ্রাবতী নদী দেখা গেল, সবুজ উপত্যকাতে সরু রূপালী সুতার মত ঝিকমিক করছে। কাঠমাণ্ডু-কোডারী চীনা সড়কও দেখা গেল। এই বিরাট পথটি কাঠমাণ্ডু থেকে সোজা তিব্বতের রাজধানী লাসায় যাবে। চীনারা এই রাজপথ নির্মাণ করে দিচ্ছে।

রাজা মহেন্দ্র ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে রাজকীয় সফর করেন। এই সফরে নেপালের দুটি সুফল লাভ হয়। নেপাল তিব্বতের মধ্যে অনির্দিষ্ট সীমারেখা স্থিরীকৃত হয় এবং কাঠমাণ্ডু কোডারী সড়ক নির্মাণ করা স্থির হয়। এই পথ চীনারা তৈরী করে দেবে এবং এটি তৈরী

করতে ৩·৫ মিলিয়ন পাউণ্ড ষ্টার্লিং খরচ পড়বে। এখন পায়ে হাঁটা ও ঘোড়া চলা পথে ব্যবসা বাণিজ্য করবার জন্য যাতায়াত করতে অনেক অসুবিধা হয়। এই পথে ব্যবসা বাণিজ্যের খুব সুবিধা হবে। ঐ চীনাসড়কে বাস ট্রাক মোটর সবই চলছে।*

সন্ধ্যা হয় হয়, সন্ধ্যার আগেই একটা গ্রামে যে পৌঁছাতে হবে, কিন্তু কোথায় গ্রাম? লামা এগিয়ে গেছে, আমরা দূর থেকে তাকে অনুসরণ করে চলেছি। একটু এগিয়ে গাছপালার মধ্য দিয়ে দেখি যে লালমাটীর পথ দুভাগ হয়ে গেছে। একটা উঁচুর দিকে পাহাড়ে উঠেছে, অন্যটা নীচে উপত্যকার দিকে ধীরে ধীরে নেমে গেছে। লামা নীচের পথটি ধরলো। আরও একটু এগোতেই একখানা পরিচ্ছন্ন সুন্দর গ্রাম দেখা গেল-এটি বালোম্জি গাঁও। এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ছিম্ছাম্ ছোট্ট গ্রামটি, চারিদিকে ক্ষেতভরা। চারপাঁচটি ঘর মাত্র। তারই মধ্যে একটি বিত্তবান পরিবারের ঘরে থাকবার স্থান অতি সহজেই পাওয়া গেল। এই প্রথম একটি পরিবারের মধ্যে সত্যকার সহৃদয়তার আভাস পেলাম। এঁরা নেপালী নন, তিব্বতী, তাঁদের চালচলন কথাবার্তা তাই ভিন্ন রকমের। কাঠের তৈরী মস্ত দোতলা বাড়ী। একতলার গোটাটাতেই গোয়াল এবং মুর্গির খাঁচা। দোতলাতে একখানাই প্রকাণ্ড ঘর। ঘরের বেশীর ভাগ জায়গা বড় বড় ঝুঁড়িতে ভরা, নানারকম শস্য বোঝাই তাতে, কলসভর্তি মদ রয়েছে, তা সত্ত্বেও অনেকটাই ফাঁকা পড়ে আছে। একধারে একটা পরিচ্ছন্ন দামী বিছানা পাতা। ভালো লেপ গায়ে দিয়ে এক ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে হিন্দিতে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। ঘরের একপাশে পাথর দিয়ে বাঁধানো উনুনের জায়গা, দুটো উনুন জ্বলছে। একটি রূপসী মেয়ে উনানে জল চাপিয়ে দিল চায়ের জন্য। ভদ্রলোকের কোলে বছর-খানেকের একটি সুন্দর ফুট্‌ফুটে শিশু। আরেকটি বছর চার পাঁচেকের শিশু তার কোলটি ঘেঁসে বসে আছে।

* দুবছর হ'ল পথটি চালু হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক পরিচয় দিলেন, মেয়েটি ওঁর স্ত্রী। আর তুটি মহিলা আছেন, একজন শাশুড়ী অন্যজন শালী। এটি তাঁর শ্বশুরবাড়ী। তবে ভদ্রলোক এখানেই থাকেন। মেয়েটি খুব কর্মঠ। অতিথিদেব আপ্যায়ণ করতে তাঁর ব্যস্ততার অন্ত নেই। হিন্দি জানেন বলে আলাপ হওয়া সম্ভব হলো। ভারতবর্ষে অনেকবার গেছেন।

বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে ঘরখানা ভাল করে দেখি। পুরো বাড়ীটাই কাঠের তৈরী, অপরূপ কারুকার্য্যময়। ঘরের ভিতরের দেয়ালের কাঠেও কারুকার্য্য করা আছে। একপাশে দেয়ালের গায়ে কাঠের সেল্‌ফে বাসনপত্র সাজানো। মেয়েদের পরণে তিব্বতীদের মত ঢোলা পোষাক, নানারঙের সমাবেশ তাতে, গলায় মোটা পাথরের মালা।

আমরা ভাব করবার জন্য বাচ্চা তুটিকে লজেন্স ও বিস্কুট দিলাম। তারা হাত বাড়িয়ে নিলো বটে, কিন্তু ভাব করবার আগ্রহ তাদের দেখা গেল না বিন্দুমাত্রও।

দিনের আলো নিভু নিভু। উনি চারিদিক ঘুরে দেখবার জন্য বাইরে গেলেন, কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ও হাওয়ায় আর বেশী এগোতে হলো না। বাইরের বারান্দায় বেরিয়েই হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি। একান্ত অনিচ্ছায় আগুনের ধার ছেড়ে উঠে বারান্দায় বের হই। কি অপরূপ দৃশ্য! অদূরে একটা নীল পাহাড়ের ঢেউ-এর পরের ঢেউটাতেই তুষারশৃঙ্গাবলী পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, যুগলহিমল—তার উচ্চতম শৃঙ্গ দোরজে লাক্‌পা (২৩,২৪০ ফুট)। চূড়াগুলি পড়ন্ত সূর্য্যের আলোতে লাল টুকটুক করছে। দৌড়ে ভিতরে যাই ক্যামেরা আনতে, কিন্তু এটুকু সময়েই সূর্য্য ডুবে গেল। ছবি তোলার মত আলো আর নেই। এই দৃশ্যে পূর্ণরূপ রঙ্গিন ছবিতে ধরে রাখতে পারলাম না, কিন্তু আজও সেরূপ মনের কোণে উজ্জ্বল হয়ে আছে। হিমালয়ের নানাদিকে, নানামুহূর্তে নানারূপের সমাবেশ।

সূর্য্য ডুবতেই আবার ঘরের ভিতর উনুনের ধারে গিয়ে বসি। বউটি লম্বা মোটা বাঁশের চোঙের মধ্যে তৈরী করা চা ঢেলে একটা

লম্বা কাঠি দিয়ে ঘুঁটে দিল। সবাইকেই সেই চা খাবার জন্য অনুরোধ জানায়। আমরা চেখে দেখতেও সাহস পেলাম না। বন্ধু ছাড়লো না, খানিকটা খেয়ে দেখলো, ভালো লাগলো না।

রাত্রে ওদের নিজেদের জন্য ওই মেয়েটিই রান্না করলো। শুয়ে শুয়ে তার রান্না দেখি। প্রথমে মশলা দিয়ে অনেকগুলি আলুর টুকরো বেশী করে জল দিয়ে সিদ্ধ করে নিল। আলু ভালমত সিদ্ধ হয়ে গেলে, ওই জলের মধ্যেই ভুট্টার ছাতু ঢেলে দিয়ে কাই মত তৈরী করে নিল। সকলে তাই ভাগাভাগি করে খেল। আমাদের রান্নাও ওদের উনুনেই করা হলো। আমাদের জন্য করা খিচুড়ীও একটু করে ওরা চেখে দেখল কেমন লাগে!

এদের পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহার আমাদের খুব ভালো লাগল। আমরা গোসাঁইকুণ্ড যাবো শুনে ভদ্রলোক বলেন, এখনো তিন দিনের পথ বাকি আছে। আমাদের মনে হচ্ছে নায়ক যদিও এপথে দুবার এসেছে, কিন্তু এপথ সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা খুবই কম। আমরা তাই এখানে একজন গাইড চাইলাম। একটি ছেলেকে যেতে রাজী করানো হলো, কিন্তু তিন দিনের জন্য সে ১০০ টাকা চাইল। আমরা ত্রিশ টাকার বেশী দিতে রাজী নই। তাই আর গাইড নেওয়া হলো না।

উচ্চতার জন্য অক্ষুধা বোধ করছি। তবু জোর করে কোনক্রমে লেবু দিয়ে খানিকটা পাতলা খিচুড়ী গলাধঃকরণ করতে হলো। এখানকার উচ্চতা বারোহাজার ফুটের মত হবে বলে আমাদের ধারণা। এখনো সামনে অনেকখানি চড়াই পথ বাকি।

পাঁচ

১৪ই অক্টোবর। আজ আমাদের যাত্রার চতুর্থ দিন। এ পথের শেষ লোকালয় ভোটিয়া গ্রাম বালোম্‌জি ছেড়ে এলাম আজ।

নেপালের সংস্কৃতিতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। একটা থেকে অন্যটা আলাদা করা যায় না। নেপালের দক্ষিণাঞ্চলে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়, তেমনি আবার যত উত্তরে তিব্বতের সীমানার দিকে যাওয়া যায়, বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য চোখে পড়ে। তিব্বতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে লামাদের সঙ্গে বনধর্মের অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। আগেই বলেছি, কাঠমাণ্ডু উপত্যকাতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মিলন সর্বত্রই আমাদের চোখে পড়েছে। বিখ্যাত পশু-পতিনাথ যেমন বিখ্যাত হিন্দু মন্দির, তেমনি স্বয়ম্ভুনাথ ও বোধনাথ বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থান বলে পরিগণিত। জনসাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধ মেশানো, কিন্তু তাদের আচার অনুষ্ঠানে দুটি ধর্মকেই আঁকড়ে ধরতে দেখা যায়। দুটি ধর্ম যেন দুটি যমজ ভাই এর মত অবস্থান করছে, একত্র বেড়ে উঠেছে। একই স্থানে হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ স্তূপ এবং বিহার পাশাপাশি দেখা যায়। কোন কোন সময়ে একই দেব মূর্ত্তি দুই ধর্মের লোকেদের দ্বারা পূজা পেতেও দেখেছি, যেমন দেখেছি মধ্য নেপালের হিন্দুতীর্থ মুক্তিনাথে। সেখানে দুইজন পূজারী আছেন, একজন হিন্দু অন্যজন বৌদ্ধ। একথা আগেই বলেছি। নেপালের

রাজারা পুরুষানুক্রমে হিন্দু হলেও এই দুটি ধর্মকেই তাঁরা সমান চক্ষে রেখেছেন। হিন্দুদের মতে নেপালের রাজা মনুষ্যরূপী স্বয়ং বিষ্ণু, অন্যপক্ষে বৌদ্ধগণ মনে করে রাজা হচ্ছেন একজন বৌদ্ধ গুরু বা দেবতা।

কাঠমাণ্ডু উপত্যকার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। পুরাকালে এই উপত্যকাটিতে একটি বিশাল শান্ত জল পূর্ণ হ্রদ ছিল। মঞ্জুশ্রীদেব একদা চীন দেশ থেকে তিব্বত হয়ে বৃহৎ হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতশিখর সমূহ পার হয়ে পর্বতবেষ্টিত এই নীল স্বচ্ছ হ্রদের তীরে পৌঁছান। এই হ্রদ তখন নাগদের বাসভূমি ছিল। মঞ্জুশ্রীদেব ধ্যানমগ্ন অবস্থায় এই বৃহৎ হ্রদটিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন এবং তাঁর হস্তস্থিত চন্দ্রহাঁস (তরবারি) দিয়ে একদিকের পর্বত ছেদন করেন। ঐ পথে হ্রদের বিপুল উজ্জ্বল জলরাশি নির্গত হয়ে মহাভারত লেখ পর্বতমালার মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে ভারতের সমভূমিতে গঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হয়। জল নিক্রমণের ফলে একটি বিশাল শুষ্ক স্থলভূমির সৃষ্টি হলো। তিনি ধর্মকার নামক একজন পূণ্যাত্মাকে ঐ ভূমির অধীশ্বর হবার আদেশ দেন।

এই একই প্রবাদ বৌদ্ধদের মত হিন্দুরাও বিশ্বাস করে। কেবল তারা বলে যে, পর্বত ভেদ করে উপত্যকা শুষ্ক করার কার্য্য জগৎপালক বিষ্ণু সাধন করেন। তবে মঞ্জুশ্রী দেবকেও হিন্দুরা অবিশ্বাস করে দূরে রাখে না। তাঁকে তারা সর্বজ্ঞ বলে মনে করে। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে মঞ্জুশ্রীর মন্দিরে হিন্দু বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র লোক পূজা দিতে জমায়েত হয়।

আমরা তিব্বত সীমান্তের কাছে এসে পড়েছি তাই এই অঞ্চলে যত্রতত্র তিব্বতী ভোটিয়া চোখে পড়ছে। গ্রামগুলি আরম্ভ হবার মুখে এবং গ্রামের শেষে চোর্টেন বা স্তূপ এবং তার উপর উঁচু বাঁশে পতাকা টাঙানো দেখছি।

বালোমৃজি গ্রামের শেষ প্রান্তে একটু উঁচুতে উঠলে পাওয়া গেল

চোর্টেন, মস্ত উঁচু বাঁশে মন্ত্র লেখা পতাকা উড়ছে। লামা বললো, মৃত গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে এই পতাকা টাঙানো হয়েছে। আমরা ওদের নিয়ম মেনে স্তূপকে ডাইনে রেখে উঁচুতে উঠে চলেছি। ঘনবনের গাছপালার মধ্য দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা লালরঙের পায়েচলা রাস্তা ক্রমাগত উঁচুতে উঠেছে! এখনকার বনে বেশীর ভাগই পাইন গাছ। পথের ধারে ধারে ছোট্ট ছোট্ট ঝোপে লাল টুকটুকে বেরী ফল ফলে আছে। টক মিষ্টি আস্বাদ, মুখে দিলে তৃষ্ণা বোধ কমে যায়। বন্ধু আর উনি দুজনে সংগ্রহ করে দিচ্ছেন, তাই খেতে খেতে চলেছি।

এপথে যে কোথায় আমরা থামবো তা লামা বলতে পারছে না। আমরা ওদের নিয়ে ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়ছি, খানিকটা ভীতও। কিছু চেনে না, অথচ কাঠমাণ্ডুতে বসে ওরা বলেছিল, ওরা এপথে দুবার এসেছে, এ পথের সব খবর ওরা খুব ভালো করে জানে। সম্ভবতঃ ওরা যাত্রীদের সঙ্গে তীর্থের সময় এসেছিল। সে সময় পথে সর্বত্র সাময়িক দোকানপাঠ ঘরবাড়ী তৈরী হয়েছিল। পথের কথা চিন্তা করবার প্রয়োজন হয়নি। এখন নির্জন পথে ওরাও দিশাহারা হয়ে পড়েছে।

খানিকটা এগিয়ে একটা পাহাড়ের ধার দিয়ে চলবার সময় পশ্চিমে অনেক নীচের উপত্যকার মধ্যে ত্রিশূলী নদীর ক্ষীণ রেখা চোখে পড়ল। কৃষ্ণবাহাদুর বলে, ত্রিশূলী বাজারের মোটরের শব্দও সে শুনতে পেয়েছে। হবেওবা, পাহাড়ীদের চোখ কান খুব তীক্ষ্ণ হয়।

"ওকি! ওকি হচ্ছে!" চেঁচাচ্ছি। লামা ও কৃষ্ণ বাহাদুর মাল নামিয়ে রেখে মারামারি করছে। তবে তাদের ঝগড়াঝাঁটির কোন কারণ ঘটে নি। মনের জড়তা কাটাতেই বুঝি এই mock fight এর আয়োজন! এই সুযোগে ডাঃ বিশ্বাস তার সিনেমাও তুলে নিলেন।

নির্জন বনভূমি, কেবল দুটা একটা পাখীর ডাক ছাড়া প্রাণের

আর কোন চিহ্ন নেই, লোক তো দূরের কথা। হঠাৎ, "হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!" চিৎকারে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতেই শুনি মেঘ গর্জনের মত গুড়্ গুড়্ শব্দ। একটু বাদে দেখি, তিন চার জন পাহাড়ী সরু বাঁশের বোঝা মাথার উপর রেখে মাটীর উপর দিয়ে টানতে টানতে দ্রুত বেগে উপর থেকে লাফাতে লাফাতে নামছে। উপরের জঙ্গল থেকে তারা এই সরু সরু লম্বা পাহাড়ী বাঁশ সংগ্রহ করেছে। পথের অসমান জায়গাগুলি তারা অবলীলাক্রমে লাফিয়ে পার হয়ে গেল। আমরা বিস্মিত, স্তব্ধ, কিছুটা ভীতও।

ওই বাঁশ কেটে ওরা ঝুড়ি বানাবে, কাঠমাণ্ডু নিয়ে যাবে বিক্রি করতে। কাঠমাণ্ডুতে ওই ঝুড়ির প্রচণ্ড চাহিদা। নেপালীরা এই ঝুড়িগুলি চওড়া শক্ত ফিতে দিয়ে বেঁধে কপালে আটকে তাতে মাল বয়।

এই পাহাড়টার পুরোটা চড়তে হবে। দূর থেকেই পাহাড়ের গায়ের পায়ে চলা পথের রেখা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখনো অনেকটাই ওঠা বাকি। গাছপালা বিরল হয়ে এসেছে। রডোডেনড্রন গাছের প্রাধান্য চোখে পড়ছে, মনে হয় তের হাজার ফুট উঁচুতে উঠে এসেছি আমরা। বেলা ন'টা নাগাদ তুজনা স্থানীয় লোকের দেখা পেলাম। নীচে নামছে। তারা বললো, সামান্য নীচে একটা ঝরণা আছে। আমরা আর না এগিয়ে ওইখানেই একটি পরিষ্কার সমতল স্থান নির্বাচন করে নিয়ে প্লাষ্টিকের চাদর পেতে বিশ্রামের জন্য বসে পড়লাম। রোদের উত্তাপ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য বন্ধু তুটো লাঠি পুঁতে একটা প্লাষ্টিকের চাদর দিয়ে আচ্ছাদন তৈরী করে দিল। "সামান্য নীচের" ঝরণা কিন্তু অনেক নীচে, সুতরাং আজও স্নানের আশা বৃথা।

তুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর চলা স্থরু করেই মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে বেশ বড় একটা ময়দান পেলাম। তার মাঝখান দিয়ে কুলুকুলু রবে একটা টলটলে জলের ঝরণা বয়ে চলেছে। ময়দানের মাঝখানে একটা ঝুপড়ীও আছে। জানা থাকলে আমরা এখানেই চলে

। তাহলে স্নান করাও সম্ভব হত। নায়ককে বলে লাভ ওরা স্নানের ধার ধারে না, সুতরাং স্নানের মর্মও বোঝে না।

..রও একটু উঁচুতে দু'টা রাস্তা পাওয়া গেল। দুটাই চড়াই উঠেছে এবং সমান চওড়া। নায়ক কোন ইঙ্গিত দেয়নি আগে, কোন পথে চলব তাহলে? লামা তার দলবল নিয়ে পিছনে আসছে। অগত্যা থেমে থাকাই স্থির হলো।

এইটেই নিশ্চয় "দোবাট", আমরা বলাবলি করি। ট্যুরিষ্ট অফিসর যেসব জায়গার নাম দিয়েছিলেন, ততে তাই মনে হয়। নায়কের নির্দেশে বাঁদিকের পথ ধরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চললাম, কিন্তু কিছুটা উঠেই দেখি, ডানদিকের পথটিও পাহাড়ের উঁচুতে উঠে এক জায়গায় এসে মিশেছে। একই গন্তব্যস্থলের দুটি পথ, তাই এখানকার নাম "দোবাট"।

বনের মধ্য দিয়ে অসমতল পথ চলেছে, প্রথম দিকের অনেকটাই প্রায় চড়াই। খানিকটা উঠবার পর গাছাপালা বিরল হয়ে এল, তখন উৎরাই পথের সুরু। নীচে তাকিয়ে দেখি, ছোট একটা ঝরণা উপল সমাচ্ছন্ন পথে কলকল ধ্বনি করে বয়ে চলেছে। এই শুকনো রাজ্যে জল দেখলেই আনন্দ হয়। আমরা সেই জলে হাত মুখ ধুয়ে নিই, কিঞ্চিৎ পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করি। জলের ধারে একপাশে কতক-গুলি গরু ভেড়া রাখবার ঘর ইতস্ততঃ ছড়ানো। বাঁশ কাটবার চিহ্ন চোখে পড়ছে আশেপাশে। আগাগোড়া পথে বাঁশের বোঝা টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগও রয়েছে। বনের চারিদিকে সর্বত্র বাঁশগাছ ঘন হয়ে জন্মেছে, কেবল কেটে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র।

ঝরণা পেরিয়ে একটু দূরে আরও কয়েকটা খুপড়ী দেখা গেল। নায়ক বলে, আজ আমরা এখানে থামি। কিন্তু ডাঃ বিশ্বাস রাজী হচ্ছেন না। এখন মোটে বেলা দুটো বেজেছে, আরও ঘন্টা দুই অনায়াসে চলা যাবে। লামা দোনামোনা করে, আবার ঘর কতদূরে পাওয়া যাবে কে জানে! সেখানে জল থাকবে কিনা তারই বা

ঠিক কি?

বন্ধু লামাকে বলে, আমরা এখানে বসছি, তুমি মাল রেখে এগিয়ে পাহাড়ের উঁচুতে উঠে একটু দেখ, কোন খুপড়ীর চিহ্ন দেখা যায় কিনা!

লামা তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল, সঙ্গী হলো মনবাহাদুর। মিনিট পনেরর মধ্যেই ওরা ফিরে এল, হ্যাঁ, কয়েকটা ঘর দেখা যাচ্ছে, একটু এগোলেই পাওয়া যাবে।

এবার চড়াই ওঠা, তবে বেশী দূর পর্যন্ত নয়, তাই রক্ষা। আমরা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বেশ বড় বড় চার পাঁচটা খুপড়ী পেয়ে গেলাম। কিন্তু নিকটে যে জলের ধারাটা আছে, তাতে জল খুব কম। খুপড়ীগুলোও বড় নোংরা। অপরিষ্কৃত গোয়াল ঘর আর কি! পাথরের তৈরী দেয়াল অর্থাৎ পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে উঁচু করে দেয়াল তৈরী, মাটী বা সিমেণ্টের কোন গাঁথুনী নেই, বড় বড় কাঠের তক্তা দিয়ে ছাদ তৈরী, তার ফাঁক দিয়ে কোথাও কোথাও আকাশ দেখা যাচ্ছে।

মনবাহাদুর খুব চটপটে কাজের লোক। লামা ও মনবাহাদুর পাইনের পাতা ভরা ছোট-ছোট ডাল কেটে এনে ঘরের মেজেতে বিছিয়ে দিল, তার উপর আমাদের এয়ার ম্যাট্রেস পাতবো। ঘরের মাঝখানে আগুন জ্বললো। ছাতের উপর প্লাষ্টিকের চাদর ঢাকা দিয়ে সেগুলি পাথর চাপা দিয়ে আটকে দেওয়া হলো। যাহোক, বৃষ্টি হলেও আর ভয় নেই। ঘরের মধ্যে আমার একটা শাড়ী টাঙিয়ে খোলা দুয়ারের মধ্য দিয়ে আসা বাতাসের পথরোধ করবার ব্যবস্থা হলো।

এখানেও ওই বিপদ! বন্ধু যতবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, ছাদে তার মাথা ঠুকে যাচ্ছে। তা হোক, কিন্তু এই পল্কা ঘরখানি ওর মাথার গুঁতোতে না ভেঙে পড়ে! ওর এত লম্বা হওয়াটা উচিত হয় নি।

অনেকক্ষণ পর লামা সরু একটা জলের ধারা থেকে আধ বালতি

জল সংগ্রহ করে নিয়ে এল। অন্যান্য সকলে খালি হাতে ফিরেছে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যাও হয়ে গেছে। কাছাকাছি আর কোন ধারা পাওয়া গেল না। কি আর করা যাবে। এখন এখানকার এই নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে বের হবার কথা চিন্তা করাও যায় না।

বাইরে জুনিপার গাছের ঝোপে ঢাকা পাথরের উপর বসে দেখি, পড়ন্ত সূর্যের আলো পড়েছে চারিদিকের তুষার শৃঙ্গাবলীর উপর। টুকটুকে লাল লাল শৃঙ্গগুলিকে অপরূপ দেখাচ্ছে। ধীরে ধীরে কাল হয়ে আসে পাহাড়গুলি। একটা দুটো তারা ফুটে ওঠে নির্মেঘ নীলাকাশের গায়ে, উজ্জ্বল তারায় ভরে যায় ক্রমশঃ। বিন্দুগুলি যেন জ্বলতে থাকে। এমন অপরূপ আকাশ পাহাড়ের দেশ ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না।

সন্ধ্যা হবার আগে থেকেই অসম্ভব শীত করছে। বাইরে বের হওয়া অসম্ভব। এখানকার উচ্চতা কত হবে ? চোদ্দ হাজার ? সাড়ে চোদ্দ হাজার ? গাছগুলি ছোট হয়ে এসেছে। ছোট ছোট জুনিপারের ঝোপ ছাড়া দু'চারটে রডোডেনড্রন গাছ, আর বিশেষ কিছু নেই।

ছয়

ভোরের শিশির জমে সাদা হয়ে আছে সবগুলি ঝোপ। ঘাসের উপরেও তুষার জমেছে। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। সামনের জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়টার চূড়াতে চড়াইপথে উঠতেই আমাদের একটি ঘণ্টা কেটে গেল। এবার গিরিশিরার উপর দিয়ে প্রায় সমতল পথে চলা। গিরিশিরার উপর থেকে পূর্ব ও পশ্চিম দুদিকের উপত্যকাই দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমে ত্রিশূলী-গণ্ডকীর উপত্যকা, পূর্বের উপত্যকায় হেলম্বুর জনপদ। খানিকটা এগিয়ে আরও কয়েকটা ঘর পেলাম, কিন্তু এর কাছাকাছি কোথাও জলের চিহ্নও নেই। একটা বেশ বড়, বৌদ্ধ চোর্টেন বা স্তূপ, পাথরে খোদাই করা লেখা "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ।" তাকে ডাইনে রেখে এগিয়ে চলা। এই জায়গারই নাম সম্ভবতঃ "সাওনে মনি"।

গাছের পাতাগুলিও তুষারে সাদা হয়ে গেছে। পথের রেখাটা পর্যন্ত তুষারে ঢেকে গেছে। সেই শুভ্র রেখা ধরে এগিয়ে চলেছি।

"যাঃ গেল", "কি"?

প্রশ্ন করি ডাঃ বিশ্বাসকে। উত্তর দেন না, কিন্তু সোজা বন্ধুকে হুকুম করেন—"যা তো ওই চোর্টেন এর উপর গ্লাভস্ জোড়া ফেলে এসেছি, নিয়ে আয়।' বন্ধু ছুটে গেল। বেশীদূর এগোই নি আমরা।

নায়কের নির্দেশে এখানে কুলিরা সকলে মাল নামিয়ে কুকরি হাতে

পাইন ও রডোডেনড্রন গাছের ডাল কেটে কেটে স্তূপাকার করে ফেলেছে। এখান থেকেই ওরা দুদিনের জন্য লাকড়ি সংগ্রহ করে নেবে। এরপর আরও উঁচুতে লাকড়ি আর পাওয়া যায় না।

আমরা না থেমে এগিয়ে চলি। পাহাড়টার ওপিঠে খানিকটা নীচে একটা মস্ত ময়দান যেন। সেখানে অনেকগুলি ঘর। খুপড়ী ঠিক বলা চলে না। ভাল ঘরই আছে অনেকগুলি, যেন কোন কালে একটা বেশ সাজনো গ্রাম ছিল। কোন কোন ঘরের ছাদে নতুন কাঠ পাতা। হয়তো বর্ষার সময় যাত্রীরা এখানে থেকেছে। তাই মেরামত করা হয়েছে। ঝরণার ধারার রেখা আছে কয়েকটা। কিন্তু এখন সবগুলি শুকনো। মনে হয়, এইটিই পরিত্যক্ত গ্রাম "থারে পটি"। আমরা ভাবছি, এখন সোয়া নয়টা, আজ এখানেই দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। জলও নিশ্চয় কাছে ভিতে পাওয়া যাবে। দেখি লামা আসুক, সে কি বলে শুনি!

আমাদের বিশ্রামের ফাঁকে বন্ধু ডানদিকের গিরিশিরাতে উঠে গেল, দেখতে। ওদিকে একটা চওড়া পথ চলে গেছে। ওইটিই সম্ভবতঃ হেলম্বুর বিখ্যাত গ্রাম মালেম্‌চির রাস্তা। আমরা ওদিকে যাব না।

কাঠমাণ্ডুতে প্রিন্সিপাল গাঙ্গুলী বলেছিলেন, এপথেই হেলম্বু পড়ে, দেখে আসবেন। হেলম্বু বা হেল্‌মু চিনিয়ালামার রাজত্ব বললেই হয়। ওখানে তাঁর মস্ত জমিদারী আছে। তিব্বত চীনা দখলে যাবার আগে চিনিয়ালামা নেপালের তিব্বতী এম্বাসাডার ছিলেন। বিশেষ করে এই অঞ্চলে তাঁর খুব প্রতাপ। এখন তিনি বোধনাথে থাকেন। হেল্‌মুর আরেকটি বিশেষত্ব আছে। এখানকার মেয়েপুরুষ সকলেই নাকি অপরূপ রূপবান। এদের রূপ জগৎবিখ্যাত।

উত্তরে বলেছিলাম, ওঁকে ওদিকে যেতে দেব না, তাহলে কি আর ফিরে আসবেন উনি?

হেসে কটাক্ষ করে বলেছিলেন গাঙ্গুলি-গিন্নি, "ছেলেরাও যে পরম রূপবান! তার কি হবে?"

এখন বন্ধুকে পাহাড়ের উঁচুতে উঠতে দেখে চেঁচিয়ে ডাকি, "ও বন্ধু, কি হেলমু যেতে চাও নাকি ?" হাসতে হাসতে বন্ধু ফিরে এসেছে। "কিচ্ছু দেখা গেল না। ভাবছিলাম, দু-একজন লোক বা গ্রাম ট্রাম দেখা যাবে অন্ততঃ।"

বহু বিদেশী ট্যুরিষ্ট এই পথেই হেলমু দেখতে যান। শুনেছি হেলমু অতি মনোরম স্থান। এখানে দশ বারোটি মনাষ্টারী আছে। এখানকার অধিবাসীরা এক জাতের শেরপা। এদের বিয়ে থাওয়াও নাকি হয় শেরপাদের সঙ্গেই। ল্যাংট্যাং-এর লোকদের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্কই নেই। এভারেষ্ট যাবার পথে সোলো ও খুম্বু এই দুটি জেলার লোকেরাই সাধারণতঃ শেরপা নামে পরিচিত। সোলো ও খুম্বু অনেক পশ্চিমে হলেও শেরপাদের মত দুর্দ্ধর্ষ পাহাড়ীদের পক্ষে সেখানের সঙ্গে সংযোগ রাখা কঠিন নয়। এপথে গেলে প্রথমে মালেমচি পড়ে, আরও এগিয়ে পূর্বের দিকে গেলে থারকেগিয়াং পৌঁছনো যায়। এই দুটি গ্রামই ইন্দ্রাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। ইন্দ্রাবতী নেপালের বিখ্যাত সুনকোশী নদীর একটি উপনদী। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকালে বিখ্যাত পর্বতারোহী টিলম্যান যখন ল্যাংট্যাংখোলা নদী যেখানে ল্যাংট্যাংহিমল পর্বত থেকে বেরিয়ে এসে ত্রিশূলীতে পড়েছে, সেই অঞ্চলে আসেন, সেই সময় বিখ্যাত গোসাঁইথান (২৬,২৯১ ফুট) শিখরটির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দক্ষিণে নামবার সময় গঞ্জা-লা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে থারকে-গিয়াং পৌঁছে ছিলেন। এই গঞ্জা-লা ১৮,০০০ ফুটেরও বেশী উঁচু, তাই শরৎকাল ছাড়া এপথে আসা সম্ভবপর ছিল না।

প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর দলবল সহ লামা এল। এখানে না থেমে, উপত্যকার ঘরগুলির মাঝখান দিয়ে সোজা নীচের দিকে নেমে চলল। কোথাও জল নেই। পথে যদিও অনেকগুলি শুকনো ধারা দেখা গেল। আরও নামছি তো নামছিই। পথ ক্রমশঃ ঢালু হলো, শেষে মস্ত মস্ত পাথর ছড়ানো. চলা রীতিমত কষ্টকর হয়ে

দাঁড়াচ্ছে। তবু চলতেই হবে, তাই চলছি।

সর্বকনিষ্ঠ, কৃষ্ণ বাহাদুর মাল নামিয়ে বিশ্রাম করেছে, খুব হাঁপিয়ে পড়েছে সে। কাল রাতে ওদের খাওয়া হয় নি। জলাভাবে রান্নাই করতে পারে নি। আজ কোথায় তাড়াতাড়ি করে রান্না করে খেয়ে নেবে, না, একি বিপত্তি! এত ঘর-বাড়ী, মাঠ, বন, কিন্তু জলহীন শুকনো সব।

এখনো নেমেই চলেছি। মনে হচ্ছে একটানা এক হাজার ফুট নামা হলো। ওই যে ঝরণার আওয়াজ পাচ্ছি যেন! না, সে ওপারের পাহাড়টায়। কি জানি, এত নেমে এলাম, শেষে কি ত্রিশূলী নদীতে নেমে জলাভাব মেটাতে হবে নাকি?

পশ্চিমে বহুদূরে ত্রিশূলী নদীর ক্ষীণরেখা সরু রূপালী সূতোর মত দেখা যাচ্ছে। ঘন সবুজ গাছপালার মধ্য দিয়ে পথ কেটে বয়ে চলেছে। ওপারের পাহাড়ে দুটো একটা গ্রামও দেখতে পাচ্ছি।

ঝরণার আওয়াজই তো! কৃষ্ণবাহাদুর এবার ছুটে চলেছে। মনবাহাদুর আর লামা জলের ধারে আগুন জ্বালবার চেষ্টা করছে। মস্ত একটা ঝরণা পাওয়া গেছে এখানে। আজ স্নানও করা চলবে। পথের উপরই প্লাষ্টিক চাদর বিছিয়ে রোদ্দুরে বসে বিশ্রাম নিতে বসেছি।

কি শীত! চলার পরিশ্রমে এতক্ষণ বুঝতে পারি নি, এখন থেমে থাকাতেই অনুভব করছি, অসম্ভব শীত এখানে। বেলা হতে হতেই কুয়াশা নীচের উপত্যকা থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে এসে আমাদের সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিল—সূর্যদেব সাথে সাথে অদৃশ্য।

অনেক দূরে বনের মধ্যে সবুজ গাছপালার ফাঁকে বড় সাদা মতন কি একটা দেখা যাচ্ছে, ভাল বোঝা না। বন্ধু বলে, ওই একটা ঘর নিশ্চয়। আজ রাত্রে ওখানেই আশ্রয় মিলবে।

লামাকে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর মেলে না। "কেয়া জানে! মালুম নেই ঘর মিলেগা কি নেই!" নির্বিকার সুরে লামা বলে।

কৃষ্ণবাহাদুর হেসে হেসে বলে, "আজ বনের মধ্যে গাছতলায় থাকতে হবে। ঘর পাওয়া যাবে না।"

ওর হাসি দেখে গা জ্বলে যায়। হতভাগা একটা!

বেশী দেরী না করে খাওয়া দাওয়া সেরেই আবার চলা সুরু করে দিই। একে শীত, তায় কুয়াশা, এখানে থেমে থাকার কোন অর্থই হয় না। রাত্রি কাটাবার জন্য একটা আশ্রয় জোটাবার ব্যবস্থা করতেই হবে।

ঘন বনের মধ্য দিয়েই পথ। প্রথমটা কিছুদূর উৎরাই হলেও শেষের দিকের পথের প্রায় সবটাই চড়াই। কষ্টকর নয়, ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠে যাওয়া। ঘন কুয়াশার পর্দা ঠেলে এগিয়ে চলেছি। ত্রিশ চল্লিশ হাতের বেশী দেখা যায় না। কাজেই পথ যে কোন দিকে, কেমন পথ, খুপড়ী আছে কিনা, কিছুই আগে থেকে জানবার উপায় নেই। পায়ের সামনে যে পথ এগিয়ে এসেছে, তারই উপর পা ফেলে এগিয়ে চলেছি, অনেকটা অন্ধের মত।

বেলা সাড়ে চারটার সময় একটা ভাঙা খুপড়ীর চিহ্ন পেলাম। দুদিকে আধখানা করে মাত্র দেয়াল আছে, একদিকে পাহাড়টাই দেয়ালের মত হয়ে রয়েছে, অন্যদিক সম্পূর্ণ খোলা। খোলা দিকটা উপত্যকার দিকে। অনেক নীচে বন্ধুর দেখা সেই সাদা 'ঘর' ছড়িয়ে চলে এসেছি। এখন দেখছি, ওটা ঘর নয়, নীচে বনেরই মধ্যেকার একটা মস্ত পাথর। দূর থেকে ঘরের মত দেখাচ্ছিল।

এখানে জলের আওয়াজও পাওয়া গেল। লামা বলল, একটু নীচে নামলেই জল পাওয়া যাবে। সুতরাং আজকে এখানে থাকা স্থির হলো। ঘরের পাশে অনেকটা জমি সমতল করা, তাঁবু থাকলে বেশ দু' তিনটে তাঁবু পাতা যেত।

মনবাহাদুর ও লামা মিলে কয়েকটা বাঁশ ও গাছের বড় বড় ডাল কেটে এনে পুঁতে দিল। তার উপর প্লাষ্টিক চাদর ঢাকা দিয়ে কোন-মতে আমাদের তিনজনার জন্য একফালি আশ্রয় তৈরী হলো। শাড়ী

দিয়ে উপত্যকার দিকটা ঢেকে দেওয়া গেল, কিন্তু কুলিদের জন্য গাছের পাতাশুদ্ধ ডাল ছাড়া আর কোন ঢাকনি রইল না। ওরা বললো, আগুন জ্বালিয়ে ওরা বেশ থাকতে পারবে। কিন্তু যদি বৃষ্টি হয়?

আগে থেকেই আমার ও ডাঃ বিশ্বাসের উচ্চতার জন্য অক্ষুধা সুরু হয়েছে। আমরা পানীয় ছাড়া কিছুই প্রায় খেতে পারছি না। বন্ধু দ্বিগুণ খেয়ে আমাদেরটা পুষিয়ে নিচ্ছে। এখানেও তাই হলো। আমরা ডালের স্যুপ খেয়ে শুয়ে পড়লাম, আর বন্ধু এখনো ক্রমাগত খেয়েই চলেছে। বলছে, আমার ক্ষিধেও altitude এর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে!

আজ পাহাড়ের পথে চতুর্থ রাত।

সাত

রাত কাটলো মন্দ নয়। বৃষ্টি নেই, হাওয়াও নেই, তাই ভালই বোধ করেছি সকলে। ভোর হতে হতেই কৃষ্ণবাহাদুর মস্ত একটা আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে, সুতরাং আর ভয়কি! কিন্তু আগুন ছেড়ে নড়বার উপায় কই? তাই রওনা হতে হতে ৭-২৫ মিঃ হয়ে গেল। মাথা থেকে বালাক্লাভাটা খুলে মুখ ধুতে যাবো, দেখি চশমার ডাঁটিটা খুলে এল। কি করি এখন? চশমা ছাড়া আমি যে একেবারে অন্ধ!

ওষুধের ব্যাগ খুলে ষ্টিকিং প্লাষ্টার বের করে উনি ভাঙা ডাঁটি জোড়া দিয়ে দিলেন। সাবধানে ব্যবহার করতে হবে, আবার ভাঙলে এমনি করে জোড়া দেওয়াও আর চলবে না।

পথ চলতে চলতে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে নায়ক জানায়, কোথায় কতদূরে যে আজকে রাত কাটাবার জায়গা পাওয়া যাবে, তা সে জানে না। তবে চলতে চলতে পথে হয় খুপড়ী না হয় গুহা, একটা না একটা কিছু জুটবেই।

আমরা ১৫,০০০ ফুট উঁচুতে উঠে এসেছি বলে মনে হচ্ছে। হাল্কা হাওয়াতে দম নিতে কষ্ট হচ্ছে, তাই একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ছি। আমাদের চলার গতি আরও মন্থর হয়ে গেছে। কুলিরা এগিয়ে গেছে। ডাঃ বিশ্বাস বলছেন, সামনের চড়াইটা উঠে তবে যেখানে ঝরণা পাওয়া যাবে সেখানেই রান্নার যোগার করতে হবে। তাই তারা এগিয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে চলেছি। চড়াই-কেবলই চড়াই। রডোডেনড্রন গাছ শেষ হয়ে গেছে, তার সাথে সাথে বড় গাছের রাজত্বই শেষ হয়ে গেল। এখন রুক্ষ্ম শক্ত ঘাসের মাঝে মাঝে কেবল ছোট ছোট জুনিপারের ঝোপ আর দুটি একটি নীল জেন্‌সিয়ানা ফুল।

বাঃ, বাঃ ওখানে কি কেউ একখানা নীল ফুল তোলা কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে নাকি? নীল জেন্‌সিয়ানাতে যে পাহাড়ের সবুজ গা ঢেকে গেছে। ওই, আবার ওই দিকে! কি অপরূপ শোভা আজকের পথের! অগণ্য নীল ও বেগুনি জেন্‌সিয়ানা ফুল ফুটে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। কত বড় বড় ফুলগুলি। হিমালয়ের অনেক জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু এত বড় বড় জেন্‌সিয়ানা কোথাও দেখিনি।

মস্ত বড় একটা ঝরণা। মস্ত মস্ত পাথর উঁচু থেকে গড়িয়ে এসেছে তার গতিপথে। তাই কি বাধা মানে সে? দুর্বার গতিতে সেগুলি ডিঙিয়ে নেমে আসছে অপূর্ব উচ্ছল রূপালী ঝরণা।

পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে আরও একটা ঝরণা। আহা, কি অপরূপ রূপ তার! যে জলের জন্য কাল সমস্ত সকাল হাহুতাশ করেছি, আজ সকালে সেই অমৃতধারা একটার পর একটা অবহেলায় পার হয়ে চলেছি। এখানেও থামবো না—"দুই মাথি পর" এখনো পৌঁছনো হয়নি যে!

ক্রমাগত চড়াই ওঠা, আর যে পারি না। একটা "মাথি" চোখের সামনে এগিয়ে আসছে, সেটা পার হয়েই আরেকটা "মাথি"-হিমালয়ের ফণাও কি শত সহস্রটা?

কিন্তু, মাথা ঘুরছে কেন? চোখ চাইতে কষ্ট হচ্ছে, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে। কি মুস্কিল, উচ্চতার জন্যই এমন বোধ হচ্ছে। এখন কি করি?

"ওগো, কোথায় ওরা? আমার যে বড্ড মাথা ঘুরছে, চলতে পারছি না। কতদূরে ওরা? কোথায় থামবে ওরা"? ডাঃ বিশ্বাসকে ডেকে বারবার জিজ্ঞাসা করি।

বন্ধু তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে "আমার হাত ধরে আসুন।" তাই করি। বন্ধুর হাত ধরে আরও খানিকটা এগোই, খুব অসহায় বোধ করছি তবু।

অবশেষে বসে পড়েছি। পথের ধারে সেখানে থোপা থোপা নীল ও বেগুনী জেন্‌সিয়ানা ফুটে আছে, সেই ফুলের কার্পেটের উপর বসে পড়েছি। আর একবিন্দু চলবার শক্তি নেই।

"তুমি বসে পোড়ো না, আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে এগোও। আর বন্ধু, তুই এগিয়ে দেখ, লামারা কতদূরে আছে, ওদের একজনাকে পাঠিয়ে দে সাহায্য করবার জন্য।" ডাঃ বিশ্বাস বন্ধুকে আদেশ করেন।

দ্রুত পায়ে বন্ধু এগিয়ে গেল। মিনিট পনের মধ্যেই লামা ও কৃষ্ণ-বাহাদুর ছুটে এসে গেল। আমাকে ওদের দুজনার হাতে সঁপে দিয়ে উনি চলা সুরু করলেন। লামা হাত ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে চলেছে। পথ কঠিন নয়, কিন্তু চলবার শক্তি নেই যে!

ওরা বেশী দূর যায়নি। একটা প্রকাণ্ড ঝরণার ধারে বসে উনুন ধরিয়ে ফেলেছে। মস্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

থেমেও নিশ্চিন্দি নেই, উঃ কি শীত! নীচের উপত্যকা বেয়ে কুয়াশা ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে উপরে উঠছে। এগিয়ে এসে আমাদের সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিল। ঢেকে গেলেন সূর্য্যদেবও, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উত্তাপটুকুও চলে গেল। বন্ধু একটা কম্বল বের করে এনে দিল, তাই ঢাকা দিয়ে প্লাষ্টিকের চাদরের উপর পথের মাঝে নির্জীবের মত শুয়ে পড়েছি।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, দুটি উঁচু নেড়া পাহাড়ের খাঁজের মধ্য দিয়ে ঝরণার ধারাটা কেমন সুন্দরভাবে নেমে আসছে। তার পথের উপর গড়িয়ে আসা মস্ত মস্ত পাথর পড়ে। উচ্ছল জলধারা তার উপর দিয়ে যেন নেচে নেচে নামছে। আরও সুন্দর দেখাচ্ছে তাতে।

ওদিকে দুটি উনুন জ্বেলে লামারা দুটি হাঁড়িতে রান্না বসিয়েছে। একটা ওদের জন্য, অন্যটা আমাদের জন্য। লামা ব্যস্তভাবে রান্নার

যোগাড় করছে কিন্তু ল্যাংট্যাংবাহাদুর আর কৃষ্ণবাহাদুরের যেন কোন তাড়া নেই, তারা উনুনের আগুনে বসে হাত পা সেঁকছে। ওদের পাশে গিয়ে বসলে একটু গরম হওয়া যেত, কিন্তু উঠে যে ওদের কাছে যাবো, সেটুকু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই।

খেতে পারলাম না বিশেষ কিছু। জোর করে খানিকটা ডালের জলে চুমুক দেওয়া গেল। ভাগ্যে উনি কাঠমাণ্ডু থেকে অনেকগুলি লেবু এনেছিলেন, তাই সেটুকু গেলা গেল। এত ঠাণ্ডা, তার উপর কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা, তাই স্নানও আর হলো না।

একটার মধ্যেই আবার চড়াই ওঠা সুরু। আবার তেমনি 'মাথির' পর 'মাথি' সুরু, একটা ডিঙিয়ে একটু নেমে আবার আরেকটা উঠতে হয়। কিন্তু পথের রূপ পালটে গেছে। চারিদিকে এখন কেবল মস্ত মস্ত পাথর ইতস্ততঃ ছড়ানো, মাঝে মাঝে খুপড়ীর ধ্বংসাবশেষ। ছোট ছোট শক্ত ঘাস ও দুটো চারটে জুনিপার ছাড়া আর কোন গাছ নেই, ফুলের রাজ্যও শেষ হয়ে গেছে। রুক্ষ প্রকৃতির রুদ্র রূপ!

এ বেলা অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। আর মাথা ঘুরছে না, তাই বেশ চলতে পারছি। মাঝে মাঝে দেখ না দেখ করে কুয়াশা এসে আমাদের ঢেকে দিচ্ছে। তখন চার পাঁচ হাত দূরের জিনিষও আর দেখা যাচ্ছে না। আবার একটু বাদে মেঘ সরে যাচ্ছে। আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হতে হতেই আবার ঘন কুয়াশা ফিরে আসছে। যেন মেঘ সূর্য্যের লুকোচুরি খেলা!

সামনেই মস্ত একটা গুহা, লামা দেখায়। নাঃ, এখানে এত শিগ্‌গির থামা চলবে না। এখন মোটে দুটো বেজেছে, আরও এগিয়ে চলো, ডাঃ বিশ্বাস বলেন।

তাই আরও এগিয়ে চলি। পছন্দমত খুপড়ী দেখা যাচ্ছে না, গুহায় নেই। বেলা তিনটা অবধি চলে বাসস্থানের খোঁজ সুরু করা হলো। জলও কাছাকাছি চাই, নইলে চলবে না।

কয়েকখানা খুপড়ীর ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ ছড়ানো। কোনটাই

আস্ত নেই, ছাদই নেই। কোন কোনটার দেয়াল আছে অবশ্য, তবে চলনসই একটাও পাওয়া যাচ্ছে না। লামা বলে, জুলাই-আগষ্টের মেলা এখান থেকেই সুরু হয়। বেলা পড়ে এল, এখানেই কোথাও থাকবার বন্দোবস্ত করতে হবে। কাছে একটা ছোট ঝরণাও আছে, জলের অসুবিধা হবে না।

একেকটা খুপড়ীর ধ্বংসাবশেষের দিকে করুণ নেত্রে তাকিয়ে দেখি, হায় ভগবান! শেষে কি এই সব খুপড়ীতে থাকতে হবে! এ যে কিছুই নেই। চার টুকরো প্লাষ্টিকের চাদরে ছাতটা কোনমতে ঢেকে নিলেও, দেয়ালের সবটা নেই যে!

ক্রমশঃ মনটা দমে যাচ্ছে। পাথরের উপর বসে পড়েছি। খুব রক্ষা যে এখন হাওয়া নেই। শুনেছি, এখানে সাধারণতঃ ভীষণ জোরে হাওয়া বয়। তীর্থ যাত্রীরা অনেকে তাতেই মারা পড়ে। কিন্তু এই প্রচণ্ড শীতে প্রায় উন্মুক্ত ময়দানে রাত কাটাবো কি করে।

কৃষ্ণবাহাদুর আর ল্যাংট্যাংবাহাদুর ইতিমধ্যেই আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। মেলার সময়কার ফেলে যাওয়া অনেক বাঁশের কঞ্চি পড়ে পড়ে আছে, তাই জ্বালিয়ে মস্ত আগুন করে তার ধারে বসে হাত পা সেঁকছে। ল্যাংট্যাংবাহাদুরের পরণে লম্বা পাজামা নেই, কেবল খাটো ইজের পরা, গায়ে অবশ্য ছেঁড়া সার্ট আছে। তাই পরেই সে এই বরফের রাজ্যে এসেছে। তাই সে সর্বদাই আগুন জ্বালাবার তালে থাকে। ল্যাংট্যাং পাহাড়ের রাজ্যে ও প্রায় ল্যাংটা বলে ওর নাম আমরা দিয়েছি ল্যাংট্যাংবাহাদুর। আসল নাম নতুন নামের নীচে চাপা পড়ে গেছে।

লামা কিন্তু ওদের মত নিশ্চিন্তে বসে নেই, পুরো দলের ভার ওর উপর। ঘুরে ঘুরে দেখছে কোন চলনসই খুপড়ী বা গুহা পাওয়া যায় কিনা।

"ছোট মামা, একটু আগে একটা গুহা ফেলে এসেছি।" বন্ধু বলে। তৎক্ষণাৎ ডাঃ বিশ্বাস বন্ধু ও লামাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন

গুহা দেখতে। আমি হাঁটুতে মাথা গুঁজে পাথরের উপর আগুনের পাশে বসে রইলাম।

একটু বাদেই লামা ফিরে এল। এসে ওর মাল তুলে নিয়ে ফিরে চললো। অদূরেরই একটা চলনসই গুহা আছে, আজকের রাত সেখানেই কাটাতে হবে।

একখানা বিশলকায় পাথর পাহারের ঢালু গায়ে বসানো, তারই তলায় ত্রিকোনাকার গুহার সৃষ্টি হয়েছে। ওঁরা দেখে বললেন, ওর ভিতর তিনখানা বিছানা পাতা যাবে, তবে সেই গুহাতে দাঁড়ানো চলবে না, শোবার সময়ে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানাতে ঢুকতে হবে। পায়ের দিকটা এত নীচু যে শুলে পায়ের আঙুল ছাতে ঠেকে যাচ্ছে। ওই গুহাতেই আমাদের বিছানা তিনখানা বিছানোও হলো। গুহার সামনের খানিকটা আধঢাকা জায়গাও প্লাষ্টিকের চাদর ও শাড়ী দিয়ে পুরো ঢাকবার ব্যবস্থা করে দিল বন্ধু। লামা ওকে সাহায্য করছে! ওই জায়গাটুকুতে কুলিরা কোনমতে থাকতে পারবে।

খুব কষ্ট হচ্ছে বন্ধুর। আমাদের দলে সর্বকনিষ্ঠ ও সবল, তাই কাজের বোঝা ওরই ঘাড়ে পড়ে সর্বদা। কিন্তু এখানে নড়তে নড়তেই দম শেষ হয়ে যায়, কাজ করার শক্তি আর থাকে না কারুর।

তবু যাহোক একটা আশ্রয় পেয়ে সকলেই খুসী হলাম। একেবারে পাশেই একটা তির্‌তিরে ঝরণাও পাওয়া গেল, সুতরাং জলের সমস্যাও মিটলো। অসম্ভব শীত, হাত পা ঠাণ্ডায় জমে গেল যেন। আর আমরা রান্না করা কিছু খাবো না। দল নেতা ডাঃ বিশ্বাস বসে বসে রুটি কাটবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। এক সপ্তাহ আগেকার পাঁউরুটি। কাঠমাণ্ডু থেকে আনা, এখন শক্ত কাঠের মত হয়ে গেছে। লামা কুকরী দিয়ে টুকরো করে দিলো। পাথরের মত জমাট বাঁধা মাখন, তাও কাটা যাচ্ছে না। ডাঃ বিশ্বাসের হাত প্রতিমূহুর্তে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। আগুনে একবার একবার সেঁকে নেন, আবার মাখন কাটেন, জ্যাম লাগান। আবার কখনো কখনো ছুরিটাও আগুনে সেঁকে গরম

করছেন। সুইস্‌রা নেপালে একটি পনীরের কারখানা গড়েছে, আমরা কাঠমাণ্ডু থেকে সেই পনীর কিনে নিয়ে এসেছিলাম। সেটাও কাটছেন। আমি আজ আর ওর মধ্যে নেই, নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে আগুনের ধারে বসে আছি। মস্ত বড় করে আগুন জেলে দিয়েছে মনবাহাদুর। ওরা আশে পাশের পাহাড় থেকে প্রচুর জুনিপার সংগ্রহ করে এনেছে, তাই আগুনে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে। বন্ধু মাখন, জ্যাম, পনীর মাখানো রুটির টুকরো হাতে পাচ্ছে আর কফিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে এক এক গ্রাসে এক একটা খেয়ে নিচ্ছে। আমাদের ভাগে কম পড়লেও, আজ মন্দ খাওয়া হলো না। শেষকালে পুরো এক গ্লাস দুধ ভরা গরম কফিতে শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

জামা কাপড়, বালাক্লাভা, মোজা শুদ্ধ স্লিপিংব্যাগে ঢুকে শুয়ে পড়েছি, কেবল জুতো জোড়া খুলে। এখন মোটে ৬৷৷০ টা বেজেছে। কিন্তু মনে হয়, যেন কত রাত হয়ে গেছে। বেশ আরামের বিছানা, তবু হাত পা কি সহজে গরম হয়?

সামনে একটা মস্ত পাথরের আড়ালে হাওয়া বাঁচিয়ে একটা হাঁড়িতে নিজেদের জন্য লামা ভাত চাপিয়েছে। কৃষ্ণ বাহাদুর আর ল্যাংট্যাং তার দুপাশে বসে। লামা সকলকে প্রয়োজন মত সাহায্য করছে। বন্ধু বিছানায় শুয়ে প্লাষ্টিকের চাদরের ফাঁক দিয়ে উনুনের উপর ফুটন্ত ভাতের দিকে তাকিয়ে মস্ত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

"বেশ লাইট খানা খাওয়া গেল আজ।"

বেচারী!!!

রাত দুপুরে ডাঃ বিশ্বাসের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল।

"ও বন্ধু, বন্ধু, শিগ্‌গীর ছাতিটা খুঁজে দে। বরফ পড়ছে রে, আমার মাথা যে ঢেকে গেল!"

প্লাষ্টিকের চাদরের পর্দাতে পাহাড়ের গুহার মুখের সবটা ঢাকেনি, একটা কোন ফাঁক ছিল, সেই ফাঁক দিয়ে হালকা তুষার উড়ে উড়ে এসে পড়ছে তাঁর মাথায়। উনি ছাতি খুলে মাথায় ঢাকা দিয়ে শুয়ে

রইলেন। আমার কোন অসুবিধা নেই, দুজনের মাঝখানে দিব্যি আরামে আছি।

ঘন কুয়াশার মধ্যেই ভোর হয়েছে। সকালে দেখা গেল ডাঃ বিশ্বাসের বিছানার একটা ধার তুষারে ঢেকে গেছে। আজ আমাদের যাত্রার সপ্তম দিন। লামা বলছে, মনবাহাদুরও তাতে সায় দিচ্ছে, আজ হয়তো সন্ধ্যা নাগাদ আমরা গোসাঁইকুণ্ডে পৌঁছাতে পারবো। গতকাল বলেছিল, আজ সকালে দশটা নাগাদ পৌঁছাবো, কিন্তু অতি ধীরে চলা দেখে এখন বলছে, সন্ধ্যায় পৌঁছালেও পৌঁছাতে পারি। আমরা একটু অস্বস্তি বোধ করছি। এতদিন লাগবে, আমরা আশা করিনি। গোসাঁইকুণ্ড পৌঁছাতে এখনো পুরো দুটি বেলা বাকি।

বন্ধু চেঁচাচ্ছে, "ছোটমামা শিগ্‌গির করে বাইরে বেরিয়ে এসো, দেখো, তুষারে কেমন সব সাদা হয়ে গেছে।"

তা দেখতে বেশী কষ্ট করতে হয় না। বিছানা থেকে উঁকি মেরেই দেখতে পাই, তুষারের একখানা সাদা চাদর যেন চারিদিকের পাথর-গুলিকে পর্য্যন্ত ঢেকে ফেলেছে, পাথর ও মাটীর রং নিঃশেষ করে মুছে একাকার করে দিয়েছে।

লামা প্লাষ্টিকের চাদরের উপর জমা তুষার ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। কৃষ্ণবাহাদুর তাড়াতাড়ি উঠে জড়ো করা জুনিপার গাছের স্তূপের উপর ছড়ানো তুষার ঝেড়ে ফেলে আগুন জ্বালাবার দিকে মন দিয়েছে। ওগুলি কাঁচাও জ্বলে বেশ। আমরা তারই উত্তাপে হাত পা উত্তপ্ত করে নিয়ে রওনা হবার উদ্যোগ করি।

ন্যাড়া পাহাড়ের পথে চলা। দুটো একটা জুনিপারের ঝোপ দেখা যাচ্ছিল, এখন তাও তুষারে ঢেকে একাকার হয়ে গেছে। সব-চেয়ে বিপজ্জনক কথা হলো যে, আমাদের পায়ে চলা পথের হালকা দাগটুকুও ঐ তুষারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। দিগ্‌ নির্ণয় করে চলাই মুস্কিল। চতুর্দিক একাকার হয়ে গেছে তুষারে। আশপাশের পাহাড় যতটুকু দেখা যাচ্ছিল, কুয়াশাতে সেটুকুও ঢেকে দিয়েছে।

লামাই এখন একমাত্র ভরসা। সে এপথে দুবার এসেছে। সুতরাং পথ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল বলে সে দাবী করে। তার পিছু পিছু চলেছি।

লামা ক্রমাগতই বলছে, "গোসাঁইকুণ্ড আভি ভি বহুৎ দূর হ্যায়।" কি জানি, রোজই ভাবি এসে গেলাম, পথটা যেন রবারের মত বেড়েই চলেছে।

আজকের পথ মোটামুটি চড়াই হলেও ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠেছে। ও ব্যাটারা এপথে এসেছে কিনা এখন কেমন সন্দেহ হচ্ছে। সামনের উঁচু পাহাড়টায় পথের একটা ক্ষীণরেখা যেন দেখা যাচ্ছে। ওই পাহাড়টাতো পার হতেই হবে, তারপরের পথ কেমন? তা কেউ বলতে পারে না। কখনো বলে চড়াই, কখনো বলে সমান সমান।

"আজ গোসাঁইকুণ্ড জরুর পৌঁছে গা।" বলে ভরসা দেয়—আবার খানিক পরে "বহুৎ দূর" বলে মন খারাপ করে দিতেও ওদের আটকায় না। কি জানি, কোনদিনই কি গোসাঁইকুণ্ডে পৌঁছাতে পারব না?

বেলা সাড়ে ন'টার সময় আমরা একটা সুন্দর টলটলে জলের বড় ঝরণা পেলাম। নায়ক সেখানেই বসে গেছে রান্না করতে। আমরা প্লাষ্টিকের চাদর পেতে শুয়ে পড়েছি বিশ্রামের জন্য। তাও নিশ্চিন্ত হবার কি উপায় আছে? দিব্যি পরিষ্কার আকাশ ছিল, হঠাৎ কোথা থেকে কুয়াশা এসে ঘিরে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাত। অগত্যা ছাতা খুলে বসে থাকি। ভাগ্য ভাল, অল্পক্ষণের মধ্যেই তুষারপাত থেমে গেল।

অনেক কষ্টে খিচুড়ী রান্না হলো। উচ্চতার জন্য ভাল করে সিদ্ধ হয় নি। সেই আধসেদ্ধ খিচুড়ীই অনেক চেষ্টা করে গলাধঃকরণ করে পৌণে একটায় আবার চলা সুরু করলাম।

মন্দ ভাগ্য আজ আমাদের তাড়া করে নিয়ে চলেছে যেন। একে পথ দেখা যায় না, কাল রাত্রে পড়া তুষারে ঢেকে রয়েছে, তায় পিছল। ক্রমাগত পা পিছলে যাচ্ছে। লামাদের পিছু পিছু ওদের

পায়ের চিহ্ন ধরে সন্তর্পণে চলেছি। এর উপর আবার তুষারপাত সুরু হলো। এবার আর থামবার নামটি নেই। প্রথমে যেন সাদা সাদা সরষের দানা ঝরছিল, ক্রমে পেঁজা তুলো চতুর্দিক অন্ধকার করে এলোমেলো উড়তে লাগল। আমাদের চারিদিক থেকে তুষার যেন ছেঁকে ধরল। ছাতি মাথায় দিয়ে কেবল মাথাটুকুই বাঁচে, সর্বাঙ্গে তুষার পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়ে তুষার ঝেড়ে ফেলছি, কিন্তু কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাচ্ছে না। এই অঞ্চলে তুষারপাত বর্ষার পর বোধহয় এই প্রথম, শীত আসবার লক্ষণ। এরপর এখানে ক্রমাগত তুষার জমে জমে পথ চলবার অযোগ্য হয়ে যাবে। কানে ক্রমাগত নেপালী মেয়েটির কথা বাজছে—"হিম পড়ছ শক্‌ছনো—হিম পড়ছ শকছ না।"

সামনের উঁচু পাহাড়টায় চূড়ায় আধঘণ্টার মধ্যেই উঠে এলাম। সামনে ওই রকম আরও একটা উঁচু পাহাড়, তার চূড়াতে বৌদ্ধ চোর্টেন এবং ধ্বজা দেখা যাচ্ছে। তবে ওইটিই কি এ পথের সবচেয়ে উঁচু জায়গা? তাহলে ওর পরের পথ তো উৎরাই না হলেও সমতল হবার কথা। বৌদ্ধরা চলার পথের সবচেয়ে উঁচু ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণ জায়গায় সাধারণতঃ অমনি পাথরের স্তূপ বা চোর্টেন তৈরী করে রাখে।

এইটুকু মাত্র পথ, তাও যেন শেষ হতে চায় না। মোটে আধঘণ্টা চলেছি, মনে হচ্ছে যেন কতক্ষণ ধরে চলেছি। সামনে দেখছি, ওই তো লামারাও সারি বেঁধে চলেছে, ওরা চূড়ায় পৌঁছেও গেল!

মনবাহাদুর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি যেন বলছে। কি বলে ওরা? যেন অসাড় হয়ে গেছে শ্রবণ যন্ত্র। ডাঃ বিশ্বাস কান পেতে শুনে বল্লেন, "মনবাহাদুর বলছে, 'কুণ্ড হিঁয়াই হ্যায়, পাঁচ মিনিট মে আপ পৌঁছে যায়েগা'।"

সে কি কথা? আধ ঘণ্টা আগে ওই মনবাহাদুরই বলেছে, বিকালের আগে আর কুণ্ডে পৌঁছাতে পারবো না!

চড়াইর বাকীটুকু উঠতে পাঁচমিনিট না হলেও পনের মিনিটেরও

কম লাগল। আমরা চূড়ায় চোর্টেনের কাছে উঠে দেখি সামনে শত-খানেক ফিট নীচে প্রকাণ্ড একটি টলটলে জলের হ্রদ, তার চারিদিকে পাহাড় ঘেরা। নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যে চতুর্দিকের সদ্য তুষারাচ্ছন্ন পাহাড় ও উপরের নীল আকাশের ছায়া পড়ে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। আকাশ কি করে হঠাৎ যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে, কুয়াশার পর্দা সরে গেছে। তুষারপাতও হচ্ছে না। পাহাড় ধীরে ধীরে জলের ধার অবধি নেমে গেছে। কুণ্ডের চারিদিককার ঘাসে ঢাকা মাঠে কিন্তু তুষারের চিহ্ন মাত্র নেই। অপূর্ব সুন্দর হ্রদ ও চারিদিকের দৃশ্য। আমরা পথের কষ্ট ভুলে বিস্মিত, স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভাবি, এই সেই বিখ্যাত গোসাঁইকুণ্ড, যার জন্য আমরা এতদিনে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে এসেছি। এখন আমাদের সকল দুঃখের অবসান হয়েছে।

দুঃখ নেই বা বলি কি করে? মস্ত ভুল করেছি যে! বেলা দশটার পর কোনদিনই ভালো আবহাওয়া পাচ্ছি না দেখে আজ আমার ক্যামেরাটা দুপুরে ব্যাগে পুরে কুলিদের কাছে দিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া লামাদের মতে আজ বিকালের আগে তো গোসাঁইকুণ্ড পৌঁছানোর কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং ক্যামেরার দরকারই বা কি! যে সব ন্যাড়া পাহাড়ের পথে এসেছি তার মধ্যে ছবি তুলবার যোগ্য কোন দৃশ্যই সকাল থেকে পাইনি। এখন খুব আফ্‌শোষ হচ্ছে। ডাঃ বিশ্বাস কিন্তু সে ভুল করেন নি, এখন পরিষ্কার আকাশ, উজ্জ্বল দৃশ্য পেয়ে ছবির পর ছবি তুলে চলেছেন।

শুনেছিলাম, এখানেই কুণ্ডের ধারে যাত্রীদের থাকবার ধরমশালা আছে, কিন্তু কোথায় সে সব? সবাই চারিদিকে খুঁজে বেড়াই, লামা মাল নামিয়ে এগিয়ে গেল। কোথাও ঘর নেই। সকলেই তো বলছে, একেবারে কুণ্ডের তীরে ধর্মশালা পাবেন। শেষ গ্রাম বালোম্‌জিতেও আমাদের আশ্রয় দাতা এই কথাই বলেছিলেন। সকলের কথাই কি ভুল হল?

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পর আমরা নিরাশ হয়ে

পড়লাম। এমন অপরূপ দৃশ্য, প্রাণভরে উপভোগ করবো তাও আমাদের কপালে নেই। অগত্যা ডাঃ বিশ্বাস লামাকে বলেন, তবে চলো এখনি ফিরতি পথে ত্রিশূলীর রাস্তা ধরি। ওই পথের কোথাও খুপড়ী বা গুহাতে আজকের রাতের মত থাকবার আস্তানা খুঁজে নিতে হবে তো!

ত্রিশূলীর পথ কোন দিকে? জবাবে লামা জানায়: হ্রদের ডান দিকের পাহাড়ের উপর দিয়ে যেতে হবে। অগত্যা মনঃক্ষুন্ন হয়ে সেই পথেই চলা সুরু করা গেল। তবু মোহ যায় না, আমরা ধীরে ধীরে এদিক ওদিক ঘুরে দেখবার চেষ্টা করে শেষ পর্য্যন্ত লামাদের অনুসরণ করতে থাকি। মোটে আধঘণ্টা থাকতে পারলাম এখানে। আশা ছিল, পুরো একটা দিন কাটাবো!

কুণ্ডটিকে বাঁয়ে রেখে আমরা অল্প একটু এগোতেই দেখি, আরও ছুটি হ্রদ পাশাপাশি রয়েছে। মাঝখানের গিরিশিরা দিয়ে পায়ে চলা পথ। হ্রদ ছুটি অনেকটা ছোট, কিন্তু বেশ স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ। আমরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছি। ছবি তোলার জন্য উনি পাহাড়ের উঁচুতে উঠে গেছেন। বন্ধু তাঁকে অনুসরণ করেছে। লামারা গিরিশিরার উপরের হাঁটা পথ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আরও হ্রদ যে! অপূর্ব মনোরম স্থান। আমরা খুশীর আনন্দে আরও এগিয়ে চলি। হঠাৎ কুয়াশা এসে চারদিক ঘিরে ফেলে। একটার পর একটা হ্রদ পার হয়েই চলেছি, কতগুলি তা ঠিক করে গোণাই হল না। মনে হয় আট দশটির কম হবে না। সবগুলিরই তীরের গিরিশিরা ধরে পথ। এদিকে কুয়াশা আসবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তুষারপাত সুরু হয়ে গেল। ছাতি মাথায় দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে চলেছি, তবে অবর্ননীয় সৌন্দর্য্যময় পথে চলা, তাই এখন আর কষ্ট বোধ হচ্ছে না।

কয়েকটা ছোট ছোট হ্রদ পার হয়ে একটা হ্রদের প্রান্ত দেশে এসে পৌঁছলাম। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে রয়েছি আমরা, খাড়া

উৎরাই পথে এবার নেমে হ্রদের তীরে পৌঁছাতে হবে। হ্রদের সবটা দেখাও যাচ্ছে না। আশ পাশের পাহাড়ের সঙ্গে হ্রদের অনেকাংশ কুয়াশাতে ঢেকে রয়েছে, এখনো সমানে তুষারপাত হচ্ছে।

অনেক নীচে কুলিদের রঙ্গিন জামাগুলি ক্ষণিকের জন্য দেখা গেল। নীল জলে ভরা হ্রদের তীর ধরে এখন ওদের চলবার পথ। আমরা কঠিন উৎরাই পথে তুষারে ঢাকা পিছল পথে অতি সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে চলেছি।

"দেখো, দেখো, ওখানে ঘরের মতন দেখা যাচ্ছে না?" ডাঃ বিশ্বাসকে থামিয়ে বলি। "কই, কই!" উনি বলেন।

অনেকদূরে নীচে প্রায় হ্রদের শেষ প্রান্তে যেখানে এখন কুলিদের রঙ্গিন জামাগুলি আব্ছা আব্ছা দেখা যাচ্ছে, হঠাৎ মেঘের ফাঁকে বিদ্যুৎচমকের মত মনে হল যেন ক'খানি ঘর উঁকি দিল।

"ওই, ওই, ওইতো ধরমশালা। ধরমশালা নয়? যাঃ ঢেকে গেল"। আবার চলি। আবার কুয়াশা এসে হ্রদের নীলজল ঢেকে দিল।

এবার দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে চলি, যেন বন্ধু ও ডাঃ বিশ্বাসকে পথ দেখাচ্ছি। ওঁরা ঘরগুলি একবারও দেখতে পান নি।

নীচে জলের ধারে পৌছানোর পর দৃশ্যপটের সমস্তটা দেখা গেল। সুবিশাল হ্রদ, এখন তার প্রায় সবটাই কুয়াশায় ঢাকা। স্বচ্ছ জল, তুহীন শীতল। লম্বা পানা দেখতে, প্রায় শেষ প্রান্তে অনেকগুলি পাথরের তৈরী ঘর আছে। একটা পাথরের স্তূপের উপর কয়েকটা বাঁশে পতাকা উড়ছে। কুলিরা সেখানে প্রায় পৌঁছে গেছে।

এইটাই তাহলে গোসাঁইকুণ্ড, আগেরটি তবে সূর্য্যকুণ্ড।

মনের মধ্য থেকে মস্ত বোঝা যেন নামলো!

জলের ধারে পৌঁছে উনি বলেন, "এসো আমরা জলস্পর্শ করি।"

সকলে তুহিন শীতল জল আঁজলা করে তুলে মুখে, মাথায় দিলাম। অপূর্ব তৃপ্তি পেলাম, যেন নবজন্ম লাভ হলো। আমাদের এতদিনকার

আকাঙ্ক্ষা আজ তৃপ্ত হলো। মন আনন্দে ভরে গেল।

ধীরে ধীরে কুয়াশা অপসারিত হচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, সুবিশাল হ্রদ, পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। চারিদিকে সুউচ্চ পর্বত-মালা ঘেরা। নিস্তরঙ্গ গাঢ় স্বচ্ছ নীল জলে সবগুলি চূড়ার ছায়া পড়েছে। .এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত তুষারপাতে সর্বত্র শুভ্র আবরণ পড়ে আরও অপরূপ দেখাচ্ছে। তবু হ্রদের অনেকটাই ঢাকা। কুয়াশার পর্দা সম্পূর্ণ সরে যায় নি, সূর্য্যদেবেরও দেখা নেই।

জলের ধারে ধারে পূজা করবার অনেক চিহ্ন দেখতে পেলাম। শুকনো ডাব নারকেল গড়াগড়ি খাচ্ছে। কাঠমাণ্ডুর বিখ্যাত পরাস হোটেলের খাবারের খালি কাগজের বাক্স উড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন নেই।

জলের ধার থেকে একটু উঁচুতে আটদশটি ঘর এদিক ওদিক ছড়ানো। এইগুলিই তবে ধর্মশালা। তার মাঝখানে খোলা ময়দানে মস্ত পাথরের বেদী। বেদীর মাঝখানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। পাশে পাথরের তৈরী ছোট একটি বৃষ। মস্ত উঁচু উঁচু কয়েকটা বাঁশে পতাকা উড়ছে। শিবলিঙ্গের সর্বাঙ্গ হলুদ চন্দনে চর্চ্চিত।

ইতি মধ্যে লামারা সবচেয়ে কাছের বড় ও ভালো ঘরখানি অধিকার করে নিয়েছে। ঘরগুলির দেয়াল পাথরের তৈরী, ছাদ কাঠের তক্তা পেতে তৈরী করা। মাঝে মাঝে জোড়ের কাছে ফাঁক থেকে গেছে। তুষারপাত সুরু হতে ঐ ফাঁকগুলি দিয়ে ঝির ঝির করে তুষার পড়তে লাগল। পাশের ঘরখানির ছাদে কয়েকখানা তক্তাই নেই। সেটার মেজে তাই এতক্ষণে তুষারে ভরে গেছে।

কুলিরা মালপত্র নামিয়েই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণবাহাদুর ও ল্যাংট্যাং ইতিমধ্যেই ওদের বয়ে আনা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। লামা আর মন বাহাদুর প্লাস্টিকের চাদরগুলো নিয়ে ছাতে চলে গেছে, বন্ধুর নির্দ্দেশ মত ছাতে পেতে দিচ্ছে। ওতেই আপাততঃ চলে যাবে আমাদের। ঘরখানি মস্ত। সকলের স্থান সঙ্কুলান হয়েও

আরও জায়গা বাঁচবে। দুটি জায়গায় আগুন জ্বালানো হলো। চায়ের জলও বসে গেছে।

আনন্দে সকলের মন ভরপুর। আমাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খার আজ পরিসমাপ্তি। আজ শুভদিনে তবে সত্যিই গোসাঁইকুণ্ড তীর্থে পৌঁছতে পারলাম। ১৬,৭৭০ ফুট উঁচু। দুর্গমস্থানের দুর্লভ সৌন্দর্য্য। তুষারপাত চলছে এখনো, বাইরে বের হবার কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু কাল নিশ্চয় এমন আবহাওয়া থাকবে না। ভাগ্য ভাল হলে এই অনুপম সৌন্দর্য্যের পূর্ণরূপ দেখতে পাবো। এখন গুটি গুটি মেরে আগুনের ধারে বসে আছি। আগুনের উত্তাপে ছাতের ওপরের তুষার গলে ফাঁক দিয়ে টপটপ করে গায়ে পড়ছে। একটু সরে বসে তার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করি। বন্ধু আগুণের ধারে বসতে রাজী নয়, পরে নাকি এই আরাম ছেড়ে আর ওঠা যায় না।

রাত্রে গরম গরম পুরী ও আলু, মটরশুটি দিয়ে তরকারী খাওয়ার প্ল্যান হলো। ঘি আছে টিন ভর্ত্তি, কিন্তু এত শক্ত হয়ে জমাট বেঁধেছে যে টিন থেকে বের করা রীতিমত কষ্টকর। কুক্‌রি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে বের করছে লামা। আটাও সঙ্গে আছে, কিন্তু বেলবার সরঞ্জাম নেই। লামা একটা মোটা বাঁশ সংগ্রহ করে এনেছে পথ থেকে, সেইটা এখন চেঁছে ছুলে বেল্‌না তৈরী করল। সেটা দিয়ে থালার উলটো পিঠে পুরী বেলে নেওয়া হলো। পুরী ভেজে আর কুল পাওয়া যায় না। বন্ধু এখন প্রচণ্ড সক্রিয়, তার ছোট মামাও কম যান না। এদের হাত থেকে বাঁচিয়ে আবার কাল সকালের জন্যও কয়েকখানা রেখে দিতে হবে।

নয়

১৮ই অক্টোবর ঃ আজকের দিনটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। প্রত্যুষে বন্ধুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গলো বটে, কিন্তু উঠবার তাগিদ মোটেই বোধ করলাম না। প্রচণ্ড শীত, তার উপর কাল সারারাত সমানে তুষারপাত হয়েছে। আজ সকালে সব দিক নির্মল, শান্ত, স্তব্ধ। নির্মেঘ নীলাকাশ। সামনের তুষারের পাহাড়ের চূড়া বেয়ে বেয়ে ধীরে ধীরে সূর্য্যালোক গড়িয়ে নামছে, তাই দেখবার জন্য বন্ধু ডাকাডাকি করছে। করুক, ওরা সে সৌন্দর্য্য দেখুক প্রাণভরে। এত শীতে উত্তপ্ত বিছানা ছেড়ে আমি নড়ছি না। রোদ্দুর ঘরে ঢুকে হাতছানি দিয়ে না ডাকা অবধি আমি অমনি স্লিপিং ব্যাগের ভিতর পড়ে থাকব।

ওদের কলকলানির চোটে অস্থির। তবু আমি কোন ক্রমেই নড়ছি না। ওরা চা খাচ্ছে, খাক্। আমি বিছানাতে শুয়েই চা খাবো। পুরীতো আর খাবো না, আজও খাবার ইচ্ছে হয়নি।

ঘরের ভিতর এক ঝলক রোদ ঢুকতেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছি। বাইরে বেরিয়ে চারিদিকের দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বিশাল নীল লম্বাপানা হ্রদের চারিদিকে তুষারাচ্ছাদিত শুভ্র পাহাড়। কাল রাতের তুষারপাতে আজ আর কোথাও অনিচ্ছাদিত পাথর নেই। সেই তুষারাবৃত পাহাড়ের ছায়া পড়েছে নীল হ্রদের স্বচ্ছ বুকে, ঠিক যেমন আরসীতে ছায়া পড়ে তেমনি। অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য।

নেপালীরা বলে এই হ্রদের স্বচ্ছ জলে যদি কোন গাছের পাতা পড়ে তবে, কোথা থেকে পাখী এসে সে পাতা উঠিয়ে নিয়ে যায়। তাছাড়া এরা আরও বিশ্বাস করে, পরিষ্কার দিনে কুণ্ডের মধ্যে চেয়ে দেখলে অনন্ত শয্যায় নারায়ণকে দেখা যায়। কেউ কেউ নাকি জটা-জুটধারী নীলকণ্ঠ গৌরী শঙ্করজী, কেহবা মহিষমর্দ্দিনী দেবী, রথারূঢ় সূর্য্যনারায়ণ বা সপরিবার গণেশজী, ইন্দ্রাদি বিভিন্ন দেবতাকে দেখতে পান। এদের দৃঢ় বিশ্বাস, এখানে পৌঁছাতে পারলে ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন হবেই হবে, কখনো বিফল হয়ে ফেরে না কেউ, কোন না কোন রূপ সে দেখবেই।

আমরা কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। পাহাড়ে পাথরের দেশ। পাতালতার রাজ্য বহু নীচে ছেড়ে এসেছি, তাই জলে পাতা পড়বার কোন সুদূর সম্ভাবনাও নেই।

আমাদের মনে হলো, পরিষ্কার দিনে চারিদিকের পাহাড়ের যে প্রতিবিম্ব জলে পড়ে, সেই প্রতিবিম্ব দেখে হয়তো অনন্ত শয্যায় নারায়ণ বা বিভিন্ন আরাধ্য দেবতাকে মনে পড়ে ওদের।

সূর্য্যের উত্তাপের স্পর্শ-পেয়ে দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনও সতেজ হয়ে উঠেছে। ঘুরে ঘুরে চারিদিকের অনুপম সৌন্দর্য্য দেখি।

ডাঃ বিশ্বাস লামাকে বলেন, রান্না সেরে নাও, স্নান খাওয়া সেরে আমরা একেবারে বেলা দশটা নাগাদ রওনা হয়ে বিকাল অবধি হাঁটবো।

লামা ব্যস্ত হয়ে রান্নায় মন দিয়েছে, আমরা স্নানে। এত শীতে স্নান করাও কঠিন। পাথরে বসে ওদের দুজনের দিকে দেখি ওরা কি করে। ওমা, ওরা মামা-ভাগ্নে যে গলা-জড়াজড়ি করে হ্রদে ডুব দিচ্ছে! আমি তাড়াতাড়ি দুই বীর পুরুষের ছবি তুলে নিলাম।

ডাঃ বিশ্বাস আমাকে বলেন, "তুমি যেন জলে নেবো না, এত ঠাণ্ডা যে জমে যাবে।"

হবেই তো! তুষার গলা জল তুহীন শীতল, কিন্তু তার স্পর্শ

পেতেও আমার দেরী হয় না। তবে ওঁর কথার পর একা একা জলে নামবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারি না। তীরে বসেই স্নান সেরে নিলাম।

কি তৃপ্তি! দেহের মনের সব অবসাদ কেটে গেল এক নিমিষেই! এমনি তৃপ্তিই বোধহয় নীলকণ্ঠ শিব পেয়েছিলেন, কালকূট জনিত গাত্রদাহ প্রশমিত হয়েছিল তাঁর।

মগটা মেজে পরিষ্কার জল নিয়ে উপরে উঠি শিবলিঙ্গের মাথায় ঢালব বলে, বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে এলো। জলের বোতলগুলি ভরে কুণ্ডের পূতবারি নেওয়া হলো, দেশে নিয়ে যাবো।

চারিদিকের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছেড়ে নড়তেও ইচ্ছে করছে না। কুণ্ডের তীর থেকে তাই আর ওঠাই হলো না। ঘরে আর ঢুকলাম না। ওই ঘরের জন্য কাল আকুলি বিকুলির অন্ত ছিল না, আজ বাইরের সৌন্দর্য্যের টানে মুগ্ধ হয়ে আমাদের সেই পরম আকাঙ্ক্ষার ঘরকে অবহেলা করতে বাধছে না। হ্রদের তীরে পাথরের উপর বসে বসেই খিচুড়ী ও পাঁপড়ভাজা খাওয়া হলো। বন্ধু কুলিদের সহায়তায় মাল গুছিয়ে ফেলেছে।

দলপতির নির্দ্দেশ মত বেলা দশটার মধ্যে ফিরবার জন্য সকলে তৈরী হয়ে নিয়েছি। আজ বিকাল অবধি একটানা হেঁটে প্রথম গ্রামে পৌঁছাতে হবে, তা না পারলে অন্ততঃ তার কাছাকাছি পৌঁছাবো। এখন আর পথে বিশেষ চড়াই পাব না। উৎরাই পথে অনেকদূর একটানা চলা সম্ভব হবে।

এত সুন্দর জায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। বারবার পিছনে তাকিয়ে দেখি। এখনকার পথ সহজ, আরও কয়েকটা কুণ্ডর তীর ধরে ধরে চলা। বড় কুণ্ডের শেষ প্রান্ত থেকে জলধারা ঝরণার মত বেগে নেমে এসে নীচের অন্য একটা কুণ্ডে পড়েছে, এটা থেকে আবার একটা ধারা জল প্রপাতের মত হয়ে নীচে নদীর দিকে বয়ে চলেছে। এই ধারাটি ত্রিশূলী গণ্ডকী নদীর একটি উৎস। অন্য উৎসটি তিব্বতে।

চলতে চলতেই দুটি হাঁটাপথের সংযোগ স্থলে মন বাহাদুর দেখায়, ওই যে উপরের পাহাড়ের দিকে রাস্তা চলে গেছে, ওইটি ল্যাংট্যাং হিমল যাবার রাস্তা। এক সাহেবের সঙ্গে গত বছর সে ওপথে এসেছিল। সাহেবের নাম সে বলতে পারল না। আমরা নীচের পথ ধরেছি।

ল্যাংট্যাং হিমল এই অঞ্চলের পর্বতমালার নাম, ল্যাংট্যাং লিরুং (২৩,৭৭১ ফুট) এই পর্বতমালার উচ্চতম শিখর। এখনো এই শিখরটিতে মানুষের পদার্পন ঘটেনি।

আমাদের ভাগ্যে বেশীক্ষণ পথ আর সহজ রইল না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখি মস্ত মস্ত পাথর ছড়ানো দুর্গম প্রদেশ। পাহাড়ের উঁচু থেকে নীচে অবধি যতদূর চোখ যায় একই রকম পাথর ছড়ানো। এই সব পাথরের উপর দিয়ে চলা অত্যন্ত কঠিন। আমরা গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের গোমুখের পথে এবং অরোয়া উপত্যকায় কেবল এমন বড় বড় পাথর দেখেছি। এখানে আবার পথের কোন দাগও দেখছি না। লামারা যে কোনদিকে গেল তাও বুঝতে পারছি না! ওরা ওদের অভ্যস্থ পদক্ষেপে এই অঞ্চলটি তাড়াতাড়ি হেঁটে পার হয়ে গেছে। তুষার জমে আছে কোথাও কোথাও, তারই উপর ওদের পদ চিহ্ন লক্ষ্য করে দেখে দেখে চলেছি। কিন্তু অধিকাংশ জায়গায়ই তুষার জমতে পায় নি, গড়িয়ে ফাটলে পড়ে গেছে। তাছাড়া লামাদের কারুরই পায়ে জুতো নেই, ওরা তাই পারতপক্ষে তুষারে পা দিয়ে চলে না।

"লামা,—লামা, লামা!" সমস্বরে তিনজনা চেঁচাচ্ছি। কোন উত্তর নেই। কি আর করা। অনির্দ্দিষ্ট ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলি। আর চলা কালেই এক এক করে সকলের নাম ধরে ডাকতে থাকি।

এমনি দুর্গম পথে অনিশ্চিতের মধ্যে আধ ঘণ্টারও বেশী চলেছি। হঠাৎ আমাদের ডাকের উত্তর আসে। আমরা ঠিক দিকেই চলে-

ছিলাম। লামা ফিরে এসেছে। আমাদের অনুযোগের উত্তরে বলে, ওরা দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত পায় নি, তাই মাল নামাতে পারে নি, থামাও তাই সম্ভব হয় নি। এখন অল্প দূরে সকলে মাল নামিয়ে বিশ্রাম করতে বসেছে, লামা পথ দেখাবার জন্য ফিরে এসেছে। এই দুর্গম পথ যে আমরা সহজে পার হতে পারব না, ওরা বুঝেছিল, কিন্তু উপায় ছিল না।

এবার আর ছাড়াছাড়ি নয়। ওদের ধীরে ধীরে চলতে আদেশ করেন ডাঃ বিশ্বাস। আমাদের সাথে সাথেই চলে ওরা। সুবিধা মত জায়গা পেলে মাল নামিয়ে রেখে বিশ্রাম নেয় আমাদের সাথেই। দুর্গম উৎরাই পথে মনবাহাদুর মাঝে মাঝে এসে আমার হাত ধরে নামতে সাহায্য করছে।

একেকটি উৎরাই এত কঠিন যে মনে হয় খাড়া হয়ে নেমে আসছি। নীচের দিকে তাকাতেও ভয় হয়, মাথা ঘুরে ওঠে। লামারা এখন সর্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, তাই ভরসা পাচ্ছি মনে। খুব ধীরে সাবধানের সঙ্গে চলেছি। অনেকটা উপায়হীনের মত। ত্রিশূলীর পথে যদি গোসাঁইকুণ্ড আসতাম তবে এইপথে যে কি করে উপরে উঠতাম কে জানে!

চলার ফাঁকে ফাঁকে পিছন ফিরে তাকাই বার বার। ল্যাংট্যাং-হিমল ও গণেশ-হিমল পর্বতমালার তুষারমৌলী শৃঙ্গাবলী মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যকিরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে বার বার। থেমে যে দু' মিনিট দেখব তার উপায় নেই, অমনি চলবার তাড়া আসে। তবু বারে বারে বিশ্রাম করবার নাম করে পিছনের সেই অপরূপ রূপময় গিরিশ্রেণীর দিকে তাকাই। না তাকিয়ে পারি না!

ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে এল। এবার একটা আশ্রয়ের খোঁজ করতে হয়। উঁচু থেকে দেখছি, বেশ খানিকটা নীচে বনের প্রান্তে মস্ত মাঠ, তার মাঝখানে দু' তিনটি বড় ও ভাল ঘর। কিন্তু লামা বলল, ওখানে জল পাওয়া যাবে না। কি করে জানল ওরাই জানে।

তাই আরও এগিয়ে চললাম।

এখনো আমরা তৃণভূমি অঞ্চলেই আছি। এখানে শক্ত ঘাস ও ছোট্ট ছোট্ট জুনিপারের ঝোপ ছাড়া আর কোন গাছ নেই। বাকী সব পাথর আর তুষার। তবে অদূরেই নীচের পাহাড়ে বড় গাছ-পালার রাজও সুরু হয়ে গেছে।

অসমান পাথরের পথে ক্রমাগত চলা। পাহাড়ের ঢেউ একটার পর একটা আসছে, আমরা একটার পর একটা পার হয়ে চলেছি। বেলা সাড়ে চারটা নাগাদ একটা বড় ভাল খুপড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল। পথ ছেড়ে খানিকটা উঁচুতে উঠে সেখানে পৌঁছান গেল।

মস্ত বড় ঘর। বাঁশের বেড়া দিয়ে দুটি ভাগ করা আছে। একটা অংশ বোধহয় পশুদের থাকবার জন্য। পাথরের দেয়ালে তিন চারটি ছোট ছোট কুলুঙ্গীও আছে। ঘরের মাঝখানে ছাদ থেকে দড়ি ঝুলছে, লণ্ঠন ঝুলনোর জন্য।

লামা তার দলবল নিয়ে মালপত্র নামিয়ে তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তারও অসুবিধা নেই, ঘরের ভিতরেই অনেক শুকনো সরু সরু বাঁশ জমা করা আছে। দেখতে দেখতে মস্ত আগুনের শিখা প্রায় ঘরের ছাত অবধি উঠে গেল। কিন্তু জল, জল কই?

উত্তরে লামা মৃদু হেসে বলে, "পানি হ্যায় নেই।"

"বারে মজা! পানি নেই, তব্ ইধর্ রুখা কেঁও?" সবাই রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করি।

ওরা কিন্তু মোটেই বিব্রত হয় না, কেবল মিটিমিটি হাসে। ভাল করে উত্তরও দেয় না, যেন উত্তর দেবার প্রয়োজনই নেই ওদের।

আমরা অসন্তুষ্ট মনে বিছানা তিনটি পাতবার ব্যবস্থা করে ফেলি। আজ তাহলে আর খাওয়া হবে না। একটু চা? তা-কি হবে না? সঙ্গের বোতলগুলি ভরা গোসাঁইকুণ্ডের জল আছে, কিন্তু সে তো কলকাতাতে নিয়ে যাব বলে। তাতে তো আর চা করা চলবে না।

বিরস বদনে আমরা আগুনের ধারে বসে হাত পা গরম করি। এই হতভাগাদের পাল্লায় পড়ে আর যে কত দুর্ভোগ ভুগতে হবে কে জানে। ওদিকে কৃষ্ণবাহাদুর কম্বল মুড়ি দিয়ে কোঁকাচ্ছে। ঠাণ্ডা লেগে তার জ্বর হয়েছে। হবে না? এই ঠাণ্ডা, বরফ পড়ছে, তার মধ্যে ওদের পরণে কত অল্প জামাকাপড়। ওদের সবাইকে এক সঙ্গে যে নিমুনিয়ায় ধরে নি তাই ঢের!

লামা ঈঙ্গিত করে।··আমরা চুপচাপ বসে বসে দেখি, ওরা বালতি, ডেকচি, মগ ইত্যাদি যত কিছু বাসনপত্র ছিল সব বের করে নিয়ে চলেছে। কেবল কৃষ্ণবাহাদুর কম্বল মুড়ি দিয়ে কোঁকাতে থাকে।

"কি ধর যাত্তা?"

"বরফ লানে হোগা।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা যাবতীয় বাসন ভর্তি করে তুষার নিয়ে এল। সেই তুষার আগুনে গলিয়ে জল হল, জল ফুটিয়ে চা-ও তৈরী হয়ে গেল। খিচুড়ীও চেপেছে ওই তুষার গলা জলেই।

প্রচণ্ড শীত, সন্ধ্যার পর থেকেই আবার তুষারপাত সুরু হলো। আগুনের ধার ছেড়ে আর নড়া যায় না। তুষারপাত আর থামল না, সারা রাতই সমানে তুষার পড়ল। ভাল ঘরে আগুনের ধারে শুয়েছি, তাই কোন অসুবিধা বোধ করি নি। কিন্তু বাইরে ঠাণ্ডা। চারিদিকের সব তুষারে ঢেকে গেছে। পথ ঘাট সব একাকার; জুনিপার ঝোপ-গুলি তুষারে ঢেকে চেনা যাচ্ছে না।

দশ

২০শে অক্টোবর আজ সুরু হতেই তুষারে পা ফেলে ফেলে চলা। ক্রমাগতই পিছ্‌লে যাচ্ছি। পথ চেনাও দুষ্কর। লামা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আজ আশা করছি, এ পথের প্রথম গ্রাম কুলুং-এ ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পৌঁছাব। উৎরাই পথ, পথও ভাল, কেবল তুষারে ঢাকা বলে পথ-চিহ্ন চেনা যাচ্ছে না। তাছাড়া কোন অসুবিধা নেই। চলা সুরু করলেই শীতের ভাব অনেকটা কেটে যাবে।

কাল রাতে ডাঃ বিশ্বাস কৃষ্ণবাহাদুরকে ওষুধ দিয়েছিলেন, তার জ্বর ছেড়ে গেছে। আজ আর তার কোন অসুবিধা নেই। সকলের সঙ্গে সমান মাল বয়ে নিয়ে সে চলেছে।

উৎরাই পথে হুড়্‌হুড়্ করে কেবল নেমেই চলেছি। ওদের পিছু ছাড়ছি না। একটা জায়গায় বন্ধু থেমে দেখায় দু'দিকের পাহাড়ের উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। দুটো রাস্তা দুই পাহাড়ের দুটো গিরিশিরা ধরে এগিয়ে চলেছে। বন্ধু আমাকে বলে, আমরা নিশ্চয় ওই ডান-দিকের পথটা ধরব। ত্রিশূলী নদী তো ওই ডান দিকেই বয়ে চলেছে।

না, তা তো হলো না। লামা দেখি বাঁয়ের পথটা ধরল। আমরা তার পিছু পিছু চললাম।

খাড়া উৎরাই পথে ক্রমাগত নেমেই চলেছি। নামাটা যেন নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে না। কে যেন নীচের দিকে টেনে নামাচ্ছে।

গিরিশিরার উপর পৌঁছে আমরা বেলা সাড়ে ন'টা নাগাদ একটা খুপড়ী দেখতে পেলাম। এতদূর এলাম, পথে একটাও ঝরণার দেখা পেলাম না। এখানেও জল নেই। জলের বোতলগুলিতে গোসাঁই-কুণ্ডের জল ভরা। অগত্যা একটা ছোট বোতল বের করে তাই থেকে জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে হলো।

"কুলুং আউর কেৎনা দূর ?" ডাঃ বিশ্বাস লামাকে প্রশ্ন করেন।

নির্বিকার ভাবে লামা উত্তর দেয়—"আভি কুলুং আউর নেহি যায়গা, রাস্তা ভুল হো গিয়া। আভি বরাব্বর সিধা রাস্তাসে ঘাড়াং যায়গা।"

সে কি কথা ? রাস্তা কোথায় ভুল করলে ? বন্ধুর সঙ্গে চোখা-চোখি হয়। ওর দেখান পথটা যেখানে ছিল, সেখানে নয়তো ? সে তো আমরা অনেকক্ষণ আগে ফেলে এসেছি। তারপর অন্তত: এক হাজার দেড় হাজার ফিট হুড় হুড় করে নেমে এসেছি।

আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। এরা পথ ভুল করছে, আবার বলে কিনা সিধা রাস্তায় ঘাড়াং যাবে! উনি জিজ্ঞাসা করেন—

"ঠিক সে বাতাও, ইধর সে ঠিক ঠিক ত্রিশূলীবাজার যানে সেকেগা তো ?"

"জরুর যায়েগা।" প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লামা বলে। আমাদের দুশ্চিন্তা দেখে একটু মিটিমিটি হাসে।

আমরা গিরিশিরা ধরে চলে আধ ঘণ্টা পর একটা জায়গায় সকলে থেমেছি। লামা মাল নামিয়ে এদিকে ওদিকে কি দেখছে। কখনো ডানদিকে সোজা বনের মধ্যে যাবার চেষ্টা করে, কখনো উঠে উঠে আবার সামনে বাঁদিকটা দেখে আসে। ডানদিকে কোন পথ নেই। কিন্তু বাঁদিকে একটা পথ নীচের দিকে নেমে গেছে।

মান বাহাদুর সেই পথেই এগোয়। ওর পিছু পিছু লামারাও এগোয়। বাঁ দিকের পথ একটু পরেই সোজা বনের মধ্যে নেমে গেছে। বন গভীর হতে গভীরতর হচ্ছে, চলা কষ্টকর। দিনের বেলাতেই

শেষ হবে, লোকজনের দেখা পাবো।

মিনিট পনের চলার পর দেখি পথের ধারে লামা ও মানবাহাদুরের মাল পড়ে আছে। কোথায় গেল ওরা?

"লামা-লামা", একবার দু'বার ডাকতেই লামার সাড়া মেলে। উঠে এসে কাঁচু মাচু মুখে লামা জানালো—

"আউর বাট ছই না, বাট টুট্ গিয়া"

তার মানে? আমরা ভাবলাম, এখানে বুঝি পাহাড় ধসে রাস্তা ভেঙে গেছে। পাহাড়ী পথের এইতো মস্ত বিপদ। উনি বলেন, পাহাড় ধসেছে তো কি হয়েছে? নিশ্চয় উপরের দিক দিয়ে পথ গেছে। একটু উঁচুতে উঠলেই রাস্তা পাওয়া যাবে।

"নেহি, নেহি, বাট বিলকুল হ্যয়ই নেই।" লামা বোঝাতে চেষ্টা করে। আমরা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ওদের পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে দেখি, যে পথ ধরে আমরা এতক্ষণ এসেছি, বনের মধ্যে একটা খোলা ময়দানে এসে সে পথ শেষ হয়ে গেছে। ধস কোথাও নেই। চারিদিকে খুঁজে কোন দিকে কোন পথের চিহ্ন দেখা গেলনা। সম্মুখে এগিয়ে বনের প্রান্ত ভাগে, পাহাড়ের খাড়া উৎরাই এর কাছে এসে দেখি নিশ্ছিদ্র বনভূমি সম্মুখে প্রসারিত। তার কোন দিকে কোথাও মনুষ্য-পদচিহ্নের সামান্যতম লক্ষণও নেই।

বনের মধ্যে ঢুকে অবধি যে পথ ধরে এসেছি, সে পথ কোন গ্রামে পৌঁছয়নি। পাহাড়ীরা গরু-ভেড়া, মহিষ চরাবার সময় চলে চলে যে পথের সৃষ্টি হয়েছে, এ সেই পথ। ওদের যতদূর চলা প্রয়োজন হয়েছে, পথও ততটুকুই সৃষ্টি হয়েছে। প্রয়োজনও ফুরিয়েছে, পথও "ছই না" হয়ে গেছে।

আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এখন উপায়?

ডাঃ বিশ্বাস লামাকে বলেন, গ্রামে যাবার কোন পথ নিশ্চয়ই আছে। তোমরা খুঁজে বের কর। দেখ নীচে নিশ্চয়ই কোন না কোন গ্রাম আছে, একটু নামলেই তার পাত্তা মিলবে।

. উল্লাসের স্বর কানে আসে, বন্ধু চেঁচাচ্ছে—"ও ছোটমামা! কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি। নশ্চয় কাছে কোন গ্রাম আছে।"

"কই, কই?" সবাই চুপ করে কুকুরের ডাক শুনবার জন্য কান পেতে থাকি।

"ছোট বাচ্চার কান্নাও শোনা যাচ্ছে," সমস্বরে সকলে বলে উঠি।

কুয়াশা ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। অনেক নীচে আমাদেরই পাহাড়ের গায়ে বনের মধ্যে যেন খানিকটা পরিষ্কৃত জায়গা দেখা গেল। বেশী নীচে বলে তেমন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু কুকুরের ডাক ও বাচ্চার কান্না এখন সকলেই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। খুব অস্পষ্ট হলেও কুয়াশার মধ্য দিয়েই ঘর বাড়ীও যেন দেখা যাচ্ছে বোধ হলো।

আশান্বিত হয়ে লামা তার দলবল নিয়ে বনের মধ্যে নেমে গেল। কিছুটা নীচে নেমে দেখবার চেষ্টা করে, গ্রামে পৌঁছবার পথের কোন হদিশ যদি পাওয়া যায়। আমরা তিনজন প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে চুপ করে ওদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চার জনাই ফিরে এল।

"বাট ছই না"। পথ নেই।

কুয়াশা আবার এগিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরেছে।

লামাকে উনি হুকুম দেন, ওই গ্রামের লোকেদের ডাক দাও, রাস্তা বাতলাতে বলো। ওরা নিশ্চয় সাড়া দেবে। আমরা তো নেপালী ভাষা জানি না, তুমিই ডাক।

লামা দু'একটা ডাক দেয়, নেহাৎ অনিচ্ছাতে ওঁর বারবার পীড়া-পীড়িতে। সেও জানে, আমরাও জানি, এ ডাক বৃথা, ওরা কেউ শুনতে পাবে না।

কি আর করা! সাড়ে তিনটা বেজে গেছে, ফেরা ছাড়া উপায়ও নেই। কিন্তু ফিরেই বা যাবো কোথায়? আজ ভোর থেকে কম করেও অন্ততঃ পক্ষে চার হাজার ফিট খাড়া উৎরাই নেমেছি। পরন্তু গোসাঁইকুণ্ড ছাড়বার পর পথের কোথাও জলের চিহ্নও পাই নি, কেবল

এই একটি জায়গা ছাড়া, যেখানে আমরা দুপুরে থেকেছি। সুতরাং সেই পর্য্যন্ত ফেরাই ঠিক হলো। আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা ও অবসাদে আমাদের অবস্থা অবর্ণনীয়।

ঝরণার অনতিদূরে বনের মধ্যে একটা পরিষ্কৃত জায়গা দেখে লামা থামল। মাথার ঘন চুলের মধ্যে যেন টাক পড়েছে। সেখানেই আজ রাত্রের মত থাকা ঠিক হলো। একটা ঘরের "ইসারাও" পাওয়া গেল। অতীতে কোন ভেড়াওয়ালা ঘর বানিয়েছিল, তার গুটিকয়েক লাঠিমাত্র অবশিষ্ট আছে, দেয়াল পর্য্যন্ত নেই। সেখানেই আস্তানা তৈরী করে নিতে হবে। লামারা সকলে কুক্‌রী হাতে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। রডোডেনড্রন ও পাইন গাছের ডাল দিয়ে থাকবার ঘর তৈরী করতে হবে। ল্যাংট্যাং বাহাদুর এক বোঝা শুকনো বাঁশ সংগ্রহ করে এনেছে, আগুন জ্বালাবে বলে।

আগুন জ্বালানোও কষ্টকর। এখন সময় বুঝেই যেন ঝমঝম্ করে চেপে বৃষ্টি এল। ঘরের "ইসারাতে" পাথরের উপর আমরা ছাতি মাথায় দিয়ে বসে থাকি। বন্ধু ছাতি মাথায় দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। বাহাদুরেরা ওই বৃষ্টির মধ্যেই ডাল কেটে এনে ঘর তৈরীর চেষ্টা করছে।

"এমন বৃষ্টি থাকলে এমনি করে ছাতি মাথায় দিয়ে বসে বসেই আমাদের ষোল ঘণ্টা কাটাতে হবে। বন্ধু তুই আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি, এসে এই পাথর খানায় বোস।" ডাঃ বিশ্বাস করুণ সুরে ডাকেন।

বন্ধু রাজী হলো না— "দেখা যাক্ কতক্ষণ পারি।"

পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে জলের ধারা হুড়্ হুড়্ করে নেমে এসে আমাদের বসবার পাথরগুলি পর্য্যন্ত ভাসিয়ে দিয়েছে। জলে ভিজে আমরা প্রচণ্ড শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি। বৃষ্টির ছাঁটে দাঁড়ানো বন্ধুও কতকটা ভিজে গেছে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে লামারা গাছের পাতাশুদ্ধ বড় বড় ডাল কেটে

এনে পুঁতে একটা বেড়ার মত খাড়া করল। তার উপর আরও ডাল চাপিয়ে নীচু একটা ঘরের মত ঝুপড়ী তৈরী করে ফেলল। সেই ঘরই আমাদের আজকের রাতের আশ্রয়।

হায়রে ঘর! কলকাতায় কত ভালো ঘর আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে! তুলতুলে নরম গদিওলা বিছানা পাতা আছে, আর আমরা আজ কোথায়? কি ঘরে থাকবার আয়োজন করেছি! বৃষ্টিতে ভিজে প্রচণ্ড শীতে কষ্ট পাচ্ছি। বসবার যোগ্য একটা শুকনো ভালো আসন পর্য্যন্ত নেই।

ডালপালা সব ভিজে, তাই আগুন জ্বালানো কষ্টসাধ্য। এ দিকে কুলিরা ডাল কাটতে গিয়ে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। লণ্ঠন থেকে ঢেলে কেরোসিন নিয়ে তারই সাহায্যে মস্ত একটা আগুন জ্বালানো হলো। দেখতে দেখতে সেই আগুনে ওদের স্বল্প পরিচ্ছদ শুকিয়ে গেল।

আমাদের একেবারে ভিজিয়ে দিয়ে দেড় ঘণ্টা পর বৃষ্টি থেমে গেল, ঘরও তৈরী হয়েছে, যদিও তার রোদ-বৃষ্টি-হাওয়া কোনটাই রোধ করবার ক্ষমতা নেই, তবু ঘর তো বটেই! আগুনও জ্বলছে। সে শুধু সামান্য আগুন নয়, মস্ত বড় আগুন জ্বলছে। আমাদের জামা-কাপড় এখনও ভিজে। লামারা সকলে কেউ ডেকচি, কেউ বালতি হাতে জল আনতে রওনা হয়ে গেল। নেতার আদেশ, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, তার আগেই খাবার জলের বন্দোবস্ত করে রাখতে হবে।

ওদের অনুপস্থিতির সুযোগে আমরাও আমাদের পরণের কাপড়-জামা শুকিয়ে নিচ্ছি। ভদ্রসমাজে বাস করি, এখনও বন্য হয়ে উঠিনি, তাই ওদের সামনে কাপড়জামার সবদিক শুকনো করা চলেনি। ভিজে মোজা ও জুতোও শুকনো হয়। উত্তপ্ত হয়ে মনে যেন খানিকটা আত্মপ্রত্যয় ফিরে এসেছে।

কুয়াশা খানিকটা কেটে গেছে। এখন মাঝে মাঝে উপত্যকার নীচ অবধি দেখা যাচ্ছে। উপত্যকার ওদিকের পাহাড়ে ধোঁয়া দেখা

যাচ্ছে। ওটা কি ধোঁয়া, না মেঘ? বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। কিন্তু কুয়াশা সরে যাওয়াতে নীচের গ্রামখানি এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আবার কুকুরের চীৎকার শোনা গেল, আবার বাচ্চার কান্না। এখনো অন্ধকার নেমে আসে নি। বন্ধু নীলরঙের রুমাল উড়িয়ে আবার ডাকাডাকি সুরু করেছে—

"ও নেপালী ভাইয়োঁ! হমলোক্ পরদেশী, ইধর বাট ভুলকর্ আগিয়া, বাট বাতাও। ও নেপালী ভাইয়োঁ, ও নেপালী ভাইয়োঁ—ও—ও—ও—ও—"

"বন্ধু একটা মশাল জ্বালিয়ে নেড়ে নেড়ে ডাক দে।" ডাঃ বিশ্বাস উপদেশ দেন। আমি বন্ধুর হাতে গোলাপী রঙের প্লাষ্টিকের চাদর দিয়ে দিই, পরামর্শ দিই ওইখানা উড়িয়ে ডাকতে সহজে চোখে পড়বার সম্ভবনা। মশাল তৈরী করা হাঙ্গামা, কাজেই বন্ধু আমার পরামর্শ মতই গোলাপী প্লাষ্টিকের চাদর উড়িয়ে আবার চীৎকার ডাকাডাকি সুরু করে দিয়েছে।

আশঙ্কায়, ভয়ে ওর মুখখানা ঝুলে পড়েছে। তার উপর ক'দিন দাড়ি কামান হয়নি। সুযোগের অভাবে, কেমন যেন অসুস্থ, অসহায় দেখাচ্ছে ওকে। ওদের মামা-ভাগ্নে দুজনেরই দুঃশ্চিন্তা সবচেয়ে আমার জন্য বেশী। বেশ বুঝতে পারছি। কি জানি, বনের মধ্যে পথ না পেলে ক'দিন ঘুরতে হবে এমনিভাবে, কে জানে!

এখন আরও একটা কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে কাঠমাণ্ডুর টুরিষ্ট অফিসার মানসিং-এর সাবধান বাণী। এদিকের জঙ্গলে একটি নরখাদক নেকড়ে বেরিয়েছে। ইতিমধ্যে সাতজন গ্রামবাসীকে হত্যাও করেছে।

উনি বলেছেন, সংখ্যাটা আমাদের বেলাতেও ঠিকই আছে। আমরাও সাতজনাই আছি। ব্যাঘ্র মহোদয়ের আবির্ভাব হলে তাঁর ভোজনের কোন অসুবিধা হবে না। বলা বাহুল্য, আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে চলেছি, যদিও আমাদের কোমড়ে মস্ত মস্ত নেপালী কুক্‌রী গোঁজা আছে।

বালোম্‌জী গাঁও-এ আমাদের আশ্রয়দাতা গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, এদিকের বন বড় ভয়ানক। কোন এক সাহেব পথ হারিয়ে চারদিন বনে বনে ঘুরেছিলেন। চারদিন পর গ্রামে পৌঁছাতে সক্ষম হন। আমি ভাবছি, চারদিন ধরে এমনি অনির্দিষ্টভাবে ঘুরতে আমাদের কেমন লাগবে। আজকের দিনটি তো কাটল, এর মধ্যে ঘনজঙ্গলের ডালপালার মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে এবং ক'দিন ধরে পাথরে পাথরে ছেঁচ্‌ড়ে চলতে চলতে আমার শাড়ীগুলির একটিও আর আস্ত নেই। সেগুলি আবার রোজই হাওয়া নিরোধক পর্দা হিসাবে ব্যবহার করছি। এপথে শাড়ী পরে আসাই ভুল হয়েছে।

ডাঃ বিশ্বাস লামাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "কাল কেয়া হোগা ?"

"ওয়াপস্‌ যানে ·হোগা"—অত্যন্ত সহজভাবে লামা উত্তর দেয়। আমার মানশ্চক্ষে সেই দুর্দান্ত চড়াই পথের চেহারাটা ভেসে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে গলটা শুকিয়ে ওঠে। কতদুর ওয়াপস্‌ যেতে হবে কে জানে! বন্ধু যেখানে দু'টি পথ দেখেছিল, সে হলে তো অনেক দূর। উৎরাই পথেই আমাদের একবেলা লেগেছে, চড়াই পথে চলতে পুরো একদিন লেগে যাবে যে!

উনি একটু কঠোরভাবে বলেন, এই রকম ভুল পথে চলা আর হবে না। কাল সকালে আমরা ফিরে যাব। যেখানে রাস্তা ভুল হয়েছে, ততদূর অবধি যেতে হবে। যদি মনে হয় আগাগোড়াই ভুল পথে এসেছি, তবে আবার গোসাঁইকুণ্ড ফিরে গিয়ে সুন্দরীজলের পথ ধরব।

লামা চুপ করে থাকে। উত্তর দেবার কিইবা আছে?

"তোমরা রান্না করে নাও, খাও। আমরা আজ কফির সঙ্গে বিস্কুট, চিজ ইত্যাদি খাব, আমাদের জন্য রান্না করতে হবে না।" নেতা লামাকে আবার বলেন। আজকে বন্ধুর পর্যন্ত খাওয়ার উৎসাহ নেই। "হম্‌লোগ্‌ কা বাস্তে কাল দুপর কা খানা হোগা, আউর চাউল দুয় নেই, ব্যস্‌।" লামা বলে।

"আর আমাদের ?" আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করি।

"আপ্‌লোগ্‌ কা বাস্তে তো চার রোজ কা সে ভি জিয়াদা চাউল হ্যয়। আপ্‌লোগ্‌ খুশীসে কাঠমাণ্ডু চলা যায়েগা।"

আমরা ওদের চেয়ে অনেক কম খাই। আমাদের খাবার থেকে যদি ওদের ভাগ দিতে হয়, তবে একদিনেই সব চাল শেষ হয়ে যাবে। অতএব ভবিষ্যৎ অন্ধকার! মুখ শুকনো করে সকলেই চুপ করে বসে থাকি।

আগুনের উত্তাপে পাতার ঘরখানি বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। রাত্রে বৃষ্টি আর হবে বলে মনে হয় না। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। 'ঘরের' ভিতর থেকেই নীলাকাশের তারাগুলি খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

রাত্রে বৃষ্টি হবে না এই ভরসাতে দুখানা বিছানা পেতে তিনজনা জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়লাম। এয়ার ম্যাট্রেস ফোলান গেল না, স্থানাভাব। স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে তার উপর কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার পিঠের তলায় মস্ত একটা পাথর ফুটতে লাগল। উপায় নেই। উস্‌খুস্‌ করতে করতে আধা ঘুম আধা জাগরণে আমাদের দুশ্চিন্তা রাত্রির অবসান হলো।

এগার

প্রত্যুষে উঠেই দলনেতা বলেন, "আমি সারারাত ধরে চিন্তা করে কি ঠিক করেছি শোন!

আজ এখনই তাড়াতাড়ি করে রান্না করা হোক। পেট ভরে খেয়ে নিয়ে আটটার মধ্যে আমরা চলা সুরু করব। লামা এগিয়ে যাবে। ও গিয়ে যেখানে পথ হারিয়েছি বলেছে, সেই খুপড়ীর কাছে পর্যন্ত গিয়ে মাল নামিয়ে রেখে পথ খুঁজে বের করবে। আমরা পিছন পিছন গিয়ে সেই খুপড়ীতে ওর জন্য অপেক্ষা করব। রাস্তা খুঁজে পেলে আবার হাঁটা, নয়তো কোন খুপড়ীতে রাত কাটান। পরের দিনও যদি রাস্তা না পাই তবে গোসাঁইকুণ্ডের রাস্তায় ফিরব।"

ভাল প্রস্তাব। লামা বলে, আমি একা যাব না, কৃষ্ণবাহাদুরও থাকবে। বেশ ভাল কথা, উনি রাজী হয়ে গেলেন।

তাড়াতাড়ি রান্না করা হলো। ভাতে ভাত ঘি দিয়ে পেট ভরে খেয়ে নিয়ে আমরা আটটায় রওনা হয়ে পড়ি। লামা ও কৃষ্ণ আগেই খেয়ে দেয়ে রওনা হয়ে গেছে। আবার সেই ঘন বনের মধ্য দিয়ে দুর্গম পথে চলা। তবে কাল উৎরাই এসেছিলাম, আজ চড়াই উঠছি। কাল যে অনেকটাই নেমে এসেছিলাম, আজ মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। কালকের দু' ঘণ্টার পথ চলতে আজ কম করেও চার ঘণ্টা লাগবে।

মাত্র দু'টি ঘণ্টা হেঁটেছি, সেই খুপড়ীর কাছাকাছিও নয় অথচ দেখি পথের ধারে কৃষ্ণ বাহাদুর বসে আছে, লামার মাল তার পাশে রাখা।

"ইধর কেঁও? লামা কি ধর?" ডাঃ বিশ্বাস প্রশ্ন করেন।

"উ বাট দেখনে গিয়া"—কৃষ্ণ বাহাদুর উত্তর দেয়।

"ইধর বাট কিস্তরফ্ হ্যয়, আউর আগারী চলো।"

"কেয়া জানে"—নিশ্চিন্ত সুরে সে উত্তর দিয়ে গুন্‌গুন্ করে গান ধরে।

আমরা পথের ধারে কেউ ঘাসের উপর, কেউবা পাথরের উপর বসে পড়েছি। উনি গজ গজ করছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই লামা ফিরে এল।

"বাট মিলা?"

"নেহি মিলা।"

"তব্ আউর আগারী চলো। কাল যিধর বাট ভুল গিয়া উধর চলো। উধরসে ঠিক বাট মিলেগা।" ডাঃ বিশ্বাস হুকুম দেন।

"এত্‌না দূর কোন্ যায়গা?" ঠোঁট উল্টে লামা বলে।

"তব্ কেয়া করে গা, বাতাও।"

"যি ধর্ সে আয়া উধরই ফিন্ যায় গা, উধরই গাঁও দেখাই যাতা।" লামা উত্তর দেয়।

"ঘাড়াং দেখাই যাতা"—কৃষ্ণ যোগ দেয়।

উনি এবার চটে উঠেছেন। "উধর যাকে ক্যা হোগা—" ওঁর কথা শেষ হতে পারে না, দেখতে দেখতে টক্ টক্ করে মাল পিঠে তুলে নিয়ে কুলিরা লামার পিছু পিছু অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ়। নিরুপায় হয়ে তাড়াতাড়ি ওদের অনুসরণ করি।

যে পথে কাল গিয়েছি, আজ ফিরে এসেছি। আবার তৃতীয়বার সেই একই পথে চললাম। অসহায় বোধ করছি সবাই। কি আর করা। কেমন যেন ব্যবহার করছে লামা। স্পষ্ট করে বলেও না তো কিছু।

কুলিদের পিছু পিছু চলেছি। মিনিট দশেক উঁচুতে ওঠা, এটা একটা গিরিশিরা। এখানেই পথ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। গতকাল আরও এগিয়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে বনের মধ্যে নেমেছিলাম, আজ কিন্তু লামা পাহাড়ের ডান দিকের পথ ধরে নিয়ে চললো।

কৃষ্ণ বাহাদুর আবার বলে, সে নাকি ঘাড়াং গাঁও দেখতে পাচ্ছে। উনি ভীষণ চটে গেছেন, সেই কাল থেকে কেবল 'ঘাড়াং' 'ঘাড়াং' করছে। ওঁর ধমক খেয়ে আর কথা সরে না ওর মুখে।

"আমাদের কপালে আরও দুঃখু আছে" বলি। ওরা সকলে চুপ করে থাকে।

ঘন বনের মস্ত মস্ত গাছের নীচে দিয়ে পথ। এত গভীর বন যে এখানকার দুপুর বেলার রৌদ্রও প্রবেশ করতে পারছে না। আমরা লামাদের পিছু পিছু ছুটে চলেছি। উৎরাই পথ পেলে ওরা প্রায় ছুটেই চলে। পথ হারানোর ভয়ে তাই আমরা ওদের চোখের আড়াল হতে দিচ্ছি না। একটু দূরে গেলেই চেঁচিয়ে ডাকতে থাকি। ওরা মাঝে মাঝে থেমে সাড়া দিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে আবার ছুটে চলে। কখনো কখনো আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেও হয়। বিশ্রাম করা নেই, কোথাও থামাও নেই, ক্রমাগত হেঁটে চলা। ঘন বন হলেও পথ এখন পর্য্যন্ত বেশ চওড়া। অনেক লোকের আনাগোণা আছে বলে মনে হয়। তবে নেপালীদের পথ তো, সমান কোথাও নেই। কোথাও কোথাও বড় বড় গাছের শিকর-গুলিতে সিঁড়ির মত ব্যবহার করা হয়েছে। এদিক ওদিক থেকে বেরিয়ে আসা কাঁটা গাছ বা ঝোপে আটকে গিয়ে আমার কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে। বন্ধু সর্বদাই পিছনে পিছনে চলছে। কাপড় আটকালেই সে তার ছাতির ডগা দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে দিচ্ছে। হাত বাড়িয়ে ছাড়ানোর সামর্থ্য আজ আর কারুর নেই।

পাহাড়ের ঢেউ একটার পর একটা এগিয়ে আসছে। আমরাও সেগুলি ক্রমাগত পার হয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে ঢেউ-এর খাঁজে

খাঁজে ঝরণার ধারা পাচ্ছি। ঝরণা দেখলেই থেমে যাচ্ছি। একটু জিরানোর ফাঁকে আকণ্ঠ জল খেয়ে নিচ্ছি। বোতলগুলি জলে ভরে আছে আজ। কোথাও জল না খেলেও স্পর্শ করবার আনন্দলাভে বঞ্চিত হতে মন চায় না। কাল পরশু দুদিনের শুকনো দিন দুটির কথা তখন বার বার মনে পড়ে। গোসাঁইকুণ্ড ছাড়বার পর পথে এতগুলি ঝরণা এবং এত প্রচুর জল আর কোথাও পাইনি। মমতাভরে জল স্পর্শ করে মুখে মাথায় বুলিয়ে দিই।

অনেকক্ষণ ধরে হেঁটেছি। এবার একটু বিশ্রাম করা যাক্। একটা মস্ত ঝরণার ধারে কয়েকটা মস্ত মস্ত পাথর পাওয়া গেল। কয়েক-টুকরো চকোলেট খেয়ে পেটপুরে জল খেয়ে নিই। বন্ধু চকোলেট স্পর্শও করে না। ওটুকুতে কি হবে তার? মিছিমিছি ক্ষিধে বাড়ানো, দরকার নেই কিছু।

ঝরণা পার হয়ে দুটো পথ দুদিক গেছে। মনবাহাদুর নীচের পথ ধরেছে, লামা উঁচুর দিকের পথে। আমাদেরই বিপদ।

"কি ধরসে থায়গা?" উনি নায়ক লামাকেই প্রশ্ন করেন।

লামা অবহেলা ভবে উত্তর দেয়, "নীচে সে আও।"

অগত্যা আমরা মনবাহাদুরকে অনুসরণ করে চলেছি। লামা ও কৃষ্ণবাহাদুর ক্রমাগত উঠে চলেছে, আমরা বাকী পাঁচজনা নেমে চলেছি। আমাদের মধ্যেকার দূরত্ব ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

খানিকক্ষণ পরে আমরা দেখি, আমাদের সামনের পথ শেষ হয়ে গেছে। লামার পথটাই ঠিক পথ, আমরা ভুল পথে এসেছি। উনি খুব চটে গেছেন। ভুল, ভুল, ক্রমাগতই ভুল। এমন করে আর কতো পারা যায়।

কিন্তু পারা না গেলেই বা চলবে কি করে? অগত্যা লামাদের পথে পৌঁছানোর জন্য গভীর বনের চড়াই বেয়ে গাছের ডালপালা হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে উঠতে থাকি। কোথাও কোথাও চলবার জন্য

চার হাত পায়ের সাহায্য নিতে হয়, অসম্ভব কঠিন। লামার নির্দেশেই এমনটি হলো। উনি লামাকে বকতে থাকেন। কিন্তু অন্য উপায় নেই। এইভাবে আধঘণ্টার উপর সময় নষ্ট হলো কেবল পাহাড় বেয়ে উঠে ঠিক পথে পোঁছাতে।

আর কিছুদূর এগিয়ে দেখি বনের মধ্যে খানিকটা পরিষ্কৃত খোলা ময়দান মত জায়গা, মাঝখান দিয়ে একটা টলটলে ঝরণা বয়ে চলেছে, তার পাশে বেশ ভালো একটা খুপড়ী। আজ আর আমাদের খুপড়ীর দরকার নেই। আজ গ্রাম চাই, চাই-ই চাই। লোকজন দেখতে চাই। আজ পাঁচদিন ধরে আমাদের দলের সাতজন ছাড়া বাইরের লোক কাউকে দেখিনি।

চলতে চলতে দেখি বনের মধ্যে কাঠুরেদের কাটা কাঠ স্তূপীকৃত হয়ে আছে। তাহলে গ্রাম আর বেশী দূরে নেই। কিন্তু কই? গ্রাম তো এই বনেরও অন্তে দেখছি না।

'ওই, ওই যে আকাশ দেখা যাচ্ছে, বনের বুঝি শেষ হ'ল এবার।' বলে উঠি।

"কই?" সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করে।

বড় বড় গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুৎচ্চমকের মত একটু নীল আকাশ উঁকি দেয়। একটু এগিয়ে কিন্তু হতাশ হতে হয়। আমরা পাহাড়ের ঢেউ-এর বাইরের দিকে এসেছি, তাই বনের ফাঁকে আকাশ দেখতে পাচ্ছি। ঢেউ ঘুরে যেতেই অসীম অন্ধকারে আবার ডুবে যাই—আবার ঘন গাছ পালার মধ্য দিয়ে একটা সরু পাথর ছড়ানো লাল মাটির পথ, সবটাই উৎরাই।

উৎরাই পথ, কিন্তু উৎরাইও কঠিন হতে বাধা নেই। এখানে পথ বেশ কঠিন। একটু অসাবধানেই পা পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা,

তবু আমরা সাধ্যমত দ্রুত চলেছি। আজ গ্রাম পেতেই হবে।

আরও কয়েকটা খুপড়ী, মনে মনে হিসাব করি, অর্থাৎ মাইল দুয়ের মধ্যে কোন গ্রাম নেই!

পথের ধারে আবার স্তূপীকৃত কাঠ। ঘর তৈরী করবার যোগ্য করে কাটা। আমরা ক্রমাগত নেমেই চলেছি।

হঠাৎ উনি চেঁচিয়ে উঠেন, "ওরে বন্ধু! এযে টাট্‌কা গোবর!"

"কই? কই? কই?" আমরা দুজনে ওঁর ঘাড়ের উপর উপুর হয়ে পড়ি। টাট্‌কা গোবর, অর্থাৎ হয়তো আজই গরু চরেছে এখানে, অর্থাৎ গ্রাম আর দূরে নেই।

আরও আধঘণ্টা হাঁটতেই আকাশের সবটা দেখা গেল। মস্ত মস্ত পাইন দেওদারের বনও শেষ হলো। জঙ্গলের সুরু এখানে। অনেক-দূরে হলেও নীচে মস্ত একটা গ্রামের সবগুলি ঘরবাড়ী জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল। দেখেও যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না!"

জঙ্গল শেষ হতেও বেশী দেরী হলো না। জঙ্গলের শেষ প্রান্ত থেকে ক্ষেত সুরু হয়েছে, তার আগেই মস্ত একটা বৌদ্ধ স্তূপ বা চোর্টেন। উঁচু উঁচু বাঁশে অনেকগুলি পতাকা উড়ছে। চোর্টেনের পাথরে খোদাই করা "ওঁমনি পদ্মে হুঁ।"

ধাপে ধাপে ক্ষেত নেমে গেছে যেন একেবারে ত্রিশূলী নদীর তীর অবধি। গ্রামটি নিস্তব্ধ! লোকজনের হাঁক ডাক নেই, বাচ্চার কান্না শোনা যাচ্ছে না। কুকুরের ডাক পর্য্যন্ত না।

ডাঃ বিশ্বাস বলেন, "নিশ্চয় এটি পরিত্যক্ত গ্রাম। না হলে এমন নিস্তব্ধ হয়। ওখানে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

নতুন প্রশ্ন! দুরু দুরু বক্ষে দ্রুত হেঁটে চলেছি। আরও আধঘণ্টা নেমে এসে প্রথম ঘরখানার পিছনে পৌঁছলাম। তিনজনাই প্রায় একসঙ্গে ঘরখানার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন পৌণে তিনটা।

"একটা বাচ্চা দেখছি!" খুসীর হাসি হেসে বন্ধু বলে।

"কয়েকজন লোকও।" আমি বলি।

"তবে এটা ডেসার্টেড্ (পরিত্যক্ত) নয় ?" উনি বলেন। সকলেই খুসী হয়ে উঠেছি। পাঁচদিন পর আজ প্রথম বাইরের লোকের মুখ দেখলাম।

"গাঁও কা নাম ক্যা ?"

"ধুন্জে"—অপরিচিত সুরে উত্তর শুনি।

কুণ্ড থেকে ত্রিশূলী বাজারের রাস্তায় দ্বিতীয় গ্রামে এসে পৌঁছলাম প্রথম গ্রাম কুলুং এর পথও এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যে বন পার হয়ে এসেছি তার অনেক নীচ দিয়ে এবং সম্পূর্ণ উল্টোদিকের পাহাড়ের বনের প্রান্ত ঘেঁসে পথ।

মস্ত একটা মনাষ্টারী এটা। একটা ঘরে বিশাল একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। এককালে খুব সাজানো ছিল, তার চিহ্ন বর্তমান। সামনে মস্ত খোলা চত্বর। চত্বরের সামনের দিকে ছাত থেকে মস্ত একটা পিতলের ঘণ্টা ঝুলছে। বিগত গৌরব, তাই অবহেলায় অনাদৃত প্রায় পড়ে আছে। প্রচুর ধুলো জমেছে। চত্বরের এককোণে বাঁশের বেড়া দিয়ে একটা ঘর তৈরী করে এক বুড়ো সপরিবারে বাস করে। সে কিন্তু বিশেষ দেখা শোনা করে বলে মনে হয় না।

মস্ত একটা দুঃস্বপ্ন কাটলো। সামনে একটা ছোট শব্জী ক্ষেত আছে। অনুনয় বিনয় করে সেখান থেকে বীণ, শসা, সীম, কুমড়ো সংগ্রহ করা গেল। সারাদিন যেন কোন পরিশ্রমই করিনি, এখন পূর্ণোদ্যমে রান্না বান্নার উদ্যোগ করছি। এখানে শীতও অনেক কম। আজকে আশ্রয়টাই মস্ত বড় সৌভাগ্যের কথা।

ইতিমধ্যে কয়েকটা মোমবাতি বের করে বন্ধু বুদ্ধদেবের আসনের কাছে জ্বালিয়ে দিল। সেই ঘরেই মেজেতে বুদ্ধদেবের পায়ের কাছে আমাদের বিছানা তিন খানি সে-ই পেতে ফেলেছে। বহুদিন পর আজ আমরা ঘরে আরাম করে শোব। খুপরি খোঁজার পালা শেষ হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মনাষ্টারীর একমাত্র লামা চত্বরের মস্ত ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিনের শেষের বিদায়ধ্বনি জানালো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনেছিলাম,

প্রত্যূষে আবার সেই ঘণ্টার গম্ভীর নিনাদ।

কুলিরা মাল নামিয়ে কোথায় চলে গেছে। লামা বলে ওরা চা খেতে গেছে। পরে দেখলাম, শুধু চা নয়, ওরা ডাঃ বিশ্বাসের কাছ থেকে টাকা নিয়ে রেশন কেনার নাম করে প্রচুর মদ খেয়ে এসেছে। তাই গভীর রাত অবধি ওদের আর সাক্ষাৎ মিললো না।

বার

ধুনজের উচ্চতা ৯,০০০ ফুট। এখান থেকে উত্তর দিকে গেলে রসুয়াগরহি গিরিসকট পাওয়া যাবে। ত্রিশূলী গণ্ডকী নদী রসুয়াগরহিতে (৭৫০০ ফুট) বৃহৎ হিমালয়কে ছেদ করে তিব্বত থেকে নেপালে প্রবেশ করেছে। এটি তিব্বতের সীমানায় অবস্থিত। আগে এই পথে তিব্বতের সঙ্গে যাতায়াত ব্যবসা বাণিজ্য চলত। তিব্বত চীনা দখলে যাবার পর থেকে এপথ বন্ধ হয়ে গেছে।

পরদিন ভোর পাঁচটার সময় মন্দিরের লামা সেই প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজিয়ে এবং শিঙার গম্ভীর স্বরে গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিল, ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ নিয়ে তোমরা ওঠো! জাগো! নতুন দিনের কাজে নতুন উৎসাহে লাগো।

শিঙাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু উঠে গেল। আমরা দুজন কিছুক্ষণ বিছানার উষ্ণতার মধ্যে পরম আলস্যভরে পড়ে রইলাম।

বেলা সাতটার সময় তৈরী হয়ে আমরা রওনা হলাম, কিন্তু কুলিরা বলল, ওরা একটু দেরী করে রওনা হবে। এখানকার পথ সহজ, সরল, তাছাড়া প্রায় সবটাই ধীরে ধীরে উৎরাই হয়ে নেমে গেছে, তাই ওদের পক্ষে দ্রুত হাঁটা সহজসাধ্য। আমরাও তাই ওদের ছেড়ে রওনা হতে আর আপত্তি করি না।

পথ খুব সুন্দর, সবুজ পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধীরে ধীরে উৎরাই নেমে চলেছে। বহু নীচে উপত্যকার মধ্য দিয়ে ত্রিশূলীগণ্ডকী নদী বয়ে চলেছে। গাঢ় সবুজ বনভূমির মধ্যে একটা সরু ক্ষীণ ধারা কেবল রূপালী ফিতের মত চিক চিক করছে।

কয়েকটা সুন্দর টলটলে জলের ঝরণা পার হয়ে বাউধুঙ্গা গ্রামে পৌঁছাতে আমাদের বেশী দেরী হলো না। মাত্র তুই মাইল রাস্তা। আমাদের প্রায় সাথে সাথে লামাও এল। কিন্তু বাকী কুলিরা কই ? লামা বলল, ওরা আসছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ওদের দেখা পাওয়া গেলনা। তখন অগত্যা ডাঃ বিশ্বাস এখানেই তুপুরের খাবার তৈরী করবার আদেশ দিলেন। লামা একজন গ্রামবাসীর ক্ষেত থেকে টাটকা রাইশাক তুলে নিয়ে এসে রাঁধতে বসল

একটা বেশ বড় কাঠের তৈরী দোতলা বাড়ীর একতলার বারান্দাতে আমরা চা ও ভুট্টাভাজা খেতে খেতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। আমরা ওদের দেশের তীর্থ গোসাঁইকুণ্ড থেকে ফিরছি বলে ওরা সকলেই খুসী। কিন্তু ওরা কেউ সেখানে যায় নি।

আজ মহাষ্টমী, ছুটির দিন। সকলেই অলস হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দলে দলে লোক আমাদের দেখতে এল। মেয়েদেরই কৌতূহল বেশী। রঙীন সাড়ী ঘাঘরার মত করে পরা, গায়ে ডগমগে রঙের হাতাওয়ালা জামা। গলায় সারি সারি অনেকগুলি পুঁতির মালা; মাথায় ওড়না। বেশ হাসিখুসী মেয়েগুলি। মস্ত একটা উঠানের তুদিকে ঘরগুলি। কারুকার্য করা কাঠ দিয়ে তৈরী। একটি বুড়ো সামনের দোতলার ঘরের জানালার ধারে বসে তামাক খাচ্ছে আর অনবরত কাশছে। বছর খানেকের একটি ফুটফুটে বাচ্চা নতুন রঙীন জামা পরে ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। সকলেরই পরণে উজ্জ্বল রঙীন নতুন পোষাক।

খানিকক্ষণ পরে দেখি একজন বুড়ো বক্‌বক্‌ করতে করতে উঠোনে এল, দেখতে দেখতে উঠান ভর্তি লোক জমে গেল। সকলেই অল্প-বিস্তর ছাং খেয়েছে। বুড়ো ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল, গাইতে লাগল। হুল্লোড় পড়ে গেল সেখানে।

পাহাড়ের খানিক উঁচুতে একটা মস্ত সুদৃশ্য কারুকার্যময় দোতলা বাড়ী। মেয়েরা বলল, ওটাই এখানকার এম. পি. মশাইর বাড়ী। কিছুক্ষণ পরে কাল চশমা চোখে এম.পি. মশাইকেও দেখা গেল। বেশ ভারিক্কি চেহারা। তিনি বেরিয়ে এসে তাঁর বাড়ীর পাশে কি যেন লক্ষ্য করতে লাগলেন। তাঁর বাড়ীর রূপসী মেয়েরা বাড়ীর জানালা খুলে আগে থেকেই সেই দৃশ্য দেখছিল।

লক্ষ্য করে দেখি, এম.পি. মশাইর বাড়ীর পাশের ক্ষেতে একদল গ্রামবাসী একটা মহিষকে ঠেঙ্গিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ওখানটায়ও ছোট-খাট ভীড় জমে গেছে। ওদের অনেকেরই হাতে কুড়ুল। তাই দিয়ে সুবিধামতন মোষটার মাথায় আঘাত করছে। মোষটা কাতর ভাবে দৌড়ে আর্তনাদ করতে করতে ক্ষেতের অন্য প্রান্তে পালাবার চেষ্টা করছে। তখন সেই প্রান্তে অন্য দল তাকে আঘাত করছে। খানিক-ক্ষণের মধ্যেই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মোষটা ওই ক্ষেতের মধ্যেই শয্যা নিল। তখন সকলে এগিয়ে এসে অর্ধমৃত মোষটাকে টেনে টেনে নীচে নামিয়ে আমাদের সামনের বড় উঠানটায় রাখল। বোঝা গেল, এবার মোষ কর্তনের শুভকাজে সকলে লেগে যাবে।

ইতিমধ্যে একটি তরুণ এসেছে আমাদের কাছে, উনি ডাক্তার শুনে ওষুধ প্রার্থনা করছে। মোষ মারবার সময় অসাবধানে কুড়ুল লেগে অনেকটা কেটে গেছে। দরদর ধারে রক্ত পড়ছে। উনি আইডিন দিয়ে বেঁধে দিলেন।

এইসব কাজ হতে হতে আমরা স্নান সেরে ভাত খেয়ে নিয়েছি। এখন ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেবার পালা। কুলিরাও পৌঁছে তাদের রান্না সেরে নিয়েছে।

কিন্তু বিশ্রাম নেবার কি উপায় আছে? মোষ কর্তনের শুভকাজ আমাদের চোখের সামনেই ঘটবে, ভয়ে আমরা তাড়াতাড়ি তল্পি গুটিয়ে সরে পড়ি। বিশ্রাম মাথায় থাকুক।

বেলা বারোটার সময় গ্রাম ছেড়ে বের হয়ে পড়লাম। অল্প এগিয়েই "থারে" গ্রাম। এখানে থামবার প্রশ্ন নেই তাই গ্রাম পার হয়ে এগিয়ে চলেছি। প্রয়োজন হলে পথের ধারে পাথরে বসে বিশ্রাম করে নিচ্ছি। ঝরণা পথে পড়লে তার তুহিন শীতল ধারাতে মুখ হাত ধুয়ে পেট পুরে জল খেয়ে নিচ্ছি। প্রতিটি গ্রামের সুরুতে এবং শেষে উঁচু জায়গাতে বৌদ্ধস্তূপ দেখা যাচ্ছে। বেলা তিনটার সময় আমরা ঘাড়াং গ্রামে পৌঁছে গেলাম।

এটা কৃষ্ণবাহাদুরের সেই ঘাড়াং! গত দুদিন ধরে কৃষ্ণবাহাদুর অনবরত বলেছে যে, সে পাহাড়ের উঁচু থেকেই ঘাড়াং দেখতে পাচ্ছে, আর প্রতিবারই ডাঃ বিশ্বাসের কাছে ধমক খেয়ে চুপ করেছে। পথ আগাগোড়াই চওড়া ও সমতল। বন্ধু বলে, এত ভালো রাস্তা এপর্য্যন্ত কোথাও পাইনি। এম, পি মশাইর ঘোড়ার জন্যই এই ব্যবস্থা মনে হয়।

মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছি, ত্রিশূলী উপত্যকা যেখানে শেষ হয়েছে তারপর উঁচু ঘন সবুজ পাহাড় খানিকটা কাল্‌চে দেখাচ্ছে। দুটি পর্বতের মাঝখানে তুষার-শিখর উঁকি দিচ্ছে। আমরা যে পাহারটায় পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, সেই পাহাড়টারও পুরোটা এখন দেখতে পাচ্ছি। কত দূরে সরে গেছে এখন! ওই পাহাড়টার একেবারে চূড়াতে উঠেছিলাম আমরা, এখন যেন সব কিছু স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। ওই তুষার শিখর, ওরই পায়ের কাছে আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি, এখন যেন সেকথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

ঘাড়াং পৌঁছে একটা বন্ধ ঘরের বারান্দায় লামার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, সে এসে ঘর ঠিক করবে। যদি সে মনে করে, তবে

আজই আমরা পরের গ্রাম রাম্‌চেতে যেতে পারি। এখানকার গ্রামবাসী দুটি মেয়ের দেখা পেয়েছি, তারা বললো, রাম্‌চে মোটে আধক্রোশ দূরে। এখনো হাঁটবার মত বেলা রয়েছে। ঘাড়াং-এ একটি সুদর্শনা যুবতী মেয়ে আমাদের বসবার জায়গা দিল। মেয়েটি হিন্দি বলতে পারে। সে এ গ্রামে নবাগতা, দশেরা উপলক্ষ্যে এসেছে। তাই থাকবার জায়গা যে কোথায় পাওয়া যাবে, সে হদিশ দিতে পারল না। তবে নিশ্চয়ই ঘরের ব্যবস্থা হবে। আশ্বাস দিল। তার স্বামীও পাশের একটি কাঠের বাড়ী থেকে বের হলো। এরা দুজনেই ভারতবর্ষে গিয়েছে।

ঘাড়াং-এ বারান্দায় এক টুকরো তক্তার উপর বসে আছি তো বসেই আছি। লামাদের আর দেখা নেই। সামনে একফালি উঠোন, সেখানে একটি মেয়ে বসে বসে পাথরে ঠুকে ঠুকে আখরোট ভাঙছে। তার দুটো বাচ্চাও তার সঙ্গে বসে বসে আখরোট খাচ্ছে। আমরা চুপচাপ বসে তাই দেখছি। মনে মনে অসহিষ্ণু ও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছি। সামনের পাহাড়ে রোদ পড়ে এল, ওপারে গ্রামগুলি আর দেখা যাচ্ছে না। কুলিরা এখনো এল না। ওরা দেখছি অসম্ভব বেয়াদপী আরম্ভ করেছে। দলনেতা চটতে সুরু করেছেন। শেষ পর্যন্ত এলো ওরা চারটার সময়। পাহাড়ী পথে আধক্রোশ যে কতটা হবে কিছু বলা যায় না। তার উপর একটি মেয়ে বলল যে আমরা রাম্‌চে পৌঁছাতে পারব না, রাত হয়ে যাবে। অগত্যা আজ রাতের মত ঘাড়াং-এ থাকাই ঠিক হলো। লামা অনেক খোঁজাখুজি করল। কিন্তু কোন ঘর পাওয়া গেল না। আজ অষ্টমী-পূজার দিন, সকলেই রাত্রে উৎসবে মাতবে। তাই খালি ঘরে কোন অজানা অচেনা অতিথিকে ঠাঁই দিতে কেউ রাজী হলো না। অগত্যা একটা খোলাবারান্দায় স্থান নিলাম। আমার একখানা সাড়ী টাঙিয়ে খানিকটা পর্দা দেওয়া হলো, তাতে হাওয়া ও শীত দুই-ই কমবে। কিন্তু গ্রামের দুটি চারটি মেয়ে ও একদল বাচ্চা এখানে লেগেই রইল—আমরা যেন বিশেষ দর্শনীয় বস্তু।

মেয়েদের কেউ কেউ দূরের ঝরণা থেকে মস্ত মস্ত তামার কলসি করে জল আনছে। ওদের নেপালী বুড়ি নেপালী ঢঙে কপালে আটকে পিঠে ঝুলিয়ে তার মধ্যে জলভরা কলসী বসিয়ে নিয়েছে।

এতক্ষণ গ্রামের পুরুষদের বিশেষ দেখাই যায় নি। এখন দেখি তারা দলে দলে আসছে মোষের মাংস ও ঘটি বা কেৎলিতে মোষের রক্ত নিয়ে। এতক্ষণ নিশ্চয় কোথাও মোষ কেটে তার মাংস ভাগাভাগি হচ্ছিল। এখন সকলে যার যার ভাগ নিয়ে বাড়ী ফিরছে।

আজ মহাষ্টমী। উনি তাই পায়েস রাঁধবার জন্য দুধের খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু এক ছটাক দুধও পাওয়া গেল না। তরকারীর থলেটা ঝেড়ে দেখি, তখনও কাঠমাণ্ডু থেকে আনা একটা ছোট্ট ফুলকপি রয়ে গেছে। সেটা আর সব তরকারীর নীচে পড়ে গিয়েছিল বলে এতদিন নজরে পড়েনি, দেখতে একদম টাট্‌কা। আজ শুভদিনে তার ডালনা রাঁধলাম। বহুদিন পর ভালো তরকারীর আস্বাদ ভালোই লাগল। বারবার কলকাতার কথা মনে পড়ছে। আজ কত উৎসব চলেছে সেখানে। পথে ঘাটে কত লোকের আনাগোণা হৈহুল্লোড় চলেছে। মাইকের চীৎকারে হয়তো সকলের কানে এতক্ষণে তালা লেগেছে। আলোর মালাতে সেজেছে মহানগরী। এখানের নিস্তব্ধ অন্ধকার পার্বত্য গ্রামে উৎসবের কোন আয়োজনই নেই। কোথাও কোন প্রতিমা তৈরী হয়নি, পুজো হচ্ছে না কোথাও। মোষ বলির বীভৎস ব্যবস্থা এবং ছাং খাওয়ার ছড়াছড়ি ছাড়া একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে গ্রামবাসীদের পোষাকে। যার যা ভাল পোষাক আছে সব আজ বের করা হয়ে গেছে। উৎসব সাজে সেজেছে সবাই। মেয়েরাও যেমন গাঢ় উজ্জ্বল রঙের পোষাক পড়েছে, ছেলেরাও তাই। সকলেই উল্লাস-চঞ্চল মুখে ঘোরাফেরা করছে। সকলেই যে প্রচুর ছাং খেয়েছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

খোলা বারান্দায় স্লিপিং ব্যাগের ভিতর শুয়ে শুয়ে আকাশের

তারা দেখতে লাগলাম। গভীর নীল, প্রায় কালো আকাশের গায়ে অগণিত নক্ষত্র যেন জ্বলছে। পাহাড়ের দেশের আকাশের রূপ আমাদের এক মস্ত আকর্ষণ।

বন্ধু ও ডাঃ বিশ্বাসের নাসিকাধ্বনি শুরু হয়ে গেছে। আমিও কখন নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়েছি জানিনা। হঠাৎ অনেক আলো ও লোকজনের কলরবে ঘুম ভেঙে গেল। আমাদের বারান্দাটা থেকে কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে একটি খোলা ময়দানে গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই জমায়েত হয়েছে। অনেকগুলি মশাল জ্বলছে। ডুগ্-ডুগ্-ডুগ-ডুগ্ করে বাজনা বাজছে। ছেলে বুড়ো শিশু সকলেই সুসজ্জিত হয়ে জমায়েত হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই নাচ শুরু হয়ে গেল। ছেলেরা মেয়েরা ভিন্ন ভিন্ন দলে একত্র হয়ে হাত ধরাধরি করে গান গেয়ে গেয়ে নাচতে লাগল। একঘেয়ে সুর কিন্তু বেশ মিষ্টি লাগছে। একদল থামে তো অন্যদল অন্য গান ভিন্ন সুরে ভিন্ন তালে আরম্ভ করে। আমরা বিছানাতে শুয়ে শুয়েই সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বন্ধু কখন যেন উঠে গিয়ে দর্শকদের দলে বসেছে। ওদের নাচ দেখতে দেখতেই আবার কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম জানিনা। সকালে বন্ধু বললো, ওদের নাচগান রাত তিনটা অবধি চলেছিল। মাঝখানে ঝিরঝির করে সামান্য বৃষ্টিও পড়েছে। তাতে কিন্তু নাচের কোন অসুবিধা হয়নি।

তের

আজ ২২শে অক্টোবর। ভোরে চা খেয়ে গোছগাছ করে রওনা হতে সাতটা বেজে গেল। ডাঃ বিশ্বাস লামার সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে বললেন, আজ দুপুরে কাব্‌রেতে ভাত খাবো এবং বিকালের মধ্যে ত্রিশূলী বাজার পৌঁছাবো। নানাভাবে আমাদের কয়েকটা দিন নষ্ট হয়েছে, কিন্তু আর নয়। আজ যাত্রা শেষ করতেই হবে।

সহজ উৎরাই পথ, দূরও বেশী নয়, তাই রামচে গ্রামে পৌঁছাতে আমাদের একঘণ্টাও লাগলো না। এত ভাল পথ এবং এত কম দূরত্ব জানা থাকলে কাল বিকালেই এখানে আসতে পারতাম। তবে রাম্‌চে অতিশয় ছোট গ্রাম, কাল উৎসবের দিনে এখানে থাকবার জায়গা পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ।

রাম্‌চে পেরিয়ে একটু এগিয়েই আরও একটা গ্রাম, নাম হাত্তিপারওয়া। এটি বেশ বড়, অনেকগুলি সুদৃশ্য ঘরবাড়ী আছে। নীচের ত্রিশূলী নদীর অনেকটাই এখন নজরে পড়ছে। (দুটি পর্বতের নীচেকার উপত্যকা ধরে বয়ে চলেছে।) চারিদিক ধাপে ধাপে চাষের ক্ষেত ভরা, সবুজ হয়ে রয়েছে। অনেকদূর অবধি পর্বতমালার ঢেউ এগিয়ে চলেছে, ধীরে ধীরে ধোঁয়াটে হয়ে যেন আকাশের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

নদীর ওপারের পাহাড়েও এই রকম গ্রাম দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে ক্ষেত, মাঝখানে গ্রামের ঘরবাড়ীগুলি। কোথাও কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে রূপালী ঝরণা নামছে, তার আওয়াজ যেন এখান থেকে শুনতে পাচ্ছি।

গ্রামের খুব কাছে একটা মস্ত ধস নেমেছে। পাহাড়ের যেখানে গ্রামটি অবস্থিত, তারই উঁচুর দিকে পাহাড়ের একটা মস্ত অংশ ভেঙে পড়ে আছে, ধসের বালি কাঁকর নীচেও বহুদূর অবধি গড়িয়ে গেছে। ফলে পথ খুব খারাপ হয়ে গেছে, অন্য একটি রাস্তা ধসের পাথর বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। এখন কোন পথ ধরব? মস্ত সমস্যা। আমরা ধসের বিরাট পাথরগুলির উপর বসে লামার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। লামা এসে ধসের উপর উঁচু পথ দিয়ে চলবার নির্দেশ দিলে. সেইমত চলতে লাগলাম।

অনেকটা চড়াই উঠতে হলো, সে কেবল ধসের কৃপাতে। মাঝপথে একটা সুন্দর ঝরণা। তার জলের উপর পা ফেলে চলা। ঝরণা পেরিয়ে খুব উঁচু চড়াই। সামনের পাহাড়টার চূড়া অবধি কে যেন ছুরি দিয়ে আঁকাবাঁকা করে পথ কেটে রেখেছে। কাঁচির ফলার মত পথ। হাঁপাতে হাঁপাতে চড়াই উঠে দেখি খানিকটা সমতল ক্ষেত্র। একদল অলস পুরুষ মধ্যাহ্নে পাহাড়ের উপর গাছের ছায়াতে বসে বসে তাস খেলছে। একজন পাথরে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। তারা বললো, কাব্‌রে আর বেশী দূরে নেই। সামান্য নেমে গেলেই পৌঁছানো যাবে। পেলামও তাই।

কাব্‌রে মস্ত গ্রাম। পাহাড়ের অনেকখানি ছড়িয়ে গ্রামখানা। ঘরবাড়ীগুলি সাধারণতঃ যেমন হয়, তেমনি একজায়গায় ঘেঁসাঘেঁসি করে নেই। গরু মোষ চড়ে বেড়াচ্ছে, তাও পাহাড়ের নানাদিকে ছড়িয়ে। প্রতি গৃহসংলগ্ন জমিতে নানারকম শব্জী ফলে রয়েছে। লাউ গাছে জালি পড়েছে, সীমগাছগুলি ভরা সীম, পাকা কুমড়ো ঝুলছে গাছে, অজস্র কাঁকুর ফলেছে গাছে। বেশ লক্ষ্মীশ্রী গ্রামখানিতে।

চড়াই উঠতে আমাদের অনেকটা সময় ব্যয় হয়ে গেছে। তাই কাবরে পৌঁছাতে আমাদের সোয়া দশটা বেজে গেছে। গ্রামের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে অনেকটা জায়গা পাথর ঢাকা, যেন পাহাড়টার সেই অংশটুকু পাথরে বাঁধানো হয়েছে, তার উপর দিয়ে একটা ঝরণা ঝরঝর করে পড়ছে। আমরা ঝরণার ধারে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করবার মনে বসে পড়লাম। লামা সঙ্গেই ছিল, সে আমাদের জন্য কাঁকুর সংগ্রহ করে দিল। পাশের ঘরের মালিকানী কিছুটা মোষের দুধ দিতে রাজী হলেন। লামা রান্নার যোগাড় করতে লাগল। কিন্তু অন্য কুলিরা কই? তাদের কাছে যে সব বাসনপত্র রয়েছে।

বেলা এগারটারও পরে ল্যাংট্যাং ও কৃষ্ণবাহাদুর এলো। তারা বললো, ধসের কাছে মনবাহাদুর নীচের রাস্তা দিয়ে চলে গেল, ওদের বারণ শুনলো না। সে সেপথ দিয়ে সোজা বেত্রাবতীতে চলে যাবে। আমরা তাকে বেত্রাবতীতে পাব। আমরা ওদের উপর খুব অসন্তুষ্ট হলাম। ওরা যদি আমাদের সাথে সাথে থাকত তবে এমন ঘটতে পারত না। আজ তিন দিন ধরে ওরা বড় বেয়াড়াপণা সুরু করেছে। ভাগ্য ভালো যে এদের সঙ্গেই বাঁধবার বাসনপত্র ছিল, তাই বিশেষ অসুবিধা হলো না। মস্ত সুন্দর ঝরণাটির টলটলে জলে তৃপ্তি করে স্নান করাও গেল। এখান ওখান থেকে সংগ্রহ করে এনে কিছু শব্জী জুটলো। পাতলা মুসুরীর ডাল, কচিশশা ও টমাটোর স্যালাড, একেবার গাছ থেকে পেড়ে আনা কাগজী লেবু ও লঙ্কা, আলুসিদ্ধ, ঘি, দুধ,—তৃপ্তির সঙ্গে আকণ্ঠ খাওয়া গেল।

আর বেশী দেরী করা উচিত নয়। আজই ত্রিশূলী বাজার পৌঁছাতে হবে, তাই তাড়াহুড়ো করে রওনা হতে হলো। একজন বুড়ো গ্রামবাসী বলল, ত্রিশূলী বাজার সাড়ে তিন ক্রোশ, কিন্তু আমাদের কাছে Tourist bureau থেকে আনা যে ম্যাপ আছে, তাতে লেখা আছে, এপথ আড়াইক্রোশের বেশী নয়। বুড়ো কিন্তু বলল, সোজা হিসেব—বেত্রাবতীগ্রাম এখান থেকে তিন মাইল,

বেত্রাবতীর থেকে ত্রিশূলীবাজার চার মাইল, ব্যস্। তবে ভরসা দিল যে, বেত্রাবতীর পরের গ্রাম "ভঁয়সা"তে অনেক সময় মোটর গাড়ী পাওয়া যায়। তাতে তাড়াতাড়ি ত্রিশূলীবাজার পৌঁছানো চলবে।

টুরিষ্ট অফিসারের ম্যাপ অনুসারে কাব্‌রের পর আমরা "দাইভুং" গ্রাম পাব। এরা বলল, দাইভুং বেত্রাবতীর পথে পড়ে না। দাইভুং যেতে অনেক উঁচুতে উঠতে হবে। আমরা উৎরাই পথে নেমে চললাম।

সুন্দর সরল সমান পথ। দুদিকে ক্ষেত ভরা, কোথাও কোথাও সামান্য জঙ্গল আছে। পোড়ো জমি চাষ হয়নি। তাই আগাছা জন্মেছে। সবুজ পাহাড়ের ঢেউ একটার পর একটা পার হয়ে চলেছি। মৃদু মন্দ বাতাস আছে, বেশী ঠাণ্ডা যেমন নেই, কষ্টকর গরমও নেই। আরও দুটি ছোট গ্রাম পথে পড়ল। সে সব গ্রামে আমাদের থামবার প্রশ্ন নেই, কেবল পথের হদিশ জেনে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলি। এবারকার পথ সবই উৎরাই। একটি বৃদ্ধ কুব্জ দেহে লাঠি ঠুকে ঠুকে অনেক কষ্ট করে চড়াই উঠছে। আমরা বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এত কঠিন চড়াই, সে কি করে উঠবে? তবে আজন্ম এইরকম পথে চলে অভ্যস্থ, হয়ত তার পক্ষে অসম্ভব নয়। একটা ছোট গ্রামে পথের ধারে একটা কলে জল পড়ছে। কয়েকটি মেয়ে মস্ত মস্ত পিতলের কলসী ভরে জল নিচ্ছে। আমাদের বিদেশী দেখে কলসী সরিয়ে নিল। আমরা আকণ্ঠ জলপান করলাম। হাত মুখ ধুয়ে দেহ স্নিগ্ধ হলো। সঙ্গের বোতলে জল ভরেও নিলাম।

"লহরে" গ্রামে পৌঁছাতে পুলিশ আমাদের গতিরোধ করল। তার কাছে নাম ধাম পরিচয় সব তথ্য দিতে হবে। বেত্রাবতী গ্রামে পৌঁছাতে আর এক মাইল বাকি আছে, বলল।

খাড়া উৎরাই পথ, লাল রঙের পাথরে ভরা। কোথাও কোথাও বেশ বিপজ্জনক। এখান থেকেই বেত্রাবতী নদী ও ত্রিশূলী গণ্ডকীর

সঙ্গম দেখা যাচ্ছে। কিছুটা নেমে ঘন শালবনের ভিতর ঢুকলাম। পথ অনেকটা সরু হয়ে গেছে। সেই পথে শালগাছ ধরে ধরে নামা। কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেলাম, আমরা কি করে যেন চওড়া সদর পথ ছেড়ে পাকদণ্ডি পথ ধরেছি। এ পথে তাড়াতাড়ি বেত্রাবতী পৌঁছনো যাবে, কিন্তু চলতে মোটেই ভাল লাগছে না, এমন বিশ্রী খাড়াই। তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাই আর বড় রাস্তায় ফিরতে পারলাম না। বেলা প্রায় চারটার সময় বেত্রাবতী গ্রামে পৌঁছলাম।

বেত্রাবতী গ্রামটি ত্রিশূলী গণ্ডকী ও বেত্রাবতী নদীর সঙ্গমে অবস্থিত। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামতে নামতেই আমরা দুটি নদীর সঙ্গম সুন্দর-ভাবে দেখতে পেলাম। দুটিই পাহাড়ী নদী, তাই উচ্ছলতার অবধি নেই। সঙ্গমটিও তাই মনোরম। বেত্রাবতী নদীর দু' ধারেই বেত্রা-বতী গ্রামের ঘরবাড়ী। লাল রঙের মাটী নিকানো পাথরের ঘর, খড় বা টিনের চাল। গ্রামের দুটি অংশ যোগ করে নদীর উপর লোহার ঝোলান ব্রীজ। আমরা বিশ্রামের মানসে একটা দোকান ঘরের বারান্দায় বসে পড়েছি। উৎরাই চলে চলে হাঁটু দুটো একেবারে গেছে। কাব্‌রের বুড়ো বলেছিল, "ত্রিশূলীবাজার আজ পুঁকছ না। পা দুখ্‌ছ, শক্‌ছ না।"

তার কথাতে আমরা মনে মনে হেসেছিলাম, উৎরাই এবং সমতল পথে কেন একবেলাতে সাত মাইল যেতে পারব না? এখন বুড়োর কথা বেশ মর্মে মর্মে অনুভব করছি। হাঁটু দুটোয় এত ব্যথা হয়েছে মনে হচ্ছে যেন ও দুটো আর আমার নয়।

কুলিরা এখনো এসে পৌঁছায় নি। তাছাড়া মনবাহাদুরের খোঁজও করতে হবে। দোকানদার বুড়োকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, একজনা "ভারি" মাল নিয়ে দুই ঘণ্টা আগে এখানে এসে পৌঁছেছে। সে যে মনবাহাদুর সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতেও বেশী দেরী হলো না।

একটু পরেই মনবাহাদুর সশরীরে হাজির। উস্কোখুস্ক চুল, বোঝা ওপারে কোথায় নামিয়ে রেখে আমাদের খোঁজে এসেছে। বেলা দেড়টা পর্য্যন্ত একটানা হেঁটে সে এখানে এসে পৌঁছেছে। এখনো কিছু খায়নি। মানবাহাদুর খায়নি শুনেই ওঁর এতক্ষণকার পুঞ্জীভূত রাগ জল হয়ে গেল। সারাপথ চলতে চলতে মনবাহাদুরের চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করেছেন, যেন ওকে পেলেই আর আস্ত রাখবেন না। এখন সে সব মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গিয়ে পকেট থেকে টাকা বের করে দেন। ওকে আদেশ দেন তাড়াতাড়ি কিছু কিনে খেয়ে নিতে। আমরাও চা এর জন্য ফরমাশ দিই। আধঘন্টার মধ্যেই লামারা সকলে এসে গেল, ওরাও বসে গেল চা খেতে।

দোকানী বলল, ত্রিশূলীবাজার এখনো চারমাইল দূরে। তবে সে চারমাইলের পুরোটাই নদীর তীর ধরে ধরে সমতল চওড়া পথে। তবে আর চিন্তা কি!

বেত্রাবতীর ঝোলান পুল পার হয়ে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে ফসল ভরা ক্ষেতের পাশ দিয়ে সরল চওড়া পথ চলেছে। গত দুদিন ধরে আমরা যে নদীটিকে সরু রূপালী সুতোর মত দেখে আসছি, আজ কাছে এসে তার রূপ দেখে আর চোখ ফেরাতে পারি না। উচ্ছল বেগে বয়ে চলেছে, দ্রুত তার গতি। কলকলানির আর অন্ত নেই। যেন সর্বদাই চঞ্চল শিশুর মত কতকি বলে চলেছে।

মাইলখানেক গিয়ে "ভয়সা" গ্রাম পাওয়া গেল বটে, কিন্তু কোন গাড়ীর চিহ্নও নেই। গাড়ী রাখবার জায়গায় খানিকটা মাঠ শূন্য পড়ে আছে। আমরা আর অপেক্ষা না করে চলতে থাকি। অদূরে মস্ত একটা পাকা ব্রীজ দেখা যাচ্ছে। মনে ভরসা এলো। ত্রিশূলী বাজার বুঝি পৌঁছে গেলাম। পাকা ব্রীজের ওপারে পাকা বাঁধানো গাড়ী চলবার পথ অনেক ঘুরে ঘুরে উঁচুতে উঠেছে। কিছু কিছু অর্দ্ধ-সমাপ্ত ঘরবাড়ীও দেখা গেল। অনেক খোঁজাখুজি করে একজন লোকের

দেখা পাওয়া গেল। সে বললে, ওইসব ঘর বাড়ী এখানকার নতুন তৈরী হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টের কলোনীর। ত্রিশূলীবাজার পৌঁছাতে ২নং ব্রীজ পর্য্যন্ত এপার ধরেই যেতেই হবে। এই বলে সে পাহাড়ের গায়ে একসার আলোর মালা দেখালো—ওই হল ত্রিশূলীবাজারের আলো। বেশ বুঝতে পারলাম, ত্রিশূলীবাজার এখনো অনেক দূরে।

২নং ব্রীজ পর্য্যন্ত পৌঁছাতে আরও প্রায় পৌণে একমাইল পথ চলতে হলো। ততক্ষণে বেলা পড়ে এসেছে। আমরা প্রাণপণে তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টা করি। অন্ধকার হয়ে গেলে এই অচেনা জায়গায় পথ চলাই মুস্কিল হবে।

"বন্ধু, তুই এগিয়ে যা, ত্রিশূলীবাজারে গিয়ে একটা থাকবার হোটেল টোটেল ঠিক করে রাখ। আমি তোর মামীকে নিয়ে ধীরে ধীরে আসছি।" ডাঃ বিশ্বাসের আদেশে বন্ধু দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলে গেল। এদিকে আমার শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে এসেছে। প্রায় ৭টায় চলা সুরু করেছি, মাঝখানে মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের বিশ্রাম। এখন পরিশ্রান্ত দেহ যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করছে।

যেন বড় তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে এলো। আমরা যথাসম্ভব দ্রুত হেঁটে চলেছি। নবমীর চাঁদের স্বল্পালোকে দুপাশের পাহাড় আরও কৃষ্ণবর্ণ দেখাচ্ছে, তার মাঝখান দিয়ে আবছা আবছা পথ দেখা যাচ্ছে। এখানকার হাইডেল প্রজেক্ট এখনো পূর্ণরূপ নেয় নি। ঘর বাড়ী পথঘাট এখনো তৈরী হচ্ছে।

নেপাল গবর্ণমেণ্ট ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনাতে এই ত্রিশূলী হাইডেল প্রজেক্টের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ত্রিশূলী গণ্ডকী নদীর জল বাঁধ দিয়ে বেঁধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে এখানে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ও নেপাল গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্ধুত্বের আর একটি নিদর্শন। আমরা যাত্রা সুরু করেছিলাম ভারতেরই তৈরী সুন্দরীজল ওয়াটার ওয়ার্কস্ থেকে। এই ত্রিশূলী হাইডেল প্রজেক্টের

কারখানা থেকে ১৮,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ হবে। এই কাজ অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে।

আরও মাইল খানেক চওড়া পথ দিয়ে চলে হঠাৎ দেখি পথ শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ নতুন তৈরী রাজপথ এই পর্য্যন্তই তৈরী হয়েছে কিছুদূরে ত্রিশূলীবাজার থেকে সুরু হয়ে যে পাকা রাস্তা তৈরী হয়েছে তাও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু দুটি পথের মাঝখানের অনেকটাই অসমাপ্ত থেকে গেছে। নতুন রাস্তায় পৌঁছাতে হলে ভাঙা পথের অনেকখানি নীচে নেমে পরে আবার অসমাপ্ত পথে উঠতে হয়। স্বল্পালোকে এদিকটা ভালো দেখাও যাচ্ছে না।

"ওগো, রাস্তা যে শেষ হয়ে গেল"। করুণকণ্ঠে ওঁকে ডাকি।

"সে কি? কি বলছো তুমি?" উনি এগিয়ে আসেন।

অন্ধকারে অনেক কষ্টে বোঝা যায়। জনমানবহীন এলাকা।

"হ্যাঁ, এখানেই দেখছি বুল ডোজারের তৈরী পথের শেষ।"

"তাইতো দেখছি? কি বিপদ! এই অন্ধকারে পথই বা কোথায়? কোথা দিয়ে যাওয়া যায়? কি মুস্কিলে পড়লাম। খুব বিপদ তো।" পরক্ষণেই আবার বলেন, "ধরো তো, ধরোতো আমায় ক্যামেরাটা, আর ছাতাখানা ধরো একটু। বড্ড পেট কামড়াচ্ছে যে!"

নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। মনে মনে চটতে থাকি। কিন্তু বলবার কিছু নেই। এগিয়ে গিয়ে এদিক ওদিক দেখবার চেষ্টা করি, নামবার পথের কোন নিশানা যদি পাওয়া যায়। বৃথা চেষ্টা! এত অল্প আলোতে কিছু বোঝাই গেল না। জনমানবহীন জায়গায় কাউকে জিজ্ঞাসা করারও উপায় নেই।

কি আর করা! অগত্যা দুজনে যেখানে বুলডোজার দিয়ে পাহাড় ভেঙে রাস্তা তৈরী শেষ হয়েছে সেখানকার পাথরের স্তূপের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে চার হাত পায়ের সাহায্যে নামতে লাগলাম।

নীচে নেমে দাঁড়াতেই অদূরে পায়ে চলা পথের দাগ চোখে পড়ল। আমি খুসী হয়ে সেই পথে চলতে সুরু করে দিই। বাঁয়ে কিছু দূরে ত্রিশূলী নদী, তার গর্জন কানে আসছে। একটু এগিয়ে বুঝতে পারলাম, উঁচু থেকে দেখা চওড়া রাস্তা থেকে আমরা ক্রমশঃ নীচে ও দূরে সরে চলেছি। উনি বকাবকি সুরু করেছেন—"এদিকে কেন এলে? ওই তো রাস্তা, ওদিকে না গিয়ে এদিকে এলে কেন?"

"তুমি গেলেই তো পারতে? এখন আমাকে বকছ কেন?" আমিও গরম হয়ে উত্তর দিই। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পথে না গিয়ে সরু হাঁটা পথেই চলতে থাকি। অগত্যা উনিও আমার পিছু নেন। খানিকটা পথ হাঁটার পর দেখি দুজন লোক পায়ে চলা পথ ধরে আসছে। ওরা কাছে এগিয়ে আসতেই আমরা জিজ্ঞাসা করি—"ইধরসে ত্রিশূলী বাজার যানে সেকেগা?"

"হ্যাঁ, জরুর!" তারা উত্তর দেয়। সুতরাং আর কি! নির্ভাবনার এগোতে থাকি। কিন্তু বেশীদূর চলতে হলো না পথ ক্রমশঃই সরু হচ্ছে। তাছাড়া সামনে চার পাঁচ হাতের বেশী দেখাও যাচ্ছে না। আরও এগিয়ে একেবারে ত্রিশূলী নদীর তীরে পৌঁছে গেলাম। এবড়ো খেবড়ো পাথরের মধ্য দিয়ে হাঁটাপথ নদীর বেলাভূমির মধ্যে নেমে গেল। আমাদের ফিরবার আর কোন উপায় নেই, বহুদূর চলে এসেছি। সামর্থ্যও নেই। আধ অন্ধকারে সেই সরুপথ অনেক কষ্টে ঠাহর করে করে চলেছি। নদীর তীরের পর হঠাৎ পথ ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল। সামনেই উঁচু পাহাড়, তারই ছায়াতে যে আলোটুকু পাচ্ছিলাম, তাও ঢেকে গেছে। ত্রিশূলীবাজারের আলোর মালাও আর দেখা যাচ্ছে না। গাঢ় অন্ধকার। আমার বুক ঠেলে কান্না এলো। এ কোথায় এসে পৌঁছলাম আমরা?

"আজ কি আর ত্রিশূলীবাজার পৌঁছানো যাবে না?" কাঁদ কাঁদ সুরে আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করি।

আমার করুণ স্বর শুনে তাঁর আগের রাগ জল হয়ে যায়। হাত ধরে আশ্বাস দিয়ে বলেন, "ধীরে ধীরে সাবধানে পথ লক্ষ্য করে চলো।

এখনো একটু একটু দেখা যায়। পাহাড়টা পার হলেই নিশ্চয় ত্রিশূলীবাজার দেখা যাবে। ভয় করো না।"

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পনে পা ফেলে চলেছি। দুজনা হাত ধরাধরি করে একসাথে চলেছি। পাহাড়ের চড়াইটা শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই অনেক উঁচুতে আবার ত্রিশূলীবাজারের বড় রাস্তার আলো চোখে পড়ল। অদূরে কয়েকটি কুটিরও দেখা গেল। আমরা আলো লক্ষ্য করে চলেছি। প্রথম কুটিরে ঢুকে দেখি, লণ্ঠন জ্বলছে, কিন্তু ভিতরে কোন লোক নেই। পরের কুটিরের ভিতর দেখে একজন লোক আগুনের ধারে শুয়ে আছে। একটি মেয়ে কাজ করছে। আমাদের কাতর অনুনয়ে পয়সা কবুল করাতে মেয়েটি আমাদের সঙ্গে এলো পথ দেখাতে। কিন্তু তখন আমরা প্রায় এসে গেছি বাজারের কাছে। একটু এগিয়েই দেখি ত্রিশূলীবাজারের চওড়া রাজপথ ইলেকট্রিকের আলোয় উদ্ভাসিত। পথ গিয়ে ঢুকেছে একেবারে বাজারের মধ্যে।

ছোট বাজার। আমারা দুজন "বন্ধু", বন্ধু" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সমস্ত বাজারটা দুবার ঘুরে দেখলাম। বন্ধুর পাত্তা নেই। কুলিদের সঙ্গে বেত্রাবতীর পর আর দেখাই হয়'ন। এত অন্ধকারে এমন ভাঙা পথে ওরা যে কি করে আসবে ওরাই জানে। হয়তো ওরা পথেই কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে, ওদের মতিগতির কথা কিছু বলা যায় না।

প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পা আর চলছে না। কোথাও কোন হোটেলের খোঁজ পাচ্ছি না, সবগুলিই দশহরার জন্য তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই ফুর্তি করতে বেরিয়ে গেছে। সমস্ত শহর আজ মদ খেয়ে নেশায় চুর হয়ে আছে।

একটি মাত্র কাপড়ের দোকান তখনো বন্ধ হয়নি। দোকানীকে অনেক অনুনয় বিনয় করাতে সে দুখানা মাদুর ও খাবার জন্য কেবলমাত্র চিড়া দিতে রাজী হলো। আমরা তাতেই খুসী। নেপালীদের কাছে এর চেয়ে বেশী আশা করা যায় না। তাই ওইখানেই বসে পড়ছি। ইতিমধ্যে একজন স্থানীয় লোক আমাদের দুরবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে খবর দিল, সামনে একটা হোটেল এখনো খোলা আছে, সেখানে থাকবার জায়গাও পাওয়া যাবে।

আমরা কালবিলম্ব না করে তার নির্দেশ মত একটা হোটেলে গেলাম। হোটেলের মালিক একটি তিব্বতী মেয়ে। সে আমাদের অবস্থা শুনে, বিশেষ করে অতদূর থেকে হেঁটে এক্ষুনি পৌঁছেছি শুনে হিন্দিতে সাহস দিয়ে বলল—"কুছ্ ডর্ নেহি। আপলোক্ ইধর্ রহিয়ে। ইধর্ খানা মিলেগা, বিস্তারাভি মিলেগা।"

আমাকে সেখানে মেয়েটির তত্ত্বাবধানে রেখে আমার স্বামী বন্ধুর খোঁজ করতে বেরুলেন। পাশেই থানা। সেখানে অনেক কাকুতি মিনতিতেও থানাদার লোক পাঠিয়ে বন্ধু বা কুলিদের খোঁজ করতে রাজী হলো না। বলে, আজ দশেরার দিন, লোক কোথায় পাব? লোকজন সবাই ফুর্তি করতে বেরিয়ে গেছে। কাল সকালে যা হয় করা যাবে।

এই-ই নেপালী রীতি। সর্বত্র অসহযোগীতার মধ্য দিয়ে চলা। মুক্তিনাথ, নামচে বাজার, গোসাঁইকুণ্ড, সব পথেই আমাদের একই রকম অভিজ্ঞতা হলো।

রাগে, হতাশায়, ক্লান্ত দেহ নিয়ে উনি হোটেলে ফিরে এলেন। আমি ততক্ষণে একগ্লাস চা খেয়ে নিয়েছি। রাতের জন্য বিছানাও তৈরী। হোটেলওয়ালী না চাইতেই চা দিয়ে গেছে।

উনি ফিরে এসে ওঁর দুঃখের কথা বলতেই অন্য দরজা দিয়ে বন্ধুর আবির্ভাব! আমি হৈ হৈ করে উঠে তাকে অভ্যর্থনা জানালাম।

হারানো রত্ন ফিরে পেয়েছি! "ছোটমামা, কুলিরাও এসে ে
খবর সব ভাল। আমি বড় রাস্তার উপর এক বাঙালীর দোক
তোমাদের জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে তবে এসেছি।"

রাত সাড়ে সাতটা। ত্রিশূলীবাজার পৌঁছানোর সাথে স
আমাদের এবারকার হিমালয়ের পদযাত্রার পরিসমাপ্তি হলো। ক
একটা গাড়ী যোগাড় করে কাঠমাণ্ডু ফিরব। না পাই প
অবধি এখানে এই হোটেলেই থাকব।

আপাততঃ প্রচণ্ড ক্লান্ত দেহখানাকে কোনক্রমে টেনে দোতল
উঠে গদির উপর এলিয়ে দিলাম। শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলাম
ত্রিশূলীনদী কলধ্বনি করে বয়ে যাচ্ছে, যেন কত কি কথা বলছে!